যুযুৎসু জাপান

ভূপর্য্যটক
শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর—বীরেন সিমলাই

নববিধান প্রেস

৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স



ভূমিকা

প্রগতিশীল জাপানীরা আমাদের দেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পেত না। তারা জানত ভারতের লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজামহারাজা, ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র। জাপানের প্রগতিশীলরা সর্বপ্রথম আমাকে ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক ভেবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে চলেছিল। পরে যখন জানতে পেরেছিল আমি দরিদ্র শ্রেণীর লোক তখন তারা আমার সংগে মিশেছিল এবং খোলামনে কথা বলেছিল।

আজ স্পষ্ট করে বলছি আমি পৃথিবীর যত স্থানেই গিয়েছি সর্বত্রই পদদলিত নিপীড়িত এবং প্রগতিশীলদের দ্বারাই গৃহীত হয়েছি। ধনীরা যেমন আমাকে ঘৃণা করেছে আমিও তাদের তেমনি এড়িয়ে চলেছি। জাপানেও সেরূপই হয়েছে। একটি জাপানী ধনীও আমাকে সাহায্য করে নি, বরং ভিক্ষা করি বলে ঘৃণা করেছে।

জাপানী প্রগতিশীলদের সংগে যখন আমার পরিচয় হয়েছিল তখন তাদের সংগে বসে একটুও আরাম করা অথবা কথা বলার সময় ছিল না। কিন্তু আজও তাদের কথা মনে হয়, সেজন্যই জুজুৎসু জাপান জাপানের প্রগতিশীলদের স্মরণে দেওয়া গেল।

গ্রন্থকার

জুজুৎসু জাপান

জাপানের পথে

১৯৩১ সাল। চীন দেশে নূতন করে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে। মাওৎসুতন গালীন সোভিয়েট স্থাপন করেছেন। ইয়াংসী নদীতে প্লাবন হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে। গৃহহীনরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। পথে কেউ মরেছে, কেউবা রোগাক্রান্ত হয়ে সাহায্যের আশায় দিন গুন্ছে। চিয়াংকাইসেক কখনও লাইয়ং আর কখনও নানকিন্ করছেন। জাপানীরা মান্চুরিয়া দখল করেছে। কোরিয়াতে চীনা এবং কোরিয়ান্দের মধ্যে দাংগা হয়ে গেছে। যে সকল কোরিয়ান চীনাদের বন্ধু ভাবত, তারা চীনাদের শত্রু বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কোরিয়াতে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। তং-ওয়া-এলবো নামক কোরিয়ান্ দৈনিক পত্র সম্পাদকীয় কলমে লেখা বন্ধ করে দিয়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানের কূটনৈতিক চাল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মান্চুরিয়ার সীমান্তে সিংগোরী নদীতে যতগুলি দ্বীপ ছিল তার সবটি সোভিয়েট রুশিয়া খালি করে দিয়েছে। এতে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট রুশিয়ার দুর্বলতা আরও ভাল করে অনুভব করেছে। এরূপ যখন পূর্বএশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, তখন আমি জাপান দেখতে গিয়েছিলাম।

আমার মন তখন সুস্থির ছিলনা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই আগুন জ্বলতে দেখতে পাই। ফুসানের (FUSAN) একটি জাপানী হোটেলে বিশ্রামার্থ যখন শুয়ে থাকতাম তখন ঘুম হ'ত না, শুধু চিন্তাই করতাম। আমার

চিন্তায় একটি জাপানী রমণী এসে প্রায়ই বাধা দিত। সে ছিল সুন্দরী। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের মন আপনি ঢলে পড়ে, আমার কিন্তু তা হ'ত না, আমি ভাবতাম এইযুবতীর এখনও বিয়ে হয়নি, কখন তার বিয়ে হবে, কার সঙ্গে তার বিয়ে হবে ? যুবতী যখন কাছে বসে আমাকে খাবার দিত তখন আমি তার মুখের দিকে তাকাতাম না। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করত "হে মহামান্য পথিক তুমি কি সন্ন্যাসী ?" আমি বলতাম "কেন আমি সন্ন্যাসী হতে যাব, আমি কি কাপুরুষ ! আমি সন্ন্যাসী নই বলেই পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছি। যুবতী আর কোন কথা বলত না, উঠে যেত। আমি যা বলেছি তা তার মায়ের কাছে বলত। তার মা কি ভেবে আমার পায়ের কাছে মাতা নত করে কতক্ষণ বসে থেকে চলে যেত। আমার পায়ের কাছে কেউ মাথা নত করে তা আমার মোটেই ভাল লাগত না। এতে আমার রাগ হ'ত, দুঃখ হ'ত এবং বিদ্রোহ ভাব জেগে উঠত। আমি চুপ করে থাকতাম আর ভাবতাম এতবড় জাপানী জাতের মধ্যে এতবড় গলদ ? কি করে জাপানীরা মান্‌চুরিয়া দখল করল ? তখনও আমার সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করা হয়নি বলে সেসব কথার উত্তর সহজে পেতাম না, এখন তার জবাব অতি সহজে পেয়ে যাই। বৃটিশ, আমেরিকান, ফ্রেন্‌চ এরাও ত কম নয়, এদের মধ্যেও এরূপ দুর্বলতা আছে। এদের মধ্যে এরূপ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তারা পৃথিবীর উপর দুর্দান্ত প্রতাপ চালিয়ে যাচ্ছে। জাপানীদের দোষ দেওয়া চলে না।

যেদিন ফুসান্‌ থেকে রওয়ানা হই সেদিন হোটেলওয়ালা, তার ছেলে, কন্যাদ্বয় এবং তার স্ত্রী এসে আমার পায়ের কাছে বসে আশীর্বাদ চাইল। এদের আশীর্বাদ চাওয়া দেখে তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল আমাদের দেশের মুকুন্দ দাসের কথা। তিনি এক দিন উপদেশ দেবার সময় বলেছিলেন—"যারা আশীর্বাদ চায় তারাই দুর্বল, তার নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ করে অতএব তাদের জন্য আমি এক নূতন আশীর্বাদ রচনা করেছি তা হল "আশীর্বাদং শিরচ্ছেদং বংশ নাশং দিনে

দিনে। বুক ফুলিয়ে চল, দেখবে আশীর্বাদের দরকার হবেনা, আশীর্বাদ এসে তোমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।" যারা আমাকে সম্মান করেছে, সুখাদ্য খাইয়েছে, পথে ঘাটে আমাকে নিয়ে চলেছে তাদের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হল না, শুধু বললাম "সুখে থাক।" আমার এই দুটি কথাতেই জাপানী পরিবার সুখী হয়েছিল। তারা আমাকে জাহাজ ঘাটে এসে জাহাজে তুলে দিয়ে আবার অভিবাদন করে বিদায় নিয়েছিল।

জাহাজের কেবিনে আমার জিনিসগুলি গুছাবার সময় মনে হ'ল পূর্বদেশের লোক এখনও ব্রহ্মচারীকে বেশ সম্মান করে। শুধু সম্মান নয় ভক্তিও করে। এই জাপানী পরিবারকে আমি কিছুই দেইনি, যখনই যুবতীরা আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছে তখন শুধু মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণও ছিল। পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্যবাদী আছে জাপানীদেরও আমি তাদের দলে ফেলে দিয়ে অন্তরের সহিত ঘৃণা করতাম, তাদের যুবতীরাও সে ঘৃণা হতে বাদ যেতনা, সেজন্যই মুখ ফিরিয়ে থাকতাম। সুখের বিষয় একজনের মনের ভাব অন্যে বুঝতে পারে না। যদি বুঝতে পারত তবে এই জাপানী পরিবার আজ আমাকে ভক্তি না করে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিত।

গরম শেষ হতে চলেছে, শীত আগত প্রায়। আকাশ পরিষ্কার। রৌদ্রের তেজ অনেকটা কমে গেছে। জাহাজ তখনও ছাড়েনি। জাহাজের ডেকে উঠে কোরিয়ার বন্দর (FUSAN) ফুসানের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কোরিয়া সম্বন্ধে কয়েকখানা বইও পড়েছিলাম। সেই বইএর কথার সংগে বর্তমান ফুসানের কি পর্যন্ত সাদৃশ্য তার কথাই চিন্তা করছিলাম।

রুশিয়ান্ পর্যটক লিখেছিলেন দুইশত বৎসর পূর্বে রুশিয়ান্‌রা এই বন্দরে এসে "গোল্ডেন এগ" অর্থাৎ সোনার ডিম অন্বেষণ করত। এই কথাটির তাৎপর্য আছে। রুশিয়ানরা সমুদ্রপথে এখানে এসে কোরিয়ান্‌দের নিহত করত এবং মৃতদেহ হতে যেসকল বস্ত্র পেত তাই নিয়ে কোরিয়ারই অন্য বন্দরে কোরিয়ান্‌দের

কাছে বিক্রি করত। রুশিয়ান্ জলদস্যুরা যখন কোরিয়ান্দের নিহত করত তথন স্ত্রী-পুরুষ অথবা ছেলে বুড়ো কিছুই বিচার করতনা। দস্যুরা কথনও দয়া মায়া দেখাত না। বৈকাল হ্রদের পূর্বতীর হতে কোরিয়ার ফুসন বন্দর পর্যন্ত যখনই তারা সুযোগ পেত তখনই তারা ডাকাতি করত। তখন ছিল বর্বর যুগ। বর্বর যুগে সকল কাজই শোভা পেত, কিন্তু এ যে সভ্য যুগ। এ যুগে চীনা ন্যাসনলিষ্টরা কোরিয়ার বুকের উপর সভ্য সরকারের প্রজা হয়েও কোরিয়ান্ গুণ্ডার হাত হতে রেহাই পেলনা। এটা কি কম আশ্চর্যের কথা?

এখন জাহাজ ছাড়বে। আর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল হবেনা ভেবে কেবিনে চলে গেলাম। কেবিনে গিয়ে দেখি আমার কেবিনের দরজা খোলা। কেবিনে চাবি দিয়ে বন্ধ করে গিয়েছিলাম একথাটা আমার স্পষ্ট মনে হল, তবুও কেবিনটা খোলা দেখে একটু ভীত হলাম। মনটা বিগড়ে গেল। এ বিষয়ে বেশী চিন্তা না করে কতক্ষণ শুয়ে থাকলাম। বয় এসে কিছু খাবার এবং এক পেয়ালা ইংলিশ চাও দিয়ে গেল। ইংলিশ চা খেয়ে বেশ তৃপ্ত হলাম কারণ ফুসানে যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলে ইংলিশ চা দেওয়া হ'ত না। সবুজ চা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। আমরা যে প্রকারে চা খাই তাকেই বলে ইংলিশ চা। সবুজ চাকে ইংরাজীতে বলা হয় "গ্রিন্ টি", গ্রিন্টির প্রচলন আমাদের দেশে নাই। প্রকৃতপক্ষে গ্রিন্ টি অনিষ্টকারক নয়। চা পাতাকে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখা হয়, তারপর গরম জলে পরিমাণ মত চা ছেড়ে দিতে হয়। এতে দুধ অথবা চিনি থাকেনা এবং সেই পাতাকে শুকাবার সময় স্মোকিং রুমেও নেওয়া হয় না সেজন্যই গ্রিন্টি শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী নয়। আমি চীন দেশে প্রায়ই গ্রিন টি ব্যবহার করতাম। মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে সবুজ চায়েরই প্রচলন বেশি। ইংলিশ টির প্রচলন খুবই কম।

ইংলিশ টি খাবার পর মনটা বেশ চাংগা হয়ে ওঠায় পুনরায় জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, উত্তর হতে কুয়াশা ক্রমেই আমাদের

জাহাজের দিকে আসছে। দেখতে দেখতে জাহাজটাকে কুয়াশা ঢেকে ফেলল। চারিদক অন্ধকার হয়ে গেল। জহাজ ক্রমাগত বংশী-ধ্বনি করে অগ্রসর হতে লাগল পাছে অন্য কোনও জাহাজের গায়ে গিয়ে পড়ে এবং ধাক্কা খায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কুয়াশা লোপ পেল। আবার সুন্দর সূর্যালোকে সমুদ্রবক্ষ ঝক ঝক করতে লাগল। আমি স্মোকিং রুমে চলে এলাম। এখানে কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক বসে বিশ্রাম করছিলেন। আমাকে দেখে তারা সুখী হলেন না। আমিও তাঁদের মিলিটারী পোষাক দেখে একটু দূরে বসাই পছন্দ করলাম। কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার কেবিনে গেলাম। এবার কিন্তু কেবিনের কোনরূপ পরিবর্তন দেখলাম না।

আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ইচ্ছা হল প্রথম এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কিরূপে থাকে তাই দেখতে। তখন শরীরে ছিল প্রবল শক্তি আর মনে ছিল অফুরন্ত উদ্যম। চিন্তার সংগে সংগেই কাজের আরম্ভ। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরাই নিকটে ছিল। তাদের বসার ঘরে ঢুকেই দেখলাম কয়েকজন শ্বেত রুশিয়ানকে (অর্থাৎ যারা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিপক্ষ)। তাদের পাশেই একখানা চেয়ারে বসলাম এবং এক গ্লাস আসাই বিয়ার আনতে আদেশ করলাম। জাপানী বয় বিয়ার এনে হাজির করল। আমিও তৃপ্তির সহিত তাই খেতে লাগলাম। ইত্যবসরে কয়েকজন সাদা রুশিয়ানের সংগে কথাও হয়ে গেল। আমার সরল বুদ্ধি দেখে একজন সাদা রুশ আমার কাছ ঘেঁসে বসে বলল "মশাই হুসিয়ার, এবার খাস জাপান যাচ্ছেন, নানা মতবাদী লোক পাবেন। তারা শুধু আপনার পেটের কথাই বার করার চেষ্টা করবে, নিজে কিছুই বলবে না। তবে যদি জাপানী কমিনিউষ্টের সংগে আপনার দেখা হয় তবে সেটা হবে আপনার সৌভাগ্য। জাপানে তারাই শুধু প্রাণখুলে বিদেশীর সংগে কথা বলে। খবরদার মানচুরিয়া সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না।" এরূপ অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত উপদেশ পাব বলে আমার ধারণা ছিলনা। বাস্তবিক

পক্ষে ইউরোপীয়ান জাতের মধ্যে এরূপ উপদেশ দেবার প্রবৃত্তি যে সহজাত তা ইউরোপে যাবার পর বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। জাপান এবং কোরিয়াতে এরূপ পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে কাউকে দেখিনি। এমনকি জাপানী কমিউনিষ্টরাও মুখে বলতনা, কাজ করে দেখিয়ে দিত সে তোমার মিত্র না শত্রু। সেই ধরণের একটি লোকের সংগে ইয়াকোহামার পথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি যা চেয়েছিলাম, সে আমাকে তা' দিয়েছিল এবং বিদায়ের সময় একটি কথাও না বলে চলে গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীতে অনেকক্ষণ বসে তৃতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলি দেখতে গেলাম। প্রত্যেকটি কেবিন সুসজ্জিত। প্রত্যেক যাত্রীকে এক জোড়া করে খড়ের চটি জুতা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি লোকের সুখ সুবিধা দেখবার জন্য পুরুষ এবং মেয়েলোক নিযুক্ত ছিল। এদের কেবিন দেখে আমি বৃটিশ যাত্রী ষ্টিমবোটগুলির কথাই ভাবছিলাম। কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। এরূপ যখন ভাবছি তখন একটি জাপানী যুবক এসে আমার কাছে দাঁড়াল।

আমি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম বটে কিন্তু কথা বলছিলাম না। সে আমার সামনে এসে বল্‌ল সুসন্ধ্যা মহাশয়, আপনি এখন কোথা হতে এসেছেন ?

কোরিয়া হতে এসেছি মহাশয়।

ছেলেটি আমার আরও কাছে এসে বল্‌ল "ভুল করেছেন, কোরিয়া নয় চোজেন্।"

আমি বল্‌লাম জাপানী ভাষায় কোরিয়া শব্দটিকে চোজেন বলা হয়। আমরা ইংলিশ ভাষায় কথা বলছি। ইংলিশ ভাষা এখনও কোরিয়া শব্দটিকে চোজেন বলে গ্রহণ করে নি। যখন বৃটেনিয়া এন্‌সাইক্লোপেডিয়া কোরিয়া শব্দটির বদলে চোজেন্ লিখবে তখন আমরাও আর কোরিয়া শব্দ ব্যবহার করব না। আর যদিও বা ব্যবহার করি তবে আমাদের মূর্খতাই প্রকাশ পাবে।

জাপানী যুবক বল্‌ল "হুঁ তাই কি ?" (স দিস্ কা ?)

আমি তার কথার জবাব দিলাম না। পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল।

কতক্ষণ পর জাপানী যুবক পুনরায় আমার কাছে এসে বললে কোরিয়ার পূর্বে আপনি কোন দেশে ছিলেন ?

আমার মনে হল জাপানী যুবক আমার কাছ থেকে "মান্‌চু কো" শব্দ দুটি শুনতে চায়, কিন্তু আমি এত সহজে ভেংগে যাবার লোক নই, আমি বললাম এর পূর্বে আমি মাঞ্চুরিয়াতে ছিলাম। আমার মুখ হতে মাঞ্চুরিয়া শব্দটি বের হওয়া মাত্র জাপানী যুবকের মুখ লাল হয়ে গেল। সে এবার আমার ভুল সংশোধন করতে রাজী হল না। আমাকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল। কতক্ষণ পর জাপানী কাপ্তান এসে আমার সংগে দেখা করে বললেন অতএব মাঞ্চুকোতে এতদিন থাকার পরও মাঞ্চুরিয়া শব্দটিই মাননীয় পর্যটকের মুখে রয়ে গেল, সে কেমন কথা ?

আমি বললাম মাননীয় কাপ্তান মহাশয়ের জানা উচিত আমি কখনও পলিটিক্স নিয়ে কারো সংগে চর্চা করি নি। মাঞ্চুরিয়াতে আমি চীনা এবং জাপানী ধর্মপ্রচারকদের সংগেই থাকতাম। তাঁরা কখনও এসব কথার কতটুকু বিভিন্ন মানে তা আমাকে বলেন নি। কোরিয়াতে আসার পর অনেক জাপানী ভদ্রলোক আমাকে নানা মতে সাহায্য করেছেন কিন্তু আমি যখন তাঁদের কাছে কোরিয়া অথবা মাঞ্চুরিয়া শব্দ দুটির ব্যবহার করেছি তাঁরা ত কোনও দোষ নেন্ নি। আরও আমার অনেক বলার আছে। আমি এখন জাপান যাচ্ছি, জাপানের সংগে আমাদের কতটুকু ধর্মের সম্বন্ধ আছে তাই শুধু জানতে চাই, শব্দ শিখতে যাচ্ছি না।"

কাপ্তান আমার হাত ধরে বললেন, চলুন আমার সংগে। আমি তাঁর কেবিনে যাবার পর তিনি আমাকে অতি বিনয় প্রকাশ করে বললেন এখন থেকে আপনি মাঞ্চুকো শব্দটি ব্যবহার করবেন এই আমার অনুরোধ।

আমি তাঁর কথায় সম্মত হলাম এবং ডাইনিং কেবিনে এসে একই টেবিলে বসে খাবার খেতে পেয়ে সম্মানিত হলাম। এরূপ সম্মান সকলের ভাগ্যে জোটে না। কাপ্তান আমাকে সে কথাটিও বুঝিয়ে বলতে ভোলেন নি। উ-পে-ফু, চিয়াং-কাই-সেক প্রভৃতি লোককে যে অপেক্ষা করে চলে আসছে তার পক্ষে জাপানী কাপ্তানের সংগে ভোজন করে সম্মান অনুভব করা সম্ভব নয় সে কথা যদি জাপানী কাপ্তান বুঝতে পারত তবে জাপান জাপানই থাকত। কিন্তু কথা হল এই যুবকটি কে ? তার এত প্রতাপ কোথা হতে এল। সে জাপানী কাপ্তানকেও আদেশ করতে পারে। ব্যাপারটা কম নয়। সে ছিল মামুলী পোষাকে। বয়স তার অতি অল্প কিন্তু তার আদেশ এত শক্তিসম্পন্ন হল কি করে ? পরে জেনেছিলাম সে কোনও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য। কাপ্তানের সংগে খাবার খেয়ে অনেকক্ষণ জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ মনে হল বেশীক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়, ভয় হল এর পর আবার কি বিপদ ঘটে। কেবিনে গিয়ে কেবিনের গোল কাঁচেরে গর্তটা খুলে দিলাম। হু হু করে বাতাস আসতে লাগল। বাতাসে মাথাটা দিয়ে বসে থাকলাম। কতক্ষণ পর হঠাৎ হুইসেল বেজে উঠল। আমিও কেবিন ছেড়ে বাইরে গেলাম। জাপানী জেলেরা যাতে হুসিয়ার হয় সেজন্যই হুইসেল দেওয়া হয়েছিল। জেলেরা জাহাজের একটু দূরে গিয়ে বালক সুলভ ভাবে আনন্দধ্বনি করতে লাগল। যাত্রীরাও তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য বাইরে এসে কতক্ষণ চীৎকার করল, তারপর উভয় পক্ষই নীরব। আমাদের দেশে মাঝিমাল্লারা যদি নৌকায় থেকে আনন্দ প্রকাশ করে তবে আমরা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করার জন্য মুখ ফিরিয়ে রাখি। মাঝি মাল্লাদের আমরা মানুষ বলে স্বীকার করতেও অপমান বোধ করি। জাপানী সভ্যতার মধ্যে কিন্তু তা নেই। এখানেই তাদের সংঙ্গে আমাদের প্রভেদ, আরও অনেক প্রভেদ আছে যা ক্রমেই আমরা বুঝতে পারব।

জাহাজ ক্রমেই সিমনোসেকীর কাছে যেতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহরের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। কি সুন্দর সে দৃশ্য! বিজলী বাতির ছড়াছড়ি। মনে হতে লাগল জাপানীরা কত ধনী! কিন্তু পরে জেনেছিলাম, জাপানে বিজলী বাতির দাম যা নেওয়া হয় তা অতি সামান্য। কেপিটালিষ্ট দেশগুলির মধ্যে যদি কোথাও সস্তা ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাওয়া যায় ত শুধু জাপানেই। যারা জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী এবং আরও নানা কথায় গাল দেয় তাদের পক্ষে জাপান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা দরকার। কেপিটালিষ্টরা জানে শুধু লুটতে কিন্তু জাপানের কেপিটালিষ্টরা সেরূপ নয়। তারা জাপানের সাধারণ লোকের সুখ সুবিধা দেখতে বাধ্য হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা বলা হবে।

জাহাজ তীরে ভিড়বার পর জাপানী যাত্রীরা লাইন করে দাঁড়াল এবং একে একে নীরবে নীচে নেমে গেল। আমার সাইকেল নামানো হয়ে গেলে আমিও জাহাজ হতে নামলাম এবং সাইকেলের পেছনে পুঁটুলিটা বেঁধে ভাবলাম, আর কিছু হোক না হোক এবার আর একটি নূতন দেশে এসেছি। এটা কি কম কথা! তারপর জাহাজ ঘাট হতে বেরিয়ে গিয়ে পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি কোথাও যাবনা। শহর যেদিকে সেদিকে না চেয়ে আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জাপানীদের প্রতি উপেক্ষার ভাব মোটেই ছিলনা আমি যেন কি হারিয়ে ছিলাম, তাই যেন মনে মনে অন্বেষণ করছিলাম। এরূপ হয় যখন একটা লোক অনাগত ভাবে কোনও নূতন দেশে যায়। কতক্ষণ পর মনের দুর্বলতা কেটে গেলে, তারপর হোটেলের অনুসন্ধানে বের হলাম।

সুন্দর কালো একটি রাস্তা শহরের দিকে চলেছে। তার উভয় দিকে শুধু হোটেল। যে হোটেলেই যাই সেখানেই শুনতে পেলাম স্থানাভাব। এর মধ্যে আবার তিনটি যুবক আমার পেছন নিয়েছে। হোটেল দ্বারে পৌছানর পর

এরা হোটেলের মালিককে কি বলে দেয় আর অমনি হোটেল মালিক বলে "স্থান নাই"। উপায়ান্তর না দেখে ঐ তিনটি যুবককেই বল্লাম "হে মাননীয় মহাশয়গণ, আপনারাই আমার থাকার বন্দোবস্ত করে দিন"। একজন বললে "তাই কি, তাই যদি হয় তবে মাননীয় পর্যটক আমাদের সংগে চলুন।" আমি তাদের পেছন পেছন চলে একটি ছোট্ট পুলিশ ষ্টেসনে পৌছলাম। পুলিশের লোক আমার সংগে বিশেষ কোন কথা না বলে টেলিফোনের সাহায্যে আমার জন্য হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে দিল এবং এই তিন জন যুবকই আমাকে হোটেলে নিয়ে গেল।

হোটেলে পৌছানর পর আমি হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় গিয়ে বসলাম এবং কোরিয়া দেশের জাপানী হোটেলের প্রথায় শরীরের সকল বস্ত্র খুলে "কিমনে" পরলাম। যুবক তিনটিও আমার কাছে বসল।

এক জনকে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে ইংলিশ চা পাওয়া যায়?

যুবক বল্লে, "হাঁ বাইরে পাওয়া যায়, মাননীয় পর্যটকের বাইরে যাবার অধিকার নাই। কাল সকালে একজন বড় পুলিশ অফিসার আসবেন, তিনিই পর্যটকের ভাগ্য নির্ণয় করবেন। বুঝতে বাকি রইল না আমি নজরবন্দী রূপেই আছি। উপায়ান্তর না দেখে গ্রিণ টি বেশ করে খেলাম তারপর পথের দিকে চেয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে মনটাকে চাংগা করার চেষ্টা করতে প্রয়াসী হলাম। মন কিন্তু শান্তি পাচ্ছিল না।

জাপানী হোটেলে থাকতে এবং খেতে দেওয়া হয়। মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন এবং চীন দেশীয় হোটেলে শুধু শুতে দেওয়া হয়। খাবারের কোনও বন্দোবস্ত করা হয় না। জাপানী হোটেলে কোনরূপ মাদক দ্রব্য অথবা ব্যাভিচার করতে দেওয়া হয় না। যদি কোনও পুরুষ কোনও স্ত্রীলোক নিয়ে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয় এবং থাকবার স্থান চায় তবে স্থান এবং খাবার নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু রাত্রে একই কুঠরীতে থাকতে পাবে না। স্ত্রীলোকটিকে

শুতে হবে গিয়ে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সংগে। জাপানীদের কাছে তাদের হোটেল অতি পবিত্র অতএব হোটেলে কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

আমি যখন বসে ভাবছিলাম তখন এক দল জাপানী স্ত্রীলোক আমাকে দেখার জন্য এল। তারা ঘরে প্রবেশ করে প্রত্যেকে আমাকে জাপানী প্রথায় নমস্কার করল। আমিও আমাদের প্রথায় তাদের নমস্কার করলাম। স্ত্রীলোকগণ সকলেই যুবতী। তারা সকলেই এখান থেকে মান্চুরিয়াতে নার্সের কাজে যাচ্ছে। তারা ভাল করে বসার পর হোটেল মালিক প্রত্যেককে জাপানী চা অর্থাৎ গ্রিন চা দিলেন এবং আমাকেও গ্রিন চা দিয়ে, তাদের হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "মাননীয় পর্যটক, এই যুবতীরা মান্চুরিয়াতে সেবাকার্যে যাচ্ছে, তারা সেখানে গিয়ে কি সুখী হবে?" আমি বললাম "মান্চুরিয়া আমি দেখে এসেছি, দেশটি বড়ই সুন্দর, আবহাওয়া খুবই ভাল। সেখানে গিয়ে এই যুবতীগণ সুখী হবেন বলেই মনে হয়। সেবাকার্য করতে গিয়ে সুখ দুঃখের সন্ধান নিতে নেই। নিষ্কাম ভাবে সেবা করলে আরও শান্তি পাওয়া যায়। ওদের বুঝিয়ে বলুন সেবাকার্যে দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করতে নেই।"

হোটেল মালিক সর্বপ্রথম আমাকে মাটিতে পড়ে নমস্কার করলেন তারপর গালবাদ্য করলেন। আমাদের দেশে শিবপূজার সময় এরূপ গালবাদ্যের প্রথা রয়েছে। গালবাদ্য করার পর তিনি যুবতীদের ঘণ্টাখানেক আমার উপদেশের ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। আমার কথার ব্যাখ্যার পর যুবতীরা চলে গেলে পাশে বসা একটি যুবককে এক পেকেট চেরী সিগারেট নিয়ে আসতে বললাম। সে তৎক্ষণাৎ আমার জন্য এক পেকেট চেরী সিগারেট কিনে নিয়ে এল। তখনকার দিনে জাপানে এক পেকেট চেরী সিগারেট কিন্লে এক বাক্স দেশলাই বিনামূল্যে পাওয়া যেত কিন্তু ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে যখন পুনরায় জাপানে পৌঁছেছিলাম তখন চেরী সিগারেটের অস্তিত্ব লোপ

পেয়েছিল, দেশলাই দেখতেও পাওয়া যেত না। তখনও কিন্তু জাপান যুদ্ধে যোগ দেয় নি।

যুবকের সিগারেট আনার পূর্বেই একটি যুবতী আমার জন্য খাবার এনেছিল। মূলা সিদ্ধ, মূলাপাতার ঝোল, মাছ ভাজা এবং ভাত। মাছ ভাজাতে নুন্ দেওয়া হয়নি, তেলেতে মাছগুলি ভেজে গুড়ের রসে ডুবিয়ে একটি প্লেটে দেওয়া হয়েছিল। মাছের ভাজা মুখে দেবার পর আর খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তবুও ধৈর্য ধরে একটি একটি করে মাছ ভাজাগুলি খেয়ে ভাত এবং মূলা সিদ্ধগুলি খেলাম। সর্বশেষে মূলাপাতার স্যুপ এক চুমুকে খেয়ে খাবার শেষ করলাম। আমার হাতে খাওয়া দেখে এবং মূলাপাতার স্যুপ সকলের শেষে খাওয়াতে যুবতী যেমন আশ্চর্য বোধ করেছিল তেমনি আশ্চর্য বোধ করেছিল দর্শকেরা। খাবার সময় আমাকে কাঠের নূতন চপষ্টিক দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু আমি তা ব্যবহার করিনি। খাবার পূর্বে কারবলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছিলাম বলেই বোধ হয় গৃহকর্তা আমাকে বর্বর বলেনি। যুবতীরা কিন্তু আমার নখ দেখিয়ে বলেছিল তাতে ময়লা ছিল, কারবোলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়াতে কিছুই আসে যায় না। হাত দিয়ে বর্বররাই খায়। এখানে বর্বর মানে আদিম যুগের লোক।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে বিছানায় বসে সিগারেট টানতে টানতে মনে মনে ভাবছিলাম কাল সকালে পুলিশের বড়কর্তা কি বলবেন? আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে গৃহকর্তা তাঁর ধর্মবই নিয়ে আমার সামনে বসলেন এবং জাপানী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বই পড়ে শুনাতে লাগলেন। লোকটির বই পাঠে বেশ উৎসাহ এবং পারদর্শিতা ছিল। মাঝে মাঝে আমাকে কতকগুলি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করতেও ভুলছিল না। পার্শি ভাষার সংগে বাংলা ভাষার নিকট সম্বন্ধ আছে বলেই শব্দের অর্থ বলতে সক্ষম হয়েছিলাম। রোমান অক্ষরের ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষ হলে হোটেলের মালিক

চলে গেল এবং আমি দরজা বন্ধ না করেই শুয়ে রইলাম। কখন কে যে দরজা বন্ধ করে রেখেছিল তা দেখিনি। ১৯৩২ সাল, তখনও জাপানে ঘরের দরজার দরকার হ'ত ঘর হতে বের হবার জন্য। চোর ডাকাতের ভয়ে কেউ ঘরের দরজা বন্ধ রাখত না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হল আমি কোথায়? নিমেষে মনে হল, আমি আর একটি নূতন দেশে এসেছি এবং সেই দেশটি হল জাপান। তারপরই মনে হল পুলিশের কথা। পুলিশের কথা মনে হওয়া মাত্র মনটা দুর্বল হয়ে গেল। শরীরে যে নব শক্তি জন্মেছিল, তা ক্রমেই চলে যাচ্ছিল। শরীরটা অসুস্থ মনে হচ্ছিল। আবার শুবার চেষ্টা করলাম। ঘুমও এল। তারপর যখন ঘুম ভাংগল তখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আমার পক্ষে এত দেরীতে ঘুম হতে উঠা অনুচিত ছিল।

তাড়াতাড়ি করে বিছানা হতে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। একটি যুবতী আমার জন্য কিছু খাবার এনেছিল, এ তা খেয়ে যখন বাইরের ঘরে আসলাম তখন পূর্ব দিনের পরিচিত তিনটি যুবকের মধ্যে যেটি ইংরাজী বলতে পারত তাকে দেখতে পেলাম। সে আমাকে দেখা মাত্র বললে "আর একটু পরেই পুলিশ আসবেন।" আমি তার কথা শুনে মনে মনে একটু হাসলাম তারপর তারই সাহায্যে এক পেয়ালা ইংলিশ চা আনিয়ে খেলাম। আমার কিছুই বলার ছিল না, সে জন্য পথের দিকে তাকিয়ে থাকাই পছন্দ করছিলাম।

পথে লোক চলতে আরম্ভ করেছে। মজুরের দল আপন মনে মাথা নত করে কারখানার দিকে চলেছে। মজুরদের পরণে ইউরোপীয় পোষাক এবং হাতে একটি খাবার ভর্তি কাঠের বাক্স। চাষার দল জাপানী পোষাকে ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হয়েছে। তাদের পায়ে রবারের জুতা। এরূপ জুতা আমাদের দেশে দেখা যায় না। চাষাদের মাথায় টুপি ছিল না। প্রত্যেকের মাথায় এক খণ্ড কাপড় বাঁধা ছিল। দুই শ্রেণীর মজুর দেখে কত

কথাই ভাবছিলাম এমনি সময় কতকগুলি স্ত্রীলোককে পথে বের হতে দেখতে পেলাম। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে টুকরী। তারা যাচ্ছে জেঠিতে। জাহাজে তারা কয়লা উঠিয়ে দেবে। জাহাজে কয়লা উঠিয়ে দেওয়ার কাজে স্ত্রীলোক নিয়োগ শুধু জাপানেই হয়। স্ত্রীলোক মজুরদের জাহাজে কয়লা উঠিয়ে দিতে আমি অনেকবারই দেখেছি। এতে আমার মনে বেশ দুঃখ হয়েছিল। আমরা পরাধীন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক নানা মতে অত্যাচারিত হতে পারে কিন্তু স্বাধীন দেশের স্ত্রীলোককে এরূপ কঠোর কাজে নিযুক্ত দেখলে আপনা হতেই মনে বেদনা হয়। যাহা হইক এদের সুখ ও দুঃখ নিয়ে নিশ্চয়ই মতান্তর আছে। আমার দুঃখ হয়েছিল বলেই কথাটা এখানে বল্লাম।

বেলা আটটার সময় এক জন পুলিশ অফিসার এসে হোটেলে প্রবেশ করলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম পুলিশ অফিসারটি গৃহকর্তাকে সর্বাগ্রে প্রণতি জানালেন। গৃহকর্তা পুলিশ অফিসারকে বসার ঘরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখা মাত্রই দাঁত বের করে বেশ করে হেসে পুলিসের কর্তা বল্লেন, তুই সিংগাপুর থেকে কি করে এতদূর সাইকেলে এলিরে ?

আমি বল্লাম আরে আর বলিস্ না সে দুঃখের কাহিনী ; সেই দুঃখের কাহিনী না শোনাই ভাল। এখন বলত ব্যাপার খানা কি ?

তুই হলি সিংগাপুরের লোক, তোর বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট হয়েছে। যখনই শুন্‌লাম সিংগাপুরের লোক এসেছে তখনই বুঝতে পারলাম এসব মিথ্যা রিপোর্ট। তুই জানিস না আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাদের কথা আমাদের সকলেরই শুন্‌তে হয় সেই শ্রেণীর লোকের কথা অবহেলা করলে কোন মতেই চাক্‌রী থাকে না।

পুলিশ অফিসারের কথায় বাধা দিয়ে বল্লাম "তারা কি চীনা ডাকাতের মতই শক্তিশালী ; আরে বাপরে দক্ষিণ চীনে ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম, ডাকাত

বলে কি না তাদের সংগে থাকতে হবে, লেখা পড়া শিখতে হবে, লড়াই করতে হবে, এসব শুনেই আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। অবশেষে কত হাত পা ধরে বদ্‌-মাসদের হাত হতে রেহাই পেলাম। কালও তোমাদের দেশের একটা লোকের সংগে দেখা হয় লোকটাকে দেখেই মনেই হয়েছিল সে চীনা ডাকাতের মতই।

ঠিক ঠিক, তুই ঠিক বুঝতে পেরেছিস। আচ্ছা বল্‌ত, আমাদের দেশে তোর আসার কারণ কি ?

সে কথা আর বলিস না, এখান হতে যদি আমেরিকা যেতে পারি তবেই ত হয়ে গেল। আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা রে।

আমাদের দেশে কিছুই দেখবে না ?

দেখব আর কি কাল রাতেই সব বুঝতে পেরেছি। মাছ ভাজাতে তোদের দেশে নুণ দেয়না, এমন দেশে দেখার কি আছে, তবে আজ সকাল বেলা এই পথ ধরে কতকগুলি স্ত্রীলোক যেতে দেখলাম, বাস্তবিকই তারা সুন্দরী।

তোর চাই না কি ?

এসব এখন থাক কবে ওসাকা ইত্যাদি স্থানে গিয়ে এখন আমেরিকা যাবার ভাড়ার টাকা যোগাড় করি তারপর অন্যচিন্তা, বুঝলে ?

হাঁ হাঁ সব ঠিক আছে, তবে কথা হল কি, এখান থেকে তুই সাইকেলে না গিয়ে কবি পর্যন্ত জাহাজে যা, যদি কেউ বলে সিমনোসেকী হতে কি করে আসছিস্‌ তবে বলবি, সাইকেলে করেই এসেছিস। আরে তুই ত আর ইণ্ডিয়ার ইণ্ডিয়ান্‌ নস্‌, মালয়ের ইণ্ডিয়ান্‌। তোর পক্ষে এসব বিষয়ে চট্‌পট্‌ মিথ্যাকথা বলা সুবিধা হবে। তুই যদি এখান থেকে সাইকেলে যাস্‌ তবে ঐ চীনা ডাকাতের মত বদ্‌মাসরা তোর পেছন নেবে বুঝলি ?

আচ্ছা তাই হবে, এখান থেকে জাহাজে করেই কোবেতে যাব।

আজই চলে যা, ঢের সময় আছে। এখনই এক খানা টিকিট কিনে পাঠাব, টাকা দে ত ?

মনিব্যাগ হতে দশটি ইয়েন্ পুলিশ অফিসারের হাতে দিলাম। নোটখানা পকেটস্থ করে সে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে আজই যদি তোর না যাওয়া হয় তবে বিকালে আবার আসব এর মধ্যে যদি সহর দেখতে ইচ্ছা হয় তবে একাকী বের হস্‌নে। এই ছোকরা ফিরে এলে তাকে নিয়ে যেন বের হস্। পুলিশ অফিসারের কথা বুঝতে পারলাম বেশ ভাল করেই। বুঝতে পারলাম আমাকে স্বাধীন ভাবে এখানে ভ্রমণ করতে দেওয়া হবেনা।

পুলিশ অফিসার যেভাবে আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, আমি যদি সেভাবে কথা না বলতাম তবে হয়ত আমার পক্ষে জাপান ভ্রমণ সম্ভব হ'তনা।

তখনকার দিনে যে যত চীনবিরোধী কথা বলত সে ততই জাপানীদের প্রিয়-পাত্র হ'ত। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে বিদেশীরা ডাকাতই বলত এবং যে কোন লোক চীনের কমিউনিষ্টদের ডাকাতের পর্যায়ে ফেলে দিয়ে বেশ করে গাল দিত তাদের ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে প্রশংসা করত এবং ভেতরে ভেতরে হয় আহাম্মক বলত নয়ত সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট রূপেই ধরে নিত। আমাকে বোধহয় জাপানী অফিসার আহাম্মক বলেই বুঝতে পেরেছিল নতুবা এত সহজে ছেড়ে দিত না।

জাপানী পুলিশ অফিসার আমাকে তুই বলেই বলেছিল, আমিও তাকে তুই কথাটাই বলেছিলাম। মালয় ভাষায় লু (Lu) বলে একটি শব্দ আছে, সেই শব্দটির মানে হয় "তুই"। সেজন্যই তুই কথাটিই ব্যবহার করেছি।

কথার মধ্যে এমনত কুৎসিত ইংগিতও ছিল যা জাপানী পুলিশ অফিসার অনায়াসে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেজন্য আমি কি দায়ী? উচ্চে অট্টালিকার উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলব আমি সে জন্য দায়ী নই। দায়ী আমাদের দেশবাসী, যারা বহুপূর্বে মালয় দেশে গিয়ে কাজকর্ম করত। আমি মালয় দেশে ১৯২৫ সালে গিয়েছিলাম। তখন মালয় দেশে মাদ্রাজ হতে কুলি এবং অল্প সংখ্যক কেরানী গিয়েছিল। এদের পূর্বে যারা মালয় দেশে গিয়েছিল

তারাছিল জেলের কয়েদী। এসব লোককে দেখে যারা ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে কোনও মতস্থির করে নেয় আমাদের জাপানী পুলিশ অফিসার ও তার মধ্যে একজন। এতে আমার লাভই হয়েছিল।

যুবক ফিরে এল এবং আমার হাতে একখানা টিকিট দিয়ে বল্‌ল এই টিকিট আগামী কালের জন্য। আজ আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমি এতে মোটেই দুঃখিত হলাম না। সিমনোসেকী দেখার সুযোগ হল। আমি যুবককে বল্‌লাম "মহাশয় আমি এখনই নিকটস্থ খাবারের দোকানে গিয়ে রাইস্ কারী খাব, আমাকে দয়া করে সেখানে নিয়ে যাবেন কি?" "নিশ্চয়ই মহাশয়, চলুন।" আমি আর অপেক্ষা না করে যুবককে সংগে করে রেল ষ্টেশনে গেলাম এবং সেখানকার রেঁস্তোরাতে গিয়ে রাইস্ কারী দিতে আদেশ করলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে রাইস্ কারী আমাকে দেওয়া হল। আমি পেট ভর্তি করে খেয়ে বিল চাইলাম। বয় মাত্র এক ইয়েণ চাইল। আমি তাকে একটি ইয়েণ দিলাম। সে আমাকে এক ইয়েণ হতেও দশ সেন্ ফেরত দিল। কোরিয়া এবং চীনে ধনীরা এরূপ ছোট ভাংতা ফেরত নেয় না, বয়কেই দিয়ে দেয়। আমিও বয়কে দশটি সেন্ ফেরত দিলাম। বয় তা না নিয়ে বল্‌লে "Here Japan, no tip" অর্থাৎ এটা হল জাপান, এখানে কেউ এরূপ ভাবে পয়সা নেয় না। দশটি সেন পকেটে রেখে ভাবলাম, তাইত এখানকার সাধারণ লোক বড়ই সৎলোক। বাস্তবিকই জাপানের সাধারণ লোক বড়ই সৎ এবং চরিত্রবান এ কথা জাপানের শত্রুরাও বলবে।

রেল ষ্টেশন হতে বের হয়ে এসে যুবকটিকে আর দেখতে পেলাম না। তাকে দেখতে না পেয়ে কোথাও না গিয়ে পুনরায় রেল ষ্টেশনেই ফিরে এলাম এবং যুবকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। অপেক্ষা করার দুটি কারণ ছিল প্রথমত আমি জানতাম না কোন দিক দিয়ে আমি এখানে এসেছি। হোটেলে ফিরে যাবারও উপায় ছিল না কারণ হোটেলের নাম জানতাম না।

দ্বিতীয়ত আমি যদি একাকী এদিক সেদিক ভ্রমণ করতাম তবে পুলিশ অফিসারের সন্দেহও হতে পারত। এরূপ অনর্থক বিপদে পা দেওয়া আমার অভ্যাস ছিল না। ভাবলাম যে পর্যন্ত সে ফিরে না আসে সে পর্যন্ত রেল ষ্টেশনে বসে থাকলেই বা দোষ কি? এখানে বসে থেকেও অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাবে।

রেল ষ্টেশনে বসবার স্থান ছিল। আমি একটা বেন্‌চে বসে কতক্ষণ চারিদিকে চেয়ে দেখলাম তারপর দেখার প্রবৃত্তি লোপ পেল। ঘুম পেল। বসে বসেই ঘুমাতে লাগলাম। হঠাৎ পুলিশ অফিসার এসে আমাকে ডাকলে এবং বল্‌লে "তোর সংগের যুবক কোথায়?" আমি বল্‌লাম "সে আমাকে রেঁস্তোরায় বসিয়ে চলে গিয়েছিল। হোটেলে ফিরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু হোটেলের নামও জানি না এবং কোথায় বা সে হোটেল তাও ভুলে গেছি। এমতাবস্থায় এখানে বসে থাকাই ভাল হবে ভেবে বসে আছি।" চল্‌ চল্‌ তোকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি, কি করে যে এত দেশ বেড়িয়ে আসলি তা আমার মগজে মোটেই যাচ্ছে না, হাঁ টিকিটখানা আছে ত? মানি ব্যাগ হতে টিকিটখানা বের করে পুলিশ অফিসারকে দেখালাম তারপর রেখে দিয়ে লোকটার পেছন পেছন হাটতে লাগলাম। পুলিশ অফিসার হোটেলে না পৌঁছা পর্যন্ত কিছুই বল্‌ল না। হোটেলে পৌঁছে সে হোটেলের মালিককে কি বল্‌ল এবং আমাকে "তাবে" অর্থাৎ নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

আমি রুমে বসে জাপানের মানচিত্র খানা দেখছিলাম এমন সময় হোটেলের মালিক এসে আমার কাছে বসল এবং বল্‌ল পুলিশ অফিসার মহামান্য পর্যটক সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করেছেন তাতে আমি এক মত নই, তিনি বোধ হয় আপনাকে চিনতে পারেন নি। আপনি ধার্মিক এবং জিতেন্দ্রিয়। হাজার হোক পুলিশের লোক নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সকল সময় লোক চিনতে

সক্ষম হন না। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, বিকালে আপনাকে আমি বেড়াতে নিয়ে যাব। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

অনেক দিন হয় ঠিক ঠিক বিশ্রাম হয়নি। সেজন্যই বোধহয় আজ আপনা হতে ঘুমে চোখের পাতা বুঁজে আস্‌ছিল। শরীরে খাটলেই যে শুধু পরিশ্রম হয় তা নয়, মানসিক পরিশ্রমও শরীরের উপর বেশ দাগ কাটে। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত বেশ ঘুমালাম তারপর হোটেলের মালিকের সংগে নিকটস্থ পাড়াগুলি বেড়াতে বের হলাম। আমরা ছোট্ট একটি পথ ধরে চলেছিলাম। পথের দুদিকে বাসগৃহ। বাসগৃহগুলির ছানি টাইল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালগুলি কাঠের আর মেঝেটা বড় বড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। ঘরের মেঝে এতশক্ত করে বাধানো কম-দেশেই দেখতে পাওয়া যায়।

ঘরের দরজা আছে, অর্গল নাই। যে কোন লোক যে কোন সময় ঘরে প্রবেশ করে ঘরের ভেতর যা আছে সবই নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জাপানে চুরি হয় না। চুরি করা পাপ বলে গণ্য হয় না। চুরিকরা হীনকাজ বলে গণ্য হয়। আমরা বারবনিতা অথবা কসাইকে যে ভাবে ঘৃণা করি ঠিক তেমনি ভাবে চোরকে জাপানীরা ঘৃণা করে। চৌর্যবৃত্তি জাপানে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে লোপ পাওয়ায় এখন আর সেই ঘৃণ্য শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় না।

আমরা যখন পথ চলছিলাম তখন অনেকেই আমার পরিচয় চাইছিল। হোটেলের মালিক অনেকের সংগে আমার পরিচয় করে দিয়েছিল। তারা জাপানী প্রথায় আমাকে মাথানত করে অভিবাদন করত আর আমি হাত জোড় করে নমস্কার করতাম। আমরা যে পথে চলছিলাম সে পথে পলিটিক্সের গন্ধও পচ্ছিলাম না। পথে পলিটিক্সের গন্ধ পাওয়া বোধ হয় নূতন কথাই হবে। সত্যিই তাই। পথে পলিটিক্সের গন্ধ পাওয়া নূতন কথা ছাড়া আর কি হতে পারে? পথের দুপাশের গৃহস্থরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত। ছেলে মেয়েরা কেউ ঘরে বসে আর কেউ ছোট্ট পথটিতে বসে একের কাছে অন্যে নানা কথা বলছিল। আমার মত নূতন

লোক দেখেও একটুও নড়ছিল না। তারা তাদের নিজের খেলাতেই মত্ত অথবা ব্যস্ত ছিল।

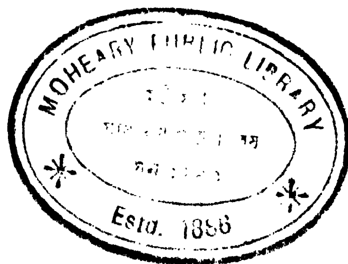
কতক্ষণ পর আমরা একটি ছোট্ট বৌদ্ধ মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দিরে প্রবেশ পথে একটি তোরণ দ্বার। দুদিকে দুখানা সেণ্ড ষ্টোন তারই উপর আর এক খানা সেণ্ড ষ্টোন অতি কৌশলে স্থাপন করা হয়েছে। এরূপ তোরণ দ্বার জাপানের সর্বত্র বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের খাঁটি বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতেও সেরূপ তোরণ দ্বার দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে খাঁটি বৌদ্ধমন্দিরের সংখ্যা খুব কম। গুজরাটে খাঁটি বৌদ্ধ মন্দির কয়েকটি দেখেছি মাত্র। আমাদের দেশে বৌদ্ধ মন্দিরের উপরও কম উৎপাত হয়নি।

তোরণ দ্বার পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দির কাঠের। ভেতরে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ ভাবে বসা। চীনা বৌদ্ধ মন্দিরের মত এখানে নানারূপ বার্তি দেখতে পেলাম না। মূর্তির সামনেটা বেশ পরিষ্কার; মন্দিরের পুরোহিতকে দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। লোকটি অন্য কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মন্দিরে লোক এসেছে শুনে মন্দিরে প্রবেশ করেই গৈরিক আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে পুরোহিত সেজে পুরোহিতের কাজ করতে লাগল। আমরা প্রত্যেক কুড়ি সেণ্ট করে দিলাম। পুরোহিত আমাদের আশীর্বাদ করল। আমি সে আশীর্বাদ বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করলাম। অনেক সময় দায়ে পড়েও এরূপ আশীর্বাদ নিতে হয়। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অন্যান্য লোক যখন টাকা কর্জ নিতে আসে তখন তাদের ব্রাহ্মণ ভক্তি বৃদ্ধি হয়। টাকা কর্জ হয়ে গেলে সেরূপ ভাবে আর ব্রাহ্মণ ভক্তি থাকেনা। আমারও সেই অবস্থা। কি জানি এরা আমার স্বরূপ বুঝতে পারে এই ছিল ভয় সেই ভয়কে এড়াবার জন্যই অশীর্বাদ গ্রহণ করা।

মন্দিরটি দেখে আমি সুখীই হয়েছিলাম। জাপানী পুরোহিতগণ জুয়াচোর নয়। তারা বিয়ে করে ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করে, দরকার হলে অন্যকাজ করে জীবিকাও অর্জন করে। পৃথিবীতে যত রকমের পৃষ্ট অর্থাৎ পুরোহি

দেখলাম তার মধ্যে জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতগণই ভাল লোক বলে মনে হল কারণ তাদের মধ্যে বুজরুকি নেই। ভবিষ্যতে কি হবে তা বলা বড়ই শক্ত কারণ পরে বুঝতে পেরেছিলাম জাপানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ অন্য ধরণের। তারা প্রগতিশীল সাহিত্য ভালবাসে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে বড় ইচ্ছুক। তাদের মধ্যেও গোপনীয় সমিতি গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেও রাজদ্রোহ এসে দেখা দিয়েছে। রাজদ্রোহ বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। জাপানের বৌদ্ধ পুরোহিত গণ সম্রাটের পক্ষপাতী মোটেই নয়। তারা সিন্‌টোইজম্ হতে যত দূরে সড়ে পড়েছে ততই রাজাকে দেবতা বলে গণ্যকরতে রাজি হচ্ছে না। তবে আমার অনুধাবনের বিষয়বস্তু শেষ পর্যন্ত কার্যকারী হবে কি না তা বড়ই সন্দেহের বিষয়।

সন্ধ্যার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাত্রের খাবার খেয়ে শুয়ে থাকলাম। পুলিশ অফিসার বিকালে আসল না। তিনটা যুবককেও আর দেখতে পেলাম না। আমার মনে হ'ল পেঁচা পাখীর পিছনে লোক নিযুক্ত করা পুলিশ অফিসার দরকার মনে করে নি।



কোবের পথে

পরের দিন সকালবেলা জাহাজে গিয়ে উঠলাম। জাহাজে তখনও সকালের খাদ্য কেউ খায় নি বলে আমিও ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসতে পেরেছিলাম। জাহাজের খাদ্য খেয়ে বেশ তৃপ্ত হ'য়েছিলাম। ত্ব'দিনের মনের কষ্ট অনেকটা হালকা হয়েছিল। জাহাজের ডেকে যখন বেড়াতে গেলাম তখন আমার হোটেলওয়ালার সংগে সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। সে কিন্তু আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করতে পারিনি। সে বোধ হয় পুলিশ কর্তিক আমার গতিবিধি দেখার জন্য নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁকে এড়াবার জন্য জাহাজের ডেক হতে নেমে স্মোকিং রুমে আসা মাত্র পুলিশের সংগে হল দেখা। আমাকে দেখা মাত্র লোকটি আমার সংগে সভ্য ভাষায় কথা বল্‌ল এবং জানিয়ে দিল কোবেতে পৌছার পর আমার আর কোন কষ্টই হবে না। তার কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আমি পুনরায় পুলিশ অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখানেই একটি চেয়ারে বসে পড়লাম এবং হোটেলওয়ালার কথা চিন্তা করতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, হোটেলওয়ালা অনিচ্ছায় জাহাজে এসেছিল। যারা অনিচ্ছায় কোনও অন্যায় কাজ করে তাদের মুখেই কালিমার দাগ পড়ে। কতক্ষণ পর পুলিশ অফিসারকে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে যারা আমার প্রতি সন্দেহ করেছে তারা কে ?

পুলিশ অফিসার বল্‌লে, যে ধরণের লোক আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং তারাই আপনাকে জাপান ভ্রমণের অধিকারও দিয়েছে।

পুলিশ অফিসারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম তারা কে মশাই ?

তাদের সম্বন্ধে অনেক বলা হয়েছে, হয়ত আপনার ভ্রমণ পথে তাদের সংগে দেখাও হতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে আমার তখনও জানা ছিল না, এরা কারা? তবে এটা ঠিক ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম যে, যাদের সম্বন্ধে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলা হচ্ছে তারা জাপান সরকারের লোক নয়। চীনে থাকার সময় ব্ল্যাক ড্রাগনিষ্টদের নাম শুনেছিলাম। তাদের একজন জেনারেলের সংগে আমার সাক্ষাৎও হয়েছিল। এদের প্রাধান্যের কথা কিন্তু তত জানা ছিল না। কোবেতে পৌছার পর জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগনদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম টোকিও পৌছে তার চেয়েও বেশী শুন্‌তে পেয়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম এই ব্ল্যাক ড্রাগনই জাপানের যেমন উন্নতির একমাত্র কারণ তেমনি তারাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীর পরাজয়েরও কারণ। অবশ্য এসব কথা আমাকে পরে বলতেই হবে তবে এখন এখানে এ বিষয়ে যতটুকু কম বলা যায় ততই ভাল।

জাপানী পুলিশ অফিসার আমার কাছ হতে বিদায় নেবার পুর্বে জাপানী ঢংগে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল। এরূপভাবে কোনও দেশের পুলিশ অফিসার আমার কাছ থেকে বিদায় নেয় নি। বাস্তবিকই জাপানের সিভিল পুলিশ সর্বসাধারণের সংগে ভাল ব্যবহার করতে প্রস্তুত কিন্তু তাদেরও অনেক সময় প্রহসন করতে হয়। জাপানী পুলিশ অফিসারকে বিদায় দিয়ে আমি তার প্রথম দিনের ব্যবহারের কথা অনেকক্ষণ ভবলাম। ভাবনা নানা রকমেরই করতে হয়েছিল। নিজের সুখ সুবিধা দিয়ে বিবেচনা করেই সকল কথা চিন্তা করছিলাম। নিজের সুখ সুবিধা বড়ই আজব চিজ। এই বুঝি গেল, এই বুঝি এখানেই শেষ। এরূপ হবার প্রধান কারণ হল, জাপানকে দেখতে হবে, জাপানকে জানতে হবে, এতে যদি ছাই পড়ে তবেই হবে জীবনের দুঃখ। এ দুঃখ যাতে না হয় তারই জন্য এত চিন্তা ভাবনা। চিন্তাভাবনারও

শেষ আছে। নূতন দিকে চিন্তা স্রোত বয়ে চলল্। ইচ্ছা হল একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়াতে বের হলাম। আকাশে সুন্দর সূর্য আর নীচে নীল জল। সামনেই সিমনোসেকী বন্দর। চারদিকে নানারূপ ছোট বড় জাহাজ। কেউ জাহাজ নিয়ে ডকে আসছে আর কেউ জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এরূপ দৃশ্য বন্দরগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়। যদিও এরূপ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় তবুও বন্দরের দৃশ্য সকল সময়ই নূতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও বন্দরের নূতনত্ব যায় না। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকে আবার কেবিনে গেলাম। সেখানে নূতনত্ব নেই, সেজন্য পুনরায় স্মোকিং রুমে চলে এলাম।

স্মোকিং রুমে কোনও লোক দেখতে পেলাম না। একটু দূরে যেন একটি প্রস্তর মূর্তি রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হল। দেড় ঘণ্টা পূর্বে যখন এখানে এসেছিলাম তখন ত এটাকে দেখিনি। একটু তাজ্জব লাগল বলতেই হবে। আমি প্রস্তর মুর্তিটার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম ইচ্ছা সামনের দিকে যাই। সামনের দিকে এসে দেখতে পেলাম এটা প্রস্তর মূর্তি নয়, একটি জীবন্ত লোক বসে আছে। লোকটি অতিকায়। যেমন লম্বা তেমনি মোটা। আমাকে দেখেই লোকটি একটু হাসল এবং করমর্দন করার জন্য তার ডান হাত বার করে দিল। আমি তার মোটা হাতটা আমার হাত দিয়ে ধরতে না পেরে তার দুটি অঙ্গুলি ধরেই করমর্দনের সুখ অনুভব করলাম। সে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল এবং কি বল্‌ল আমি তার কথা বুঝতে না পেরে আমার পরিচয় পত্র দিলাম। সে পরিচয় পত্রখানা পড়ে তার একখানা কার্ড দিল। সেই কার্ডে তার নাম এবং কোথায় সে থাকে তা জাপানী এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত ছিল।

যখন অতিকায় মানবটির কাছে বসেছিলাম তখনই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। জাহাজ মুজি নামক বন্দরটি ছুঁয়ে কোবেতে যাবে তা শুনতে পেয়েছিলাম, সেজন্য মুজি বন্দরে নামব তাও ঠিক করে রেখেছিলাম। মুজি বন্দরে জাহাজ পৌছতে

এক ঘণ্টা লাগল। এক ঘণ্টা সময় কেবিনে বসেই কাটিয়ে ছিলাম। জাহাজ পৌছানর পর স্ত্রীলোকেরা কয়লা বোঝাই করতে আরম্ভ করল। কেবিনে বসেই সে দৃশ্য দেখলাম এবং ভাবলাম জাপানীরা কতই অন্যায় কাজ করছে। আমাদের দেশে কয়লার খনিতে স্ত্রীলোকগণ যে মজুরী করে তাহা আমার জানা ছিলনা। সেইজন্যই জাপানীদের স্ত্রী মজুর নিয়োগের জন্য দোষ দিয়েছিলাম।

মুজি বন্দরটি কিয়োস্থ দ্বীপের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত। কিয়োস্থ দ্বীপের নাগাসাকি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানেই ডাচরা সর্বপ্রথম অবতরণ করে এবং কুহীকারে বসবাস করে। ডাচদের পরই এখানে পর্তুগীজরা অবতরণ করে এবং স্থানীয় লোকের মধ্যে যেমন বাণিজ্য করে লাভবান হয় তেমনি ধর্ম এবং পর্তুগীজ ভাষার প্রচলন করতেও কসুর করেনি। পর্তুগীজদের অমায়িকতা এবং সর্বসাধারণের সংগে মিলামিশা করার অভ্যাস থাকায় পর্তুগীজরা জাপানী অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়েছিল, সেজন্য কিয়োস্থ দ্বীপের লোক এখনও পর্তুগীজ ভাষা এবং খৃষ্ট ধর্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখেনা। কিয়োস্থ দ্বীপের বড় বড় খৃষ্ট ধর্মমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার খৃষ্টানরা সনাতনী এবং কিয়াস্থ দ্বীপের এখনও অনেক জাপানী খৃষ্ট ধর্মকেই বাইরের ধর্ম বলে ঘৃণা করে না।

জাপানে একই লোক সাধারণত দুটি ধর্ম মেনে চলে। সর্বপ্রথম ধর্ম হ'ল সিন্‌টোইজম। এই ধর্মকে কোনও জাপানী কোন মতেই পরিত্যাগ করেনা। তারপর হল বাইরের ধর্ম। তা বৌদ্ধ, কন্‌ফিউসিয়ান অথবা খৃষ্ট ধর্ম হলেও কিছুই আসে যায় না। পিতৃপুরুষকে পূজা করা এবং তৎসংগে সিন্‌টোকে মেনে চলাই হল আদি এবং অকৃত্রিম ধর্ম। আর যত সবই বাইরের অর্থাৎ হলে হল না হ'ল ত বয়ে গেল ইত্যাকার ধরণের ভাব।

সিমনোসেকী, মুজি এবং ওসাকার মধ্যে যে সাগরটি অবস্থিত তার উত্তর দিকে হন্‌সু দ্বীপ আর দক্ষিণ দিকে হল কিয়োস্থ এবং শিকোকু দ্বীপদ্বয়। এই উপসাগর হতে বের হবার মাত্র তিনটি প্রণালী রয়েছে নতুবা এই সাগরটিকে

সাগর না বলে হ্রদ বলতে হ'ত। এই সাগরটির ইংরাজী নাম হ'ল "ঈনার সি অব জাপান" এখন এই শব্দ কয়টি কি যদি খাঁটি ভারতীয় নাবিক ভাষায় অনুবাদ করা হয় তবে বলতে হবে "জাপানী অন্দর দরিয়া"। জাপানী অন্দর দরিয়া যদি বলা হয় তবে অনেকেরই সে কথাটা ভাল লাগবে না। তাবলে আমি কি করতে পারি? সর্বপ্রথম সামুদ্রিক চাকুরিতে যারা গিয়েছে তারা হল বঙ্গের মৎস্যজীবী আর পূর্ববংগের মুসলমান। তাদের মুখের কথাই আমি বলছি, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিনি। শিক্ষিত লোক যদি এদের পূর্বেই সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তেন তবে হয়ত শব্দটির কোনও ভাল রূপ হ'ত।

এখন আমি সেই সমুদ্র এবং তার তীরবর্তী বন্দরগুলিতে যাহা দেখেছি তারই কথা বলছি। মুজিতে নামার সময় হল না কারণ জাপানী স্ত্রীলোকগণ তৎপরতার সহিত তাড়াতাড়ি দরকারী কয়লা বোঝাই করে দেবার পরই জাহাজ ছেড়ে দিল। অনেকগুলি নূতন যাত্রীও উঠল। আমি নূতন যাত্রীদের চাল চলন লক্ষ্য করতে আরম্ভ করলাম। যাত্রীদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধও ছিল। তারা স্ব স্ব স্থানে বসে চিন্তাশূন্য হতে চেষ্টা করছিল। অনেকে আপন মনে গালবাদ্য করছিল। তাদের গালবাদ্য দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পূজা মনে মনেই করছে।

এদের গালবাদ্যের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিলনা। আমি দেখছিলাম এদের মুখাকৃতি। মুখাকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল, এদের সংগে ব্রাউন মোগলদের সম্বন্ধ রয়েছে বটে কিন্তু এদের গোঁফ দাড়ি দেখে মনে হচ্ছিল এরা ব্রাউন মোগলদের চেয়েও পুরাতন মানুষ। ব্রাউন মোগলরা এখনও নিশ্চিন্ত মনে একই স্থানে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারে না। নিষ্ঠা সকল জাতের লোকের মধ্যেই কমবেশী আছে, কিন্তু যাদের মধ্যে সভ্যতার যত বেশি ছাপ পড়ে তাদের মধ্যেই নিষ্ঠার প্রভাব বেশি। সে হিসেবে জাপানীরা পূর্বদেশের অনেক জাতকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে যদি বলি তবে অনেকের রাগ হবে। অনেকেই

বলবেন এই সেদিন জাপানীদের বিরুদ্ধে এত কথা শুনলাম আর আজ হঠাৎ নূতন কথা শুনছি। আমার লেখা মরণ বিজয়ী চীন, লাল চীন, প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তিতে জাপানীদের বিরুদ্ধে এসব অনেক কথা পড়েছেন যাতে মনে হবে জাপানীরা মানুষ নয় অমানুষ এবং নরপশু। কিন্তু মনে রাখতে হবে উল্লিখিত বইগুলিতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রূপ দেখান হয়েছে। জাপানী জাতের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ এক বস্তু আর জাতের বৈশিষ্ট্য আর এক বস্তু। কলকাতাতে টেগার্ড সাহেবের রূপ দেখে অনেকেই কাঁপতেন, সেই টেগার্ড সাহেব যখন তাঁর জন্মভূমিতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর রূপ বদলাতে হয়েছিল। যদি তিনি রূপ না বদ্‌লাতেন তবে গ্রেটবৃটেনে থাকতেন কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় ছিল। জুজুৎসু জাপানে যদি মরণ বিজয়ী চীনের অথবা অন্য কোনও বইএর স্বপ্ন দেখা হয় তবে মস্ত ভুল হবে।

জাপানীরা যে কতদূর নিষ্ঠা পরায়ণ তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, এতেই বুঝতে পারা যাবে জাপানীদের মধ্যে সাধারণ জীবনের কতটুকু উন্নতি হয়েছে। ভারতের বাইরে জনৈক ভারতবাসীর কুৎসিত রোগ হয়। ভদ্রলোক ছিলেন পদস্থ লোক। ভারতীয় ডাক্তারদের কাছে রোগের কথা বলতে তাঁর ভয় এবং লজ্জা হচ্ছিল। কয়েকদিক পর যখন রোগ তাঁকে কাবু করল তখন তিনি ভারতীয় একশত মুদ্রা দিয়ে একজন ভারতীয় ডাক্তারকে বাড়িতে আনেন। ভারতীয় ডাক্তার ভিজিটের টাকা ত নিলেনই উপরন্তু সেই শহরে রোগাক্রান্ত লোকটির বদনাম প্রচার করতেও কুন্ঠিত হলেন না। ভারতীয় ডাক্তারকে ডাকার ফলে হিতে বিপরীত হচ্ছে দেখে তিনি আমার স্মরণাপন্ন হন। আমি তৎক্ষণাৎ এক জাপানী ডাক্তারকে ডেকে আনি। জাপানী ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে সংগে নিয়ে ভারতীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসেন এবং ভারতীয় ভদ্রলোকের চিকিৎসার ভার নেন্।

জাপানী ডাক্তারের ঐকান্তিক পরিশ্রমে এবং তাঁর স্ত্রীর শুশ্রূষায় ভারতীয়

ভদ্রলোক নীরোগ হন। আমিও সেই ভারতীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে কয়েক দিন ছিলাম। তখন লক্ষ্য করে দেখেছি, ডাক্তারের স্ত্রী অতি নিপুণতার সহিত ভারতীয় প্রথামতে গৃহকার্য হতে আরম্ভ করে রান্না পর্যন্ত করতেন। দরকার হ'লে কাপড়ও কাচতেন। জাপানী মহিলার প্রত্যেকটি কাজে নিষ্ঠা দেখে মনে হত, ভারতীয় ভদ্রলোকের ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী এসে কাজ করছেন। নিষ্ঠা যে কি জিনিস তা যদি উপলব্ধি করতে হয় তবে নিজের মনটাকেও একটু এগিয়ে নিতে হয়। শুধু নিজের সবই ভাল এই অহমিকার ভাব পোষণ করলে চলে না।

মুজি হতে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন জাপানী খালাসীরা জাহাজ পরিষ্কারে নিযুক্ত হল। প্রত্যেকটি খালাসী আপন আপন কাজ যত্নের সহিত করে যেতে লাগল। তাদের মুখে একটুও কথা যেমন ছিল না, হাসিও তেমনি ছিল না। কাজ শেষ করে তারা চলে যাবার পর আমার ইচ্ছা হল জাপানী খালাসীরা কি করে জীবন কাটায় তাও দেখতে হবে।

ঘণ্টা খানেক পরে আমি খালাসীদের কেবিনের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে দেখা হল একজন ষ্টোর কিপারের সংগে। লোকটা ভয়ানক পাজী। সে আমাকে নীচে যেতে দেবেই না গোঁ ধরল। আমিও নাছোড় বান্দা। উপরে গিয়ে কাপ্তানের কাছ থেকে জাহাজের সর্বত্র বেড়িয়ে দেখবার আদেশ নিয়ে এলাম। ষ্টোর কিপারের ধরনের লোকই হল সাম্রাজ্যবাদী এবং জাপানে উগ্র-স্বাসনালিপ্ত বলে পরিচিত। এদের অপর নাম ফ্যাসিস্ত। ফ্যাসিইজম জাপানে নূতন চিজ নয়। যারা জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন পড়বেন তারাই ভাল করে বুঝবেন জাপানী ফ্যাসিইজম মুসোলিনী অথবা হিটলারের জন্ম নেবার কত পূর্বে জাপানে জন্ম নিয়েছিল। ষ্টোর কিপার শ্রেণীর লোককে বিদেশীরা যেমন ভয় করে চলে তেমনি জাপানীরাও ভয় করেই চলত।

কাপ্তানের কাছে আদেশ নিয়ে যখন আমি জাহাজের নীচের ডেকে

যাচ্ছিলাম তখন আর ষ্টোর কিপারটাকে দেখতে পাই নি। সর্বনিম্ন তলায় গিয়ে দেখলাম খালাসীরা কাজে বের হয়ে গেছে। মাত্র একজন লোক খালাসীদের বিছানাগুলি নূতন করে পালটিয়ে দিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় আমাকে দেখাবার জন্যই খালাসীদের ভাল ভাল বিছানা দেওয়া হচ্ছে। পরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম, জাপানী খালাসীরা গদিযুক্ত বিছানাই পেয়ে থাকে। আমাদের দেশও স্বাধীন হউক, তখন আমাদের খালাসীর কাজও লোভনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে যখন খালাসীরা খেতে বসেছিল তখন আবার আমি তাদের কেবিনের দিকে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম, খাবারের দিক দিয়ে জাপানীরা চীনাদের চেয়ে একটুও বেশি সভ্য হয়নি। যারা চীনাদের খাবার খেতে দেখেছেন তারাই বুঝতে পারবেন তারা কত নিরীহ ভাবে জাহাজে খাবার শেষ করে। চীনা খালাসীদের তবুও টেবিল থাকে এবং বসবার জন্য টেবিলের ব্যবস্থা হয় কিন্তু জাপানী খালাসীরা ভারতীয় খালাসীদের মত জাহাজের ডেকে বসে দুখানা কাঠির সাহায্যে খায়।

সর্বপ্রথম তারা স্যুপ খেল। স্যুপে ছিল মূলা পাতা এবং সামান্য শূকর মাংস। তাই তারা চামচ দিয়ে এক এক পেয়ালা খেয়ে নিয়ে সেই পেয়ালা গরম ভাত ভর্তি করে নিল এবং দুই ইন্‌চি লম্বা এক একটি সেলমন মাছ প্রত্যেক বার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে সামান্য ভাত কাঠির সাহায্যে মুখে ঢুকাতে লাগল। প্রত্যেকটি খালাসী ডজন খানেক সেলমন মাছ এবং দু'তিন পেয়ালা করে ভাত খেয়ে পেট ভরে গ্রিন চা খেয়ে তৃপ্তির সহিত উঠে দাড়াল। এক ডজন সেলমন মাছে কতটুকু ভিটামিন থাকে কে জানে? কিন্তু এই খাদ্যই হল সাধারণ জাপানীর খাদ্য। অবশ্য এই খাদ্যটাকেই তারা স্ব স্ব গৃহে নানারূপ ভাবে পাক করে খায়। প্রকৃত পক্ষে জাপানী খাদ্য গুলো বড়ই বলকারক।

খালাসীদের সংগে আমার একটিও কথা হয় নি। লক্ষ্য করে দেখেছি

তারাও আমার সংগে কথা বলার জন্য অগ্রহান্বিত ছিল না। সেজন্যই বিনা বাক্য ব্যয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়েছিল।

মিজু হতে কোবে মাত্র একশত পঁচিশ সামুদ্রিক মাইল। কিন্তু এই পথটুকু চলতে আমাদের পাক্কা আটাশ ঘণ্টা লেগেছিল। জাহাজ এত মন্থর গতিতে চলার প্রথম কারণ হ'ল, আমাদের অনেক ছোট ছোট বন্দরে জাহাজ থামিয়ে মাল বোঝাই করতে হয়েছিল। নব্বই বৎসর পূর্বেও যখন জাপানীরা বিদেশীর সংগে ব্যবসাবাণিজ্য করত না তখন এই ছোট্ট উপসাগরটিতে কিন্তু জাপানীরা নিজেদের ছোট ছোট নৌকার দ্বারা ব্যবসা চালিয়ে যেত। এতে সামুরাই শ্রেণীর লোক কৃষক এবং মজুরদের উপর কোনও জোর জুলুম চালাত না আজও এই ছোট্ট উপসাগরটিতে জাপানীরা তাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালায় বটে কিন্তু তাদের নিজের দেশের কোম্পানী পরিচালিত বায়ুপোতের সংগে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয় না। জাহাজ অনেক স্থানেই থেমেছিল কিন্তু এই স্থানগুলি আমাদের কাছে তত প্রসিদ্ধ নয়। সেজন্য আমি এসব স্থানের কথা না বলাই সংগত মনে করলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে আমাদের জাহাজ একটি ছোট্ট বন্দরের সামনে থেমেছিল। বন্দর হতে একটি লোকও জাহাজটাকে দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নি। জাহাজ আবার যখন দাঁড়িয়েছিল তখন একটি মাত্র যুবক অন্যত্র কোথা হতে সামপান যোগে বন্দরে আসছিল। সে জাহাজ দেখে অথবা অন্য কোন কারণেই হউক আপন মনে উচ্চস্বরে গান গাইছিল। আমি অনেক বার জাপানে গিয়েছি এবং জাপানের অনেক গণ্ডগ্রামেও গিয়েছি কিন্তু এমনি ধরণে গান গাইতে কাউকে শুনিনি।

গান হল অমৃত। অর্থ বিনিময়ে যেসকল গান গাওয়া হয় এবং তার সংগে সুর ও লয় যোগ করা হয় তখন সেই গান হয় বিষ। গান সকলে সকল সময় গাইতে পারেনা। গান আপনা হতে যখন গায়কের কণ্ঠ হতে বের হয় তখন তাই

হয় অমৃত। সেই গানের সাহায্যার্থ যদি সুরের সংযোগ হয় তবে হয় সোনায় সোহাগা। জাপানী যুবক গান গাইছিল আর আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। তার গানের সংগে তার শরীরের নিকট সম্বন্ধ ছিল। যুবকের পূর্ণ যৌবন। সে যৌবন আবার নিখুঁত। নিখুঁত যৌবনের উচ্চস্বরের বিরহ গান বাস্তবিকই প্রাণে প্রবল আঘাত করে। আমার প্রাণেও যুবকের গান আঘাত করছিল। আমি কতক্ষণ তার গান শুনছিলাম। যুবক গান গাইতে গাইতে একটি দ্বীপের অন্তরালে চলে গিয়েছিল। তার গান যখন শোনা যাচ্ছিলনা তখন আমার মনে হচ্ছিল যুবকের গান নিয়ে একটু গবেষণা করা দরকার।

যুবকের গানের সুরে ব্রাউন মোগল টান ছিল। টিবটো বর্মণদের গানের মত হঠাৎ উত্থান এবং পতন ছিল। আর ছিল জল তরংগ উচ্ছ্বাস। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রে উঠে সমুদ্রেই লোপ হয় ঠিক তেমনি যুবকের জল তরংগ ভাব তার মাঝ থেকে উঠে তার জাতের অন্তঃস্থলেই লোপ পেয়েছিল।

জাহাজ ছাড়ল। ধীর সমীরণে সকল যাত্রীর মনেই নবচেতনা এনে দিল। সকলেই কেবিন হতে বের হয়ে এসে পশ্চিমাকাশের দিকে নীরবে চেয়ে রইল। সকালে পূর্বাকাশের দিকে তাকাই। কেন তাকাই তা কেউ বলতে পারেনা। আবার যখন পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যায় তখনও আমরা পশ্চিমাকাশের দিকে তাকাই, কেন তাকাই তার কথাও কেউ বলতে পারি না। সূর্য যখন অস্ত গেল, আঁধার যখন ঘনিয়ে এল তখন সকলেই আপন আপন কেবিনে চলে আসলাম। ফিরে আসার সময় মনে হল প্রত্যেকেই যেন কি ফেলে দিয়ে চলে এসেছি।

রাত যেন আনন্দেই কাটল কারণ দুজন জাপানী যুবক আমার সংগে বেশ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কথায় কোনরূপ পলিটিকেল ইংগিত ছিলনা। কথা প্রসংগে তারা পূর্বদেশগুলির অক্ষমতা এবং পূর্বপুরুষদের অদূর-দর্শিতার কথাই বলছিল। তারা বলছিল, গুণগরিমায় ভারত চীন মিশর, জাপান

বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু কি করে জাতের গঠন করতে হয়, কি করে বাণিজ্য বিস্তার করতে হয় সেদিকে পূর্বদেশের লোক একটুও মন দেয়নি। পূর্বদেশের লোক শুধু ধর্মান্ধ হয়েই রয়েছিল। তাদেরই কুকর্মের ফলে, অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা আজ ইউরোপীয়াণদের করতলগত।

এই দুটি ছাত্র বিদেশী সাহিত্যে বড়ই আগ্রহান্বিত। বিদেশী সাহিত্য পড়বার জন্যই তারা ইংরাজী ভাল করে শিখছিল। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি করে তারা তাড়াতাড়ি ইংরাজী শিখতে সক্ষম হবে? আমি বলছিলাম, যদি তারা ছোট এবং সহজে বুঝা যায় এমনতর ইংরাজী গল্পের বই পড়ে তবেই তাড়াতাড়ি ইংরাজী শিখতে সক্ষম হবে। এদের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম অনেকগুলি জাপানী যুবক রুষ ভাষা শিখেছে এবং তাদেরই অনুকম্পায় বর্তমানে জাপানী ভাষায় অনেক রুষ সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে। এই যুবকদের সংগে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে শুতে হয়েছিল।

পরদিন সকাল বেলা আমাদের জাহাজ সমুদ্রতীরের কাছ দিয়ে চলছিল। আমরা জাপানের অনেক গ্রাম দূর হতে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি যখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে জাপানী গ্রামের দৃশ্য দেখছিলাম তখন দুটি যুবক এসে আমাকে বিদেশী ধরণে সুপ্রভাত জানিয়ে বল্‌ল, যদি কিছু না মনে করেন তবে আমাদের সংগে খেতে আসুন। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

তারা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সেখানে জাপানী খাদ্য ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। জাপানী খাদ্য আমার কাছে পরিচিত। অনিচ্ছায় পেট ভরে খেলাম এবং মুখে "ভালখাদ্য" বলে বেশ প্রশংসা করলাম।

জাপানী যুবকদ্বয় আমার কথায় একটু রাগ প্রকাশ করে বললে মাননীয় অথিতি, জাপানী খাদ্য মোটেই ভাল নয় সেকথা আমরা জানি। জাপানী খাদ্য কোনও বিদেশী তিন দিনের বেশী খেতে পারে না। চীনা খাদ্য হলে কোনমতে সাতদিন চালানো যায়। আমরা কিন্তু অন্ধ জাতীয়তাবাদী নই। আমরা

ভালকে ভাল বলতে শিখেছি। জাপানী খাদ্য মোটেই ভাল নয়। সর্বপ্রথম এদের কাছেই ভাল নয় শুনলাম। তারপর প্রতিবাদ করে বললাম, জাপানী খাদ্য আমার কাছে ভাল না হতে পারে কিন্তু আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই ভাল।" জাপানী যুবকদ্বয় প্রতিবাদ করে বললে তাও নয়, আমাদের কাছেও নয়। আপনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, গতকল্য রাত্রে আপনি যে খাদ্য খেয়েছেন তাই হল সব চেয়ে ভাল খাদ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইউরোপীয়ান খাদ্য দেওয়া হয়। আমি প্রকাশ্যেই বললাম, "আপনারা দেখছি ইউরোপীয়ান ঘেঁসা।" জাপানী যুবকদ্বয় বলল, ভুল করেছেন আমরা মোটেই ইউরোপীয়ান ঘেঁসা নই, আমরা শুধু ভালকে ভাল বলতে শিখেছি। ইণ্ডিয়ান রাইস্ কারী খুব ভাল, তা বলে ইণ্ডিয়ান প্রত্যেকটি খাদ্যকে আমরা ভাল বলিনা। দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা প্রথম শ্রেণীতে যে খাদ্য দেওয়া হয় তা ইউরোপীয় খাদ্য নয়। অনেক ইউরোপীয়ানের ভাগ্যে সেরূপ খাদ্য সারাজীবনেও জোটে না। ইউরোপের ধনীরাও এরূপ খাদ্য সকল সময় পছন্দ করেনা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে খাদ্য দেওয়া হয় তা শুধু জাহাজের যাত্রীরাই কয়েক দিন আনন্দ করে খায় তারপর তারা হাঁপিয়ে ওঠে। অনেক দিন পর তারাও পিঁয়াজ এবং আলু সিদ্ধ খাবার জন্য উৎসুক হয়। মাননীয় অতিথি দয়া করে একদেশদর্শী হবেন না। এই আমাদের অনুরোধ।"

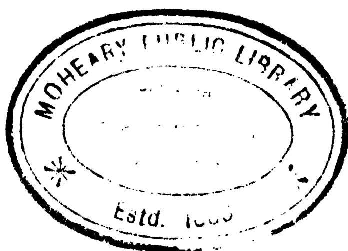
এবার মাননীয় অতিথি আমাদের দেশ ভ্রমণ করবেন তা আমরা জানি। অনেকে হয়ত মাননীয় অতিথিকে ঘৃণা করবে, কেউ আদর করবে, আর কেউ তাড়িয়ে দেবে, এসব দিয়ে যদি আমাদের দেশের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন তবে আপনারই ক্ষতি হবে, আমরা যেমন আছি, তেমনি থাকব। দ্বিতীয় কথা হল, মাননীয় অতিথি চীনে এবং কোরিয়াতে অনেক জাপানী দেখেছেন, তারা হল, সাম্রাজ্যবাদী। অনেক সময় আমরাও তাদের ব্যবহারে হয়রাণ হই। বিদেশের জাপানী দেখে যদি মাননীয় অতিথি এদেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণা পোষণ করেন তবে আমরা বড়ই দুঃখিত হব। আপনি যখন জাপান

সম্বন্ধে বই লিখবেন তখন চীন অথবা কোরিয়াকে জড়াবেন না। জাপানে যা দেখবেন তারই কথা দয়া করে লিখবেন।

আমার হৃদয়ে জাপানের বিরুদ্ধে এমন একটি ভাব লুকিয়ে ছিল যে ভাবটি যখন তখন জাপানীদের আক্রমণ করত। আজ এই যুবকদ্বয়ের ব্যবহারে সেই ভাবের অনেক কিছু লোপ হল। কোবেতে জাহাজ আসার পর আমি জাপানী যুবকদ্বয়ের করমর্দ্দন করে তীরে উঠতে যাচ্ছি এমনি সময় একটি যুবক বল্‌লে "আমাদের সংগে পুনরায় দেখা করবার ইচ্ছা আপনার হয়?" কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না এমনি সময় একটি যুবক বললে আচ্ছা আমরাই দেখা করব। কোবেতে কত দিন থাকবেন ?

তা বলতে পারি না।

যতদিন ইচ্ছা থাকুন, আমাদেরও কাজ আছে, আমাদের দেখা পাবেন, বিদায়।



কোবেতে প্রথম কয়েক দিন

তীরে উঠবার সময়ই দুইজন যুবক সম্বন্ধে একটা বদ্ ধারণা হল। আমার মনে হল এরা হয়ত আমার পেছন নেবে। তীরে উঠে কিন্তু এদের আর দেখতে পেলাম না। যাকগে বাঁচা গেল। জাপান দেখতে এসেছি, জাপানী পলিটিক্সের আমি কি ধার ধারি? কিন্তু যাকে যত ঘৃণা করা যায় সেই ঘাড়ে এসে চাপে বেশি। জাপানী পলিটিক্স আমার অজানিতে ঘাড়ে এসে চেপেছিল। জাপানীদের পলিটিক্স ঘাড় হতে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পেরে উঠিনি।

তীরে উঠেই ভাবলাম এবার কোন দিকে যাই? কারো বাড়িতে যাওয়া কি আমার উচিত হবে? মন বল্‌লে যদি কোনও ভারতীয়ের বাড়িতে না যাই তবে আমেরিকা যাবার পাথেয় যোগাড় হবে না। মন বড়ই স্বার্থপর অপর দিকে বড়ই স্বাধীন সেজন্য সহরে সহজে যেতে ইচ্ছা হল না। পথ চলতে লাগলাম। সমুদ্রতীর দিয়ে সুন্দর পিচ দেওয়া রাস্তা চলেছে। আমি সেই পথের পথিক। ডানদিকের সাগরের দৃশ্য আর বাঁদিকের পাহাড়ের দৃশ্য দেখেই পথ চলতে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম অসংখ্য লোক সমুদ্রে স্নান করছে। পুণ্য অর্জনের জন্য তারা স্নান করছে না স্বাস্থ্য এবং আনন্দের জন্য তারা স্নান করছে।

আমি অনেক দূরে ছিলাম। দূর হতে কতকগুলি রংবেরংএর নারকেল ভাসছে বলেই মনে হচ্ছিল। ক্রমেই কাছে যেতে লাগলাম। যেখানে লোক স্নান করছিল তার একটু দূরে গিয়ে লোকের সমুদ্র স্নান দেখবার জন্য সাইকেল হতে নেমে সমুদ্র তীরের বালিরাশির উপর বসে পড়লাম। নারীদের মাথায় নানা রংএর ক্যাপ ছিল। দূর হতে তাই রংবেরংএর নারকেল ভাসছে বলেই মনে হচ্ছিল।

যারা স্নান করছিল তাদের মধ্যে ছিল যুবক যুবতী, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া আর কিশোর। শিশু এবং বৃদ্ধের সমুদ্র স্নান নিষেধ। শিশু এবং বৃদ্ধ সমুদ্রে আত্মরক্ষা করতে পারে না বলেই এই ব্যবস্থা। যারা সমুদ্রে স্নান করছিল তাদের প্রত্যেকের পরণে ইউরোপীয়ান "কষ্টিউম্" ছিল। সমুদ্র স্নানে রবর বেল্ট, রবর টায়ার স্ত্রীলোকের মাথার ক্যাপ সবই ইউরোপীয়ান ধরণের। সমুদ্র তীরের আবহাওয়াও ইউরোপীয়ান। শুধু দুটি জিনিস ইউরোপীয়ান ছিল না। সেই দুটি জিনিস হল পূর্বদেশীয় লজ্জা আর ধৈর্য। কথাটা একটু বিশদ ভাবে না বল্লে হয়ত অনেকে বুঝবেন না। যুবতী এবং অন্যান্য নারীরা যখন হয়রাণ হচ্ছিল তখন অন্য লোক গিয়ে সাহায্য করছিল না। তাদেরই আত্মীয় স্বজন সাহায্য করছিল। আর বাকী রইল ধৈর্য। যখনই কোন স্ত্রীলোক জলে খাবি খাচ্ছিল তখনই তারা আত্মরক্ষার জন্য নিজের হাতের টায়ার অথবা কোমরের বেল্টের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখছিল, অন্যের সাহায্যের জন্য হাত বাড়াচ্ছিল না। পশ্চিমের স্ত্রীলোক সেরূপ নয়। তারা অনর্থকও এরূপ স্থানে চিৎকার করে লোক জড় করে। সে লোক জড় করা ভয়ে নয় রোমান্স করার জন্য। জাপানীদের রোমান্স বলে কিছু নেই, হয় মৃত্যু নয় বেঁচে যাওয়া, চিৎকার করা জাপানীদের অভ্যাস নেই।

সমুদ্র তীরে কতকগুলি বড় বড় ডালা ছিল। ডালাগুলি দেখে মনে হল এদের ডালা তৈরীর সংগে আমাদের দেশের ডালা তৈরীর নিকটস্থ সম্বন্ধ রয়েছে। এরূপ ডালা চীন দেশে হয় না, মালয়, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, আসাম, বাংলাদেশ, উৎকল এবং আদীম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত দেখা যায়। প্রত্যেকটি ডালায় স্নানকারীরা তাদের নিজেদের বস্ত্র রেখে গেছে। কয়েকটি ডালাতে মানিব্যাগ এবং সামান্য কাপড়ও দেখলাম। কতকগুলি ডালার এক একজন রক্ষক। রক্ষকদের কাছেই একটি ছোট তাঁবু। যারাই স্নান সমাপন করছে তারাই একে একে সেই তাঁবুতে গিয়ে নিজের বস্ত্র পরিবর্তন

করছে। ডালা রক্ষকদের কাছেই সবুজ চা মজুদ্ থাকে। স্নানকারীরা প্রত্যেকে ডালা রক্ষককে ডালার ভাড়া দেবার পূর্বে ইচ্ছামত চা পান্ করে পয়সা দিয়ে বিদায় নিচ্ছে।

ইউরোপের সমুদ্র স্নানও দেখেছি। সেখানে সমুদ্র স্নানের মধ্যেও আয়াস এবং বিলাসের গন্ধ থাকে, কিন্তু এখানে তার নামগন্ধও নেই। বিষয়টা আমার কাছে বেশ আশ্চর্যই মনে হচ্ছিল।

সমুদ্রতীরে রক্ষী পুলিশ ছিল। পুলিশের সাদা পোশাক। কোমরে একখানা তরবারী বাঁধা রয়েছে। তার কোমরে যে মস্তবড় একটা তরবারী ঝুলছে সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। সে বোধহয় অবিবাহিত সেজন্য তার প্রকৃতিটা একটু চঞ্চল্। সে স্ত্রীলোকদের প্রতিই লক্ষ্য রাখছিল। যারা স্নান করে তীরে উঠছিল তাদের সংগে চোখের চাহনির বিনিময় করছিল। কিন্তু তার একটি কর্তব্যও ছিল। যদি কোন স্নানকারী সমুদ্র জলে ডুববার লক্ষণ দেখায় তবে সে তৎক্ষণাৎ তার পোষাক বদলী করে জলে ঝাঁপ দেবার জন্যও প্রস্তুত থাকবে। তারও একখানা কেম্প ছিল। সেখানে তার ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ছিল। আমিত এমন পুলিশ দেখেই অবাক।

সে চোখের চাহনীর বিনিময় করে। তরবারী ধারন করে। জল হতে স্নানকারীদের উদ্ধার করে। যখন সে তার কেম্পে গিয়ে বসে তখন সে একজন ডাক্তার। ভাবলাম বা-রে জাপানী পুলিশ!

অনেকক্ষণ ওদের স্নান দেখে একটু দূরে গিয়ে সমুদ্র তীরেই শুয়ে থাকলাম। শুয়ে থাকতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। উপরে নীল আকাশ, পাশে প্রশান্ত মহাসাগর আর অপর দিকে হনসু দ্বীপের সবুজ পাহাড়। অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি তখন সাগরের দিকেই ছিল। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কে ডাকল। মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন ভারতীয় মহিলা। মহিলা গুজরাতী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তুমি কে হে ?

আমি ইণ্ডিয়ান্।

তুমি কি কাজ কর ?

আমি দুনিয়ার মুসাফির।

তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে ?

নিশ্চয়ই।

আমার জবাব শুনে মহিলা তাঁর বেগ হতে একখানা কাগজ বের করে গুজরাতীতে কি লিখলেন, তারপর বল্লেন "তুমি ঐ যে বাংলোটা তাতে গিয়ে বস, চারটার পর আলী বলে এক ভদ্রলোক আসবেন এবং তিনি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

রমণীর পরনে শাড়ি, পায়ে সেণ্ডেল। মহিলাকে দেখে মনে হল তিনি প্রগতিশীল কিন্তু আলী এসে নিয়ে যাবে কথাটা যেন বেখাপ্পা বলেই মনে হল। কতক্ষণ পরে মনে হল বোধহয় আলী বলে কোনও লোক তাঁর চাকর হবে। হিন্দু বাড়িতে মুসলমান খানসামা না হলেত চলে না, খানসামাও হতে পারে। আলী যেই হউক, আমার থাকবার স্থান ত হ'ল, রাত্রে নিশ্চয়ই খেতে দেবে; এর বেশি আর চাই কি ?

চিন্তাযুক্ত হয়ে পথ চলে যখন বাংলো ধরণের ঘরটার বারান্দায় উঠলাম তখন দেখতে পেলাম একজন বেশ মোটা লোক ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার পরনে সাঁতার কাটার কষ্টিউম। অভদ্রতা হবে বলে তাকেই নমস্কার করলাম।

ঘরে উঠে বল্লাম মশাই আমি এখানে একটু বিশ্রাম করব।

আপনি কে মশাই—বলেই লোকটা উঠে বসল।

আমি বল্লাম "মামুলী লোক আমি, এখন ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছি।"

হাঁ তা ত হবেই, আজকাল দেখছি ভূপর্যটকে ত্বনিয়া ছেয়ে গেছে। এই সেদিন একজন এসে গেল, তাকে চাঁদা দিতে হল, আবার—

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম আপনাকে চাঁদা দিতে হবে না।

মোটা লোকটি কি ভেবে বললে আপনি কোন প্রদেশের ?

আমি বাংগালী।

হাঁ, হবার কথাই, পার্শি এল, গুজরাতী এল বাংগালী না এলে কি চলে ? ভালই হয়েছে, শুনুন, এখানে সহায় বলে এক বাংগালী ভদ্রলোক আছেন, তাঁর কাছে যাবেন, তিনিই হলেন ইণ্ডিয়ান্‌দের সর্দ্দার অর্থাৎ পালের গোদা।

সহায় বাবুর নাম পূর্বেও শুনেছিলাম। তিনি একজন ভদ্রলোক বলে অনেকেই বলেছিল, কিন্তু তিনি পালের গোদা হলেন কি করে ? তারপর লোকটার দিকে একটু চেয়ে নিয়ে একেবারে কেঁপে উঠলাম। ইনিই নাকি ?

আমার কথা শুনে হয়ত অনেকেই ভাববেন রাসবেহারীকে বা দেখলেন না কি ? না রাসবেহারী নন্। তিনি এমন স্থানে আস্‌তেন না। তারপর পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন, তবে ইনি কে ?

হাঁ, সে কথাই বলছি। চীন দেশের বড় বড় শহরে অনেক ভারতীয় সজ্জনের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা আমাকে কতকগুলি লোকের কথা বলেছিলেন সেই লোকগুলি বিদেশের বন্দরে বন্দরে থাকে এবং নবাগত ভারতবাসী দেখলেই বৃটিশ পুলিশের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট করে ত্বপয়সা অর্জন করে। প্রথম প্রথম আমি এই ভদ্রবেশী অসৎ লোকগুলিকে ভয় করতাম না, কিন্তু কোরিয়ার সিউল নগরীতে পৌছবার পর এক সদাশয় বৃটিশ ডিপ্লোমেট আমাকে বলেছিলেন বিদেশে বিদেশীর কাছে যেমন মন খুলে কথা বলতে নেই ঠিক সেরূপ স্বদেশবাসীর কাছেও অন্তরের কথা বলতে নেই। কোরিয়াতে একটিও ইণ্ডিয়ান ছিলনা, তবুও মানচুরিয়া হতে আমার বিরুদ্ধে আমারই স্বদেশবাসী রিপোর্ট করেছিল। আমি সেই অফিসারটিকে বলেছিলাম, বিদেশে আপনারা যেসকল ভারতবাসীকে ইন্‌ফরমার

হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, তারা খুব কম মাইনে পায় এবং সেজন্যই মিথ্যা রিপোর্ট করে বেশ কাজ করছে বলে চাকুরী বজায় রাখে। জাপানেও সেই ধরণের কয়জন ইন্‌ফরমার ছিল, তাদের চেহারা লোকে বলতে পারত কিন্তু ঠিক ঠিক নাম কেউ বলতে পারত না। আমি যতগুলি লোকের অবয়বের কথা শুনেছিলাম এই লোকটির শরীরের গঠনের সংগে কথিত লোকদের একটির সংগে বেশ মিলে গিয়েছিল। সেজন্যই আমি কেঁপে উঠেছিলাম।

লোকটার সংগে যাতে কথা না হয় সেজন্য মুখ ফিরিয়ে বসলাম। এদিকে যতই সময় যেতে লাগল ততই ভারতীয় সভ্যরা ক্লাবে আসতে আরম্ভ করলেন। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কারো সঙ্গে কথা বল্‌লাম না কিন্তু প্রত্যেকটা লোকের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলাম এরা কোন শ্রেণীর লোক। তারা প্রত্যেকেই মহা আত্মম্ভরী।

সাড়েচারটার সময় এক জন ভদ্রলোক আমার নাম ধরে ডাকলেন এবং তাঁর সংগে যেতে বল্‌লেন। আমি লোকটির সংগে চললাম। কতক্ষণ যাবার পরই ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন এবং আমাকে বল্‌লেন "আপনি ট্রামকে ফলো করুন।' তখন শরীরে শক্তি ছিল তাই ট্রামকে ফলো করতে কষ্ট হচ্ছিল না। কতক্ষণ যাবার পরই ভদ্রলোক ট্রাম হতে নামলেন এবং আমাকে একটা বাড়ী দেখিয়ে বল্‌লেন এটাই আপনার মায়ের বাড়ি। সামনে গিয়ে কড়া নাড়বেন, লোক এসে দরজা খুলে দেবে। ভদ্রলোক কিন্তু ঘরে প্রবেশ করলেন না, অন্য দিকে চলে গেলেন।

কড়া নাড়তেই সেই পুরাতন ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি ঘরে গেলাম। তিনি নিজেই থাকবার ঘর, স্নানাগার দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন "চাকর এসে তোমাকে খাবার দিয়ে যাবে এবং আগামী কাল সকাল বেলা তোমার সংগে আমার দেখা হবে। বুঝলাম এও একটা বড় লোকের বাড়ি। বড়লোকের বাড়ি না হলে এমন হয় না।

স্নান করে বস্ত্র পরিবর্তন করলাম, তারপর বাইরে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। পথটা বড়ই উঁচু নীচু। পথের উপর হেঁটে হেঁটে নিকটস্থ একটী সিগারেটের দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনে এনে দেখি খাবার প্রস্তুত। চাকরটি জাপানী। সে বেশ হিন্দুস্থানী বলতে পারে।

আমরা চাকরকে তুই, তুমি এই বলেই ডাকি, জাপানীরা সেরূপ করেনা। তারা মিষ্টার বয়, মিষ্টার কুক্ বলে চাকর পাচককে সম্বোধন করে। আমিও ঠিক তাদের ধরণেই বয়টিকে মিষ্টার বলতে বাধ্য হলাম। লোকটি শিক্ষিত এবং বয়স্ক।

বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম মিষ্টার বয়, এখানে কি কোন ইংলিশ সংবাদ পত্র পাওয়া যায়?

হ্যাঁ মিষ্টার এখনই এনে দিচ্ছি।

বয়টি আমার হাতে দুখানা ইংলিশ সংবাদ পত্র দিয়ে বল্‌ল, একখানা আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরৎ নেব। অন্য খানা মিষ্টারের কাছে থাকবে অতএব মিষ্টার দয়াকরে জরুরীসংবাদ পত্রটি পড়ে নেবেন।

বাস্তবিকই সেই সংবাদ পত্র জরুরী। তার আকৃতি অনেকটা ভয়েস্ অফ ইণ্ডিয়া নামক সংবাদ পত্রের মতই তবে বিষয় বস্তু ভিন্ন। তাতে লিখা ছিল জাপান কোন পথে? চীনদেশ জয়করে কি আমরা সুখী হব? আমরা যে পরিমাণ টাকার সুদ দেই পৃথিবীর আর কেউ তেমন কি দেয়? আমরা যে মরতে বসছি ইত্যাদি। এরূপ ছিল সবগুলি প্রবন্ধের শিরোনামা। শিরোনামা দেখেই সন্তুষ্ট হলাম এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন এসে বয় তার কাগজ ফেরত নিয়ে নেয়। ঘণ্টা পূরবার পূর্বেই বয় এসে তার কাগজ ফেরৎ চাইল। আমি তাকে কাগজ খানা ফেরৎ দিয়ে বল্‌লাম বেশ ভাল সংবাদ পত্র। সে চলে যাবার পর দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকলাম আর ভাবলাম এরূপ সংবাদ পত্রের সংস্পর্শে না আসাই আমার পক্ষে ভাল।

জাপানে ইংরাজী ভাষায় কয়েক খানা ইংরাজী দৈনিক ছিল। প্রত্যেকটি ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদক ছিলেন বৃটিশ অথবা আমেরিকান্। টকিও গারজিয়ান ইংরাজী দৈনিকের অন্যতম। আমাকে সেই সংবাদ পত্রটিই জাপানী বয় পড়তে দিয়েছিল। প্রথম পাতা হতে শেষ পাতা পর্যন্ত সমাপ্ত করতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছিল। তিন ঘণ্টা সংবাদ পত্র পড়ে বুঝলাম জাপান ভ্রমণ করে সেই সম্বন্ধে বই লেখা সোজা কাজ হবে না। পথে ঘাটে দুএক জন লোকের সংগে দেখা করে এবং আমেরিকান-দের লেখা বই পড়ে যদি জাপান ভ্রমণ লিখতে হয় তবে তা হবে একটা বাজে খাতা।

পরের দিন বোধহয় সাড়ে নয়টার সময় আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। প্রাতকৃত্য সমাপন করে সকালের খাবার খেয়ে বাইরে গিয়ে দেখি মিঃ আলীর কাছে আমার পূর্বপরিচিত মহিলা বসে আছেন এবং এক জন জাপানী ভদ্রলোক মিসেস্ আলীকে জাপানী ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি তাঁদের উভয়কে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের পাশেই বস্‌লাম। মহিলা মিঃ আলীকে তাঁর স্বামী বলে পরিচয় দিলেন। আলী আমার চেয়েও বয়সে ছোট। তাঁদের ছেলে মেয়েরাও বাইরে এসেছিল। আমি তাদের আদর করে কাছে বসালাম। ইত্যবসরে সহায় মহাশয়ের স্ত্রী এসে তাঁদের বাসায় আমাকে যেতে বল্‌লেন। তাঁর অনুগ্রহ সূচক কথা শুনে মনটা আরও সুখী হল। আমি ভাবলাম কোবেতেই আমি অনেক কিছু জানতে পারব। আমার মন কিন্তু আলী পরিবারেই সন্নিবেশিত থাকল।

জাপানী শিক্ষক মহাশয় ভাল ইংরাজী জানতেন এবং একটু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতেন। চীন জাপানে যাদেরই চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে দেখেছি তাদের মধ্যেই অনেক কিছু আছে দেখতে পেয়েছি।

কথা প্রসঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জাপানী রিকসা পুলারদের কথা উথাপন করলাম। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন—আমাদের দেশে রিকসাপুলার ছিলনা, এখনও নেই। একে কি বলে ভেবে পাচ্ছিনা। তবে কি না রিকসা পুলার কথাটা বড়ই খারাপ। তিনি যা আমাকে ইংরাজীতে

বলেছিলেন তা বল্‌লে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হবে। We have no rickshawpuller and have not But Cannot say anything about them, even then the word is very bad কথাট বলেই মাষ্টার মহাশয় চারিদিকে চেয়ে বললেন Our mother knows about it তিনি মিসেস আলীকেই লক্ষ্য করে কথাটা বলছিলেন। ভেবে দেখলেন এখন আর বেশি কথা ভাল নয়। এদিকে সহায় মহাশয়ের স্ত্রীও দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর সংগে সহায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সহায় মহাশয় বাস্তবিক "সহায়।" তিনি শুধু সহায় নন সদাশিব। অমায়িক লোক। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে না রেখে রামানী বলে এক সিন্ধি ব্যবসায়ীর বাড়িতে থাকতে দিলেন। রামানী যুবক এবং খাঁটি ন্যাসনালিষ্ট। তার বাড়িতে এসে উপকৃতই হয়েছিলাম।

আম্মা সাহেবের বাড়িতে তিন দিন যাইনি কারণ এই তিনটা দিন শহরের সর্বত্র সাদামনে খাঁটি ভবঘুরের মত ভ্রমণ করছিলাম। প্রথম দিনই আমি স্থানীয় ধর্মস্থানগুলি দেখে নিলাম তারপর কয়েকটি বিদ্যালয়ের দিকেও যাওয়া আসা করলাম। দুখানা জাপানী সিনেমাও দেখে সুখী হয়েছিলাম।

এই তিন দিনের এক দিন একটি বাঁদর নৃত্য দেখতেও গিয়েছিলাম। এখন সেই বাঁদর নৃত্যের কথাই বলছি। শহরের উপকণ্ঠে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির। চারিদিকে পাইনবৃক্ষ, তারই ভেতর দিয়ে পথ চলেছে। পথের এক পাশে একটি কাগজের তোরণ দ্বার দেখতে পেলাম। দেখেই বুঝলাম এখানে কিছু দেখানো হচ্ছে। আমিও নূতন তোরণ দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সকলেই অর্ধ ইয়েনের টিকিট কিনছে, আমিও তাই কিনে একখানা সিটে গিয়ে বসলাম। অনেকগুলি সিট ছিল। দর্শকের সংখ্যাও কম। সিটগুলি মোটেই পরিস্কার নয়। যে লোকটি বাঁদর নৃত্য দেখাবে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে অনেক দিন ঘুমায়নি অথবা তার খাদ্যের অভাববশত শরীর শুকিয়ে গেছে। মোটকথা বাঁদর নৃত্যের প্রথমাবস্থাটা মোটেই ভাল লাগেনি। তারপর যখন আসল নৃত্য আরম্ভ হল বার

বার নিজের দেশের কথা মনে হচ্ছিল। মানুষে যা করতে পারে বাঁদরকে শিক্ষা দিলে বাঁদরও যে তার অনেক কিছু করতে পারে তাই দেখানো হচ্ছিল। কতক-গুলি বাঁদর জাপানী জাতীয় পতাকা নিয়ে চীনা জাতীয় পতাকাধারী কতকগুলি বাঁদরকে আক্রমণ করল। অবশেষে বন্দুক কামান তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। অবশেষে চীনা জাতীয় পতাকা ধারী বাঁদরদল হার মেনে মাথানত করে বসে থাকল। জাপানী জাতীয় পতাকাধারীরা বিপক্ষের বাঁদরদের বেঁধে ফেল্‌ল। বিষয়টা দেখতেই বেশ ভাল লাগল। আমি বাঁদর নৃত্যকারককে লক্ষ্য করেই হাতে তালি দিলাম। জাপানীরা বুঝল, চীনের পরাজয়ে আমি সুখী হয়েছি। আমার হাততালি দেখে অনেক জাপানী আমার পরিচয় চাইল। আমি প্রত্যেককে আমার নামের কার্ড দিলাম। তারা প্রত্যেকে কার্ডগুলি পকেটস্থ করেছিল এবং বাঁদর নৃত্য শেষ হবার পর আমার করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিল। এদের ইত্যাকার ভাব দেখে আমি মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলাম এবং সেদিনই রামানীকে বলেছিলাম জাপানীরা ভাবছে চীনকে হারাবে এবং জয় করবে তা হবে না। ছোট একটা সাপ যদি ভেককে গিলতে চায় তবে সাপটাই মরে, ভেকের কিছুই হয় না। রামানী আমার কথায় প্রায়ই সায় দিত না। রামানী ছিল উগ্র জাতীয়'বাদী উগ্রজাতীয়তাবাদীরা সকল সময়েই অদূরদর্শী হয়। রামানীও বোধহয় সেইরূপ ছিল।

চতুর্থ দিন সকালবেলা আম্মা-সাহেবার ছোট ছেলেটি আমাকে ডাকতে আসল। আমি তার সংগে গিয়ে আম্মা সাহেবাকে নমস্কার করলাম এবং জানালাম অতি সত্বরই আমি তাঁর বাড়িতে এসে একদিন খেয়ে যাব। তাঁর বয়টি বড়ই ভদ্র এবং মাষ্টার মহাশয় অতিশয় চতুর এবং শিক্ষিত। আম্মা সাহেবা আমার কথাশুনে একটু হাসলেন তারপর বল্‌লেন "হাঁ হাঁ পথে ঘাটে হাঁটলেই জাপান দেখা হয় না। জাপানে অনেক কিছু জানার আছে, জেনে নিও বুঝলে?

চীন দেখে এসেছ এবার চীনের কথা ভুলে যাও এবার জাপান জানার জন্য মনসঁপে দাও।" আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম।

এবার আমার চাঁদা উঠানোর পালা। কোবেতেই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেশি বলে ভাবলাম এখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চীন দেশ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতার কথা বলা ভাল হবেনা। মুখ হতে কি বেফাঁস কথা বের হবে আর জাপানীরা তাদের দেশ হতে তাড়িয়ে দেবে, সেজন্য সহায় মহাশয়কেও সকল কথা বলতে সাহস করলাম না। আর তিনিইবা চীনের কথা শুনবেন কেন? জাপানে বসে চীনের প্রকৃত সংবাদ পাওয়া ভয়ানক কঠিন কাজ। জাপানীরা চীনের সংবাদ এমন কেটে ছেটে নিজের দেশে পাঠাত যে বৃটিশ প্রেস সেন্সরও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেরূপ পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হননি। সহায় মহাশয় চীন জাপান যুদ্ধের বহুপূর্বেই জাপান পৌঁছেছিলেন। সহায় মহাশয়কে চাঁদা উঠানোর কথা বলতেই তিনি আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন এবং সত্বরই তার ব্যবস্থা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন।

কয়েকদিন পর আমি কাজে অগ্রসর হলাম এবং আমার দরকারী টাকার তিন চতুর্থাংশ উঠিয়ে ফেললাম। চাঁদা উঠানোর সময় আমার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তারই দুএকটা বলে আসল কথায় আসব।

একদিন বেলা বারটার সময় একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর অফিসে বসালেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে নানা কথা বলে সময় কাটাতে আরম্ভ করলেন। প্রথম দর্শনেই লোকটিকে মামুলী লোক মনে হল এবং মন খুলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন প্রথমেই উঠল। আমি যেভাবে হিন্দু মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা করে রেখেছিলাম তার বিন্দুবিসর্গ তাকে না বলে শুধু বললাম "ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেলে এসব ছোট খাট বিষয়ের মীমাংসা আপনি হয়ে যাবে। এনিয়ে ভাবনার বিষয় কি

আছে ? তারপরই উঠল বিদেশী পণ্যের কথা। 'পণ্য আবার স্বদেশী বিদেশী কি' একথাটা তাঁকে বল্‌লাম না 'বাই বৃটিশ প্লেকার্ডের নমুনা অনুযায়ী তর্ক করে যেতে লাগলাম। ভদ্রলোক অনেকক্ষন তর্ক করার পর আমাকে তাঁর অন্য একটি অফিসে নিয়ে গিয়ে কতকগুলি খদ্দরের নমুনা দেখালেন। খদ্দরের নমুনা দেখেই বল্‌লাম "বেশ ভাল খদ্দর ত, দেশ থেকে কি দরে আনান ?

ভদ্রলোক বল্‌লেন, আরে দেশ থেকে আনাই, না দেশে চালান দেই। এসব হল জাপানী খদ্দর। ঐ যে দেখছেন ছাপগুলি তাও দেশ হতে তৈরী করে এনেছি। দেশের লোক ভাবে তারা বেশ খদ্দর ব্যবহার করছে, আমরা এখান থেকে জাপানী খদ্দর পাঠাই তার সংবাদ কজন রাখে ?

আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার মাথায় ভারতে জাপানী খদ্দর পাঠাবার মতলব কি করে এল ?

হাঁ, তাই বলুন। আমাদের একটি ব্রান্চ আদনে আছে। আরবরা প্রায়ই খদ্দর ব্যবহার করে। খদ্দর গরমে শীতল আর ঠাণ্ডায় গরম সেজন্যই আরবগণ খদ্দরের পক্ষপাতী। আমরা জাপানী খদ্দর বহুপূর্বহতেই আদনে পাঠাতাম। হঠাৎ মনে হল ভারতে খদ্দরের চাহিদা বেশ রয়েছে এখান থেকে যদি জাপানী খদ্দর ভারতে পাঠানো হয় তবে ক্ষতি কি ? দেশ থেকে খদ্দরের নমুনা আনালাম, তারপর দেশের লোকের পরিমাণ মত ধুতির নমুনা আনিয়ে গত ছয় মাস যাবত এই ব্যবসা করছি। এতে আমার দুপয়সা হচ্ছে, এই নেন্ আপনাকে আমি কুড়িটি ইয়েন চাঁদা দিচ্ছি। আপনি যখন দেশে যাবেন তখন দেশের লোককে বলবেন তারা জাপানী খদ্দর ব্যবহার করছে।

আর একটি কথা আপনার মনে রাখা উচিত। এক গজ খদ্দর তৈরী করতে আমাদের একটি লোকের যত সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে এক জন জাপানী হাজার গজ খদ্দর তৈরী করতে পারে। বলুন ত কোনটি সস্তা ? বাস্তবিকই লোকটির কথায় ক্ষণিকের জন্য আমার মাথা ঘুলিয়ে দিল। আমি ব্যবসায়ীকে

তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চলে আসব ভাবছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়লেন না, খেয়ে যেতে বললেন।

খাওয়া হয়ে গেলে ব্যবসায়ী আমাকে কয়টি কথা বলেছিলেন, সেই কথাগুলি আমার মনে এতই দাগ কেটেছিল যে তা এখনও অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে।

আমরা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী সর্বদেশে সকল অবস্থাতেই মুনাফা খুঁজে বেড়ায়। মুনাফার জন্য সে নিজের জাতভাই ত দূরের কথা নিজের আত্মীয়কে ঠকাতে কসুর করেনা। আপনি হয়ত চীন দেশে হংকং সাংহাই প্রভৃতি বন্দরে যে সকল চীনা ব্যবসায়ী জাপানী সওদা বিক্রি করে তাদের উপর অত্যাচার কিরূপে হয় তা দেখে এসেছেন। যদি দেখে না থাকেন তবে আমার কাছেই শুনুন। আমাদের একটি ব্রানচ কেণ্টনের সামীণ নামক স্থানে এখনও আছে। সেখানে ব্রানচ ম্যানেজার একজন পাঠান। এই পাঠান ম্যানেজার সপ্তাহে এক খানা করে পত্র আমাদের এখানে পাঠান। তারই পত্রে অবগত হলাম, সেখানে একদিন তিনি এক চীনা ব্যবসায়ীর দোকানে ব্যবসায়ের কথাবার্তা বলেছিলেন। কথা শেষ হলে তিনি পাশের দোকানে বসে যখন কথা বলছিলেন তখন একটি হাত বোমার শব্দ তাঁর কানে যায়। ঘর হতে বের হয়ে দেখতে পান পাশের দোকানটি বেশ জ্বলছে এবং চীনা ব্যবসায়ী মাটিতে পড়ে আছে। তার শরীরে প্রাণ ছিলনা। সে জাপানী পণ্য এনে কেণ্টনে বিক্রি করত বলেই চীনা যুবকগণ তাকে শাস্তি দিয়েছিল। এইত গেল চীনের কথা। জাপানেও এমন একটি প্রতিষ্ঠান আছে যা চীনের যুবকদের চেয়েও চতুর এবং নির্মম। এদের ব্ল্যাক ড্রাগন বলা হয়।

আপনি কখনও জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগনের নাম শুনেছেন ?

না মশাই, সে আবার কি চিজ ?

আপনি নিশ্চয়ই টোকিও যাবেন ?

হাঁ, নিশ্চয়ই টোকিও যাব।

আপনি যখন টোকিও হতে ফিরে আসবেন তখন আমার কাছে আসবেন আমি জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন সম্বন্ধে যা জানি তা ত বলবই, উপরন্তু নূতন আরও কিছু তথ্য আপনার জন্য জোগাড় করে রাখব। একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কারো কাছে জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন কি কখনও জিজ্ঞাসা করবেন না। যদি এই কথাটি জিজ্ঞাসা করেন তবেই মুস্কিলে পড়বেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম বিপদে পড়বার কারণটা কি ?

ব্ল্যাক ড্রাগন হল একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান। বিদেশী লোক যদি কোনও গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের খবর নেয় তবে কি তাকে জাপানী গুপ্ত প্রতিষ্ঠান আদর করবে? তারা ভাববে আপনিও বৃটিশের একটি গোপনীয় পুলিশ।

এখন এই পর্যন্তই বললাম মিঃ পর্যটক। আমাদের দেশে কখন যে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে আর বিদেশী সওদা ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেবে তারই প্রতীক্ষায় আছি, বুঝলেন ? যদি কোনও ইণ্ডিয়ান এখানে এসে আমাকে হত্যা করত তবে আমি সুখী হতাম। আমি এই ব্যবসায়টি নিয়েছি কেন জানেন ? আজ যদি আমি এই ব্যবসায়টি হস্তচ্যুত করি তবে আরও দশজন আমার এই ব্যবসা হস্তগত করে ইণ্ডিয়াতে জাপানী খদ্দর দিয়ে ভাসিয়ে দেবে। আপনি বাংগালী সেজন্যই আপনাকে ডেকে এনে দেখালাম আমরা বিদেশে এসে স্বদেশের কি মংগল করছি। এই গোপনীয় ব্যবসা হতে যদি মুক্ত থাকতে হয় তবে জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগনদের মত নির্মম হতে হবে।

ব্যবসায়ীর ঘরে আর বসে থাকতে ইচ্ছা হল না, ইচ্ছা হল জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন কি তাই জানতে। কিন্তু কথা হ'ল কার কাছ থেকে এই সংবাদটি পাই? ব্যবসায়ী ত বলে দিয়েছে জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগনের কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বিপদ অনিবার্য।

চিন্তিত মনে যখন পথ চলছিলাম তখন শর্মা বলে এক যুবকের সংগে দেখা হল। যুবকের সংগে পূর্বেও কথা হয়েছিল। তাকে পথে পেয়ে আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এখন কোথায় যাবেন ?

তিনি মুখে কথা না বলে সামনার পথটা দেখিয়ে দিয়ে দিলেন মাত্র। আমি কিছু না বলেই তার সংগে চলতে আরম্ভ করলাম এবং একটু দূর গিয়ে একটি জাপানী কাফেতে তাকে কফি খেতে নিমন্ত্রণ করলাম। বিনাবাক্যব্যয়ে তিনি কাফে খেতে বসলেন এবং হঠাৎ বললেন আপনার গতিবিধি ভাল দেখাচ্ছে না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কিরূপ মশাই। এই মাত্র দেখলাম আপনি অমুকের দোকান থেকে বের হয়ে আসছেন লোকটা কি ভাল মনে করেন ? তার মুখে বিপ্লবী কথা লেগেই আছে, সে যে বৃটিশ সরকারের স্পাই নয় তার প্রমাণ কি ? আমি শর্মাকে একটু রাগত ভাবেই বললাম, বৃটিশের ক্ষমতা ধরে নিয়ে জেলে পুরা, তাই যদি হয় তাতে ভয়ের কারণ কি ? অন্যান্য দেশে জেলে সুখী হয় না, সংসার থেকে একেবারে বিদায় করে দেয়, সে সংবাদ আপনি নিশ্চয়ই রাখেন ? শর্মা কিছুই বললেন না, চুপ করে থাকলেন মাত্র। আমিও তাকে বিদায় দিয়ে রামাণীর ঘরে এসে রেডিও খুলে দিয়ে জাপানী সংবাদ শুনতে আরম্ভ করলাম।

আমি যখন সংবাদ শুনছিলাম তখন দুটি জাপানী যুবককে পাচিকা (খুকসান্) আমার কাছে নিয়ে এসে বলল এই দুটি যুবক ইংলিশ সংবাদ পত্রে আপনার এদেশে আসার সংবাদ শুনে আপনার কাছে এসেছেন। তারা কয়টি প্রশ্ন করতে চায় তার উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। খুকসান্‌কে বসতে বললাম কারণ যুবকদ্বয়ের কথা হয়ত আমি বুঝতে সক্ষম হবনা। খুকসান্ আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল এঁরা বেশ ভাল ইংলিশ বলতে পারেন আমার উপস্থিতি দরকার হবেনা। খুকসান্ চলে গেলে আমিই সর্বপ্রথম জাপানী যুবকদ্বয়কে কয়টি প্রশ্ন করলাম। প্রথম প্রশ্নটি হল আপনারা ইংলিশ ভাষা শিখেন কেন ? এমনই ভাব দেখালাম

যেন ইংলিশ ভাষার প্রতি আমার কোনও দরদ নেই এমন কি ইংলিশ ভাষাকে ঘৃণা করি এমনই একটা ভাব দেখালাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে একটি যুবক বল্লেন, মহাশয় ইংলিশ জাতটাকে আমরা আদর করি। চীনা কোরিয়ান এদের সংগে আমাদের ভাষার নিকট সম্বন্ধ এমন কি চীনা এবং কোরিয়ান্ ভাষাতে যদি কিছু লিখে দেওয়া হয় তবে তা আমরা বুঝতেও পারি। তবুও ইংলিশ ভাষা না হলে আমাদের চলেনা। ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সমুদ্রে ইংলিশ ভাষা চল্ছে .অনেক শতাব্দী চলবেও। পূর্বে সাগরগুলিতে আরব এবং মালয় ভাষা রামরাজত্ব করত তারপর পর্তুগীজ ভাষার একটু প্রাধান্য হয় কিন্তু হঠাৎ ইংলিশ ভাষা কোথা হতে এসে একেবারে জুড়ে বসেছে তাকে আর হটানো যায় না। শুধু পূর্বদেশগুলিতে যদি ইংলিশ ভাষা উড়ে এসে জুড়ে বসত তবুও একটা কথা হ'ত পৃথিবীর সর্বত্রই সাগরের ভাষা ইংলিশ হয়েছে। ফ্রেন্চ এবং স্পেনিস ভাষাদ্বয় ইংলিশ ভাষার কাছে হার মেনেছে।'

যুবকদ্বয়ের বৈদেশিক জ্ঞান দেখে সুখী হলাম এবং বল্লাম এখন বলুন আপনাদের কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে? তারা জিজ্ঞাসা করল চেরী বৃক্ষ পূর্বদেশ-গুলির কোথাও আমি দেখেছি কি না? চেরী বৃক্ষ পূর্বদেশের কোথাও ব্যাপক ভাবে কোথাও দেখিনি। কোথাও দু'একটা গাছ জাপান হতেই নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হয়েছে মাত্র। আপনারা কি শুধু চেরী বৃক্ষের সংবাদ নেবার জন্যই আমার কাছে এসেছিলেন? যুবকদ্বয় একটু হেসে বল্লেন, আপনি আর কি সংবাদ রাখেন স্যার? যুবকদ্বয়ের প্রশ্ন শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম তারপর বল্লাম আমি ভেবেছিলাম আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন। যুবকদ্বয় বললেন, সেজন্য আপনার ভাবতে হবে না, আমরা ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে প্রায় সংবাদই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তারা ভারতের সকল স্থান হতে আসে। তারা বোধ হয় আপনার চেয়ে ইণ্ডিয়ার সংবাদ বেশি রাখে এখন আমরা আসি। আমরাও সত্বরই বেড়াতে বের হব, হয়ত পথে দেখাও

হতে পারে। এখন আসি "ছায়ানারা"। যুবক দুটি চলে যাবার পর ভাবতে লাগলাম্ এই সামান্য সংবাদের জন্য এদের এত মাথা ব্যথা কেন, এদের নিশ্চয়ই অন্য উদ্দেশ্য ছিল। একটু পরই পুনরায় দুটি যুবক ফিরে এসে বললেন ক্ষমা করবেন সম্মানিত পর্যটক, আমাদের আরও কটি কথা জিজ্ঞাসা করার আছে। আপনি আমাদের ইণ্ডিয়া সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব বলেই মনে করেছিলেন আমরা আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করিনি এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। সেই কথাটা হল—রামায়ণ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

রামায়ণকে ইউরোপীয়ান্‌রা পৌরাণিক গল্প বলেই মনে করেন আমারও সেই একই ধারণা।

যুবকদ্বয় একের দিকে অন্যে চেয়ে বললেন আমাদের কিন্তু অন্য ধারণা। ইণ্ডিয়ানরা শুধু লংকা বলেই একটি দ্বীপ জয় করতে পেরেছিল এর বেশি কিছুই নয়।

আপনারা যে কথা বলতে চাইছেন ভাল কথাই। আপনাদের জানা উচিত সমস্ত জাপান সাম্রাজ্য বাংলা দেশের সমান। আপনারা যা নিয়ে এত বড়াই করেন তা ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র। এই ত হালে মান্‌চুরিয়া দখল করেছেন সে দেশের উপর দিয়ে আমি হেঁটে এসেছি। দেখে এসেছি এখনও চীনারা সমান্তরাল সরকার চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও তারা নান্‌কিনেই খাজনা পাঠাচ্ছে। মান্‌চুরিয়ার কথা এখন থাক। ভারতবাসী কখনও বিদেশীকে পদানত করতে চাইত না। তারা বিদেশে গিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার করেই সন্তুষ্ট থাকত। চীন এবং জাপান আমাদের প্রতিবেশী। তিব্বত, ইরাণ মংগোলিয়া, বহির্মংগোলিয়া, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশীয়া আপনাদেরও প্রতিবেশী কিন্তু এখনও তারা আপনাদের প্রাধান্য কোনও দিক দিয়ে স্বীকার করে নি। আমরা বর্তমানে পরাধী[illegible], তবুও আমাদের কিছুটা প্রাধান্য এই দেশগুলি ছাড়া চীন জাপানেও রয়েছে।

রাজ্য জয় করে লোককে গোলাম করা এক কাজ আর মানুষের মধ্যে সভ্যতা প্রচার করে মানুষকে মানুষ করা অন্য কাজ। আমরা পরাধীন দেশের লোক আজ চাইছি জাপান আমাদের মুক্ত করুক কিন্তু মান্‌চুরিয়ার অবস্থা দেখে মনে হ'ল, আমাদের বুঝাপড়া যদি করতে হয় তবে ব্রিটিশের সংগেই করব জাপানের সাহায্য নিয়ে নয়।

জাপানীরা যখন কুপিত হয় তখন তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আমারও সেই অবস্থা। জাপানী যুবকদ্বয় আমার কথা শুনে বেশ রেগেছিল কিন্তু তাদের মুখ খুলার পূর্বেই রামাণী এসে হাজির। রামাণীর সামনেই জাপানী যুবকদ্বয় তাদের নিকৃষ্টতম মন্দবাক্য ("আহো") আহাম্মক শব্দটি আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এদের চলে যাবার পর রামাণী বল্‌লে ভাই তুমি এদের এত রাগিয়েছ যে তারা তাদের ভাষার নিকৃষ্টতম গাল্ আহাম্মক শব্দটি তোমাকে বলে বসেছে।

আমি ত শুনেই অবাক। জাপানী ভাষার নিকৃষ্টতম কটুবাক্য হল আহাম্মক! এর মানে কি? জাপানীরা কি এতই উন্নত যে এর বেশি কটুক্তি তাদের ভাষা হতে লোপ করতে সক্ষম হয়েছে?

রামাণী বল্‌লে তাদের ভাষায় এর বেশি কটুক্তি যে আর নাই। বলবে কোথা হতে?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোমুখী কম লোকই হয়। যখনই কেউ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোমুখী হয় তখন হয় লোকটাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফেলে, নয় তাকে ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু কখনও রাগায় না।

সাধারণ জাপানীরা চীন দখল করতে মোটেই উৎসুক ছিল না, কিন্তু জাপানী উগ্রপন্থীরা চীন কেন সমুদয় পৃথিবীটা দখল করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। এদের কথা এখন বলা হবে না। কারণ কোবেতে এই শ্রেণীর লোকের সংগে আমার কোনও কথাবার্তা হয় নি। টোকিয়ো হতে ফিরে আসার পর প্রত্যক্ষ

গবেই এই শ্রেণীর লোকের সংগে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন এদের আমি মাটেই ভয় করতাম না। কারণ তখন আমার কেনেডা যাবার টিকিট কেনা য়ে গিয়েছিল। টোকিও যাবার পথে সেরূপ ধরণের তুএকটা লোকের সংগে দখা হয়েছিল বটে কিন্তু তাদের সংগে কথা না বলে এড়িয়ে চলতে সক্ষম য়েছিলাম।

রামাণীর ঘরে স্নানের বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু সে স্নানে আমি তৃপ্ত হতাম না। কারিয়াতে জাপানী প্রথায় স্নান করে বেশ আরাম পেতাম বলে জাপানী াথহাউসে যাবার জন্য রামাণীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার ঘরের পাশেই একখানা বাথহাউস (স্নানের ঘর) আছে। বিকাল বেলা স্নানে চললাম। ংগে মিঃ শর্মা। তিনি আমাকে জাপানী প্রথায় কি করে স্নান করতে হয় লে দিবেন বলেই সাথী হলেন। আমরা সুন্দর একটি একতলা বাড়ির সামনে সে দাঁড়ালাম। বাড়ির দরজায় একটি পর্দা টাংগানো। পর্দাখানা সরিয়ে আমরা ঘরের ভেতর পৌছেই জুতা খুলে ফেললাম তারপর যে দিক দিয়ে রুষগণ স্নান করে সে দিকে গিয়ে একটি ডালাতে বস্ত্র খুলে রেখে একেবারে লংগ হয়ে পাশের মস্তবড় চৌবাচ্চাটাতে শরীরটা ডুবাতে চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু জল এতই গরম ছিল যে তাড়াতাড়ি করে এত গরম জলে শরীর ডুবানো লে না। প্রায় পনর মিনিট চেষ্টার পর গলা পর্যন্ত জলের নীচে গেল। তখন কি আরাম!

অপর দিকে কয়েকজন ভদ্রমহিলাও স্নানে নামছিলেন। আমরা যেমন লংগ হয়ে জলে নামছিলাম ভদ্রমহিলারাও তেমনি দিগম্বরী হয়ে স্নানে নামছিলেন। তাঁদের কোলে শিশুও ছিল। এত গরম জলে নেমেও শিশুরা াদছিল না। অপর দিকে শিশু ক্রোড়ে নিয়ে মহিলাগণ স্নান করেন দ কথা জাপানীদের মুখেই শুনেছিলাম কারণ অপর দিকের কোনও দৃশ্য এদিক থকে দেখতে পাওয়া যায় না।

লক্ষ্য করে দেখলাম অবিবাহিত পুরুষ কেহই একেবারে বিবস্ত্র হয়ে জলে নামছিল না। তারা প্রত্যেক লজ্জা স্থান টাওয়েল দিয়ে ঢেকে নামছিল। অবিবাহিত রমণীরাও সেরূপ করে থাকে শুনলাম। তাদের সম্বন্ধে কথাটা শুনে লিখতে বাধ্য হলাম।

শরীরের ক্লেদ গরমজলে যখন একেবারে নরম হয়ে গেল তখন বড় চৌবাচ্চা হতে বের হয়ে আসলাম। পাশেই ছোট ছোট কলে গরম ও ঠাণ্ডাজল আসছিল তাই ইচ্ছামত মিশিয়ে শরীরটাকে সাবান দিয়ে পরিস্কার করে পুনরায় স্নান করলাম। স্নানান্তে আমরা প্রত্যেকে পাঁচ সেন্ (সেণ্ট) করে দিলাম। জাপানীরা সেণ্টকে 'সেণ' বলে।

স্নানাগার হতে বাইরে এসে শর্মাকে বললাম বিদেশীরা জাপানীদের প্রতি এই স্নানের জন্যই কত উপহাস করে আমি কিন্তু তা করব না। বিবাহিত স্ত্রীলোক কত নির্ভয় হয়ে স্নান করে। তাদের প্রতি কেউ তাকায় না। স্ত্রীলোকের প্রতি লোক ততদিনই তাকায় যতদিন তার বিয়ে না হয়। যেই বিয়ে হয়ে গেল অমনি সে হয়ে গেল সমাজের মা আর পুরুষটি হয়ে গেল সমাজের পিতা। পিতামাতাকে অপমান করা ছেলেমেদের পক্ষে বড়ই অন্যায় কাজ। এই নীতি মেনেই জাপান সমাজ চলছে। জাপানী স্নানাগারে গিয়ে শুধু কামুকরাই কামের গন্ধ পায় কিন্তু যাদের সামান্য একটু জ্ঞান আছে তারাই বুঝতে পারে জাপানী সমাজ কত উঁচুদরের।

সমাজের সংগে রাষ্ট্রের সমূহ সম্বন্ধ রয়েছে কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে রাষ্ট্রের সংগে সমাজের কোন সম্বন্ধ নেই। জাপানী স্নানাগার তারই অন্যতম। জাপানী মা এবং বাবা সিন্টো ধর্মের ছায়া। সিন্টোধর্ম হল একটি প্রাকৃতিক ধর্ম এই ধর্মটি সমাজের অভিব্যক্তির সংগে সর্বদেশেই গড়ে উঠেছিল কেহবা সেই ধর্মটারই নূতন নাম দিয়েয়েছে আর কেহবা তা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও সিণ্টোইজম প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেই ধর্মটারই নাম

আমরা শৈব সমাজরূপে দেখতে পাই। ইউরোপের সর্বত্র এখনও সিণ্টো ধর্মের প্রচলন রয়েছে। ইউরোপীয়ানরা বিবাহিত যুবকযুবতীদের যেরূপ স্বাধীনতা এখনও দেয় আমাদের দেশে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার হবার পূর্বেও সেই স্বাধীনতা দিত। ভারতের যে সকল স্থানে ইস্‌লাম ধর্মের ছায়া পড়েনি এখনও সেই সেই স্থানে শৈব ধর্মের আসল রূপ বজায় রয়েছে। জাপানীরা তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে মাত্র।

বর্তমানে জাপানীরা আসল সিণ্টো ধর্মে রাষ্ট্র নীতি মিশিয়ে ফেলেছে। আদম এবং ইভ জন্ম নেবার পূর্বে যে ধর্ম জাপানে গড়ে উঠেছিল সেই ধর্মকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ব্যবহারের উপযুক্ত করে বর্তমানে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। সেজন্য জাপানকে দোষ দেওয়া যায় না। জাপান দেখল তারই দ্বারে ডাচ, পর্তুগীজ, ইংলিশ, আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদের সিংহ নিনাদ ক্রমাগতই বেড়ে চলছে। জারের রুশ সাম্রাজ্যবাদীরাও ক্রমেই জাপানের ঘাড়ে এসে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে জাপানের কর্তব্য কি তাই জাপানীরা ষোলশত শতাব্দী হতে বেশ ভাল করেই চিন্তা করছিল। জাপানীরা বুঝতে পারল ইউরোপীয়ান্ সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য করে টুপয়সা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি বিদেশে তাদের সাম্রাজ্যও বিস্তার করছে। প্রকৃতপক্ষে জাপান ইউরোপীয়ান্ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকেই সাম্রাজ্যবাদ শিখল।

সর্বপ্রথমই জাপান যাতে ইউরোপীয়ান আচার ব্যবহারের মূল বিষয়টি জাপানী কায়দায় আয়ত্ব করতে পারে সে দিকে অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য হতে পারেন নি। অবশেষে যোশিদা নামক এক ভদ্রলোক খাঁটী ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন। তিনি কৃতকার্য হওয়া দূরের কথা জাপানীরা উল্টা তাঁকে বেশ নির্যাতন করে এবং তিনি বিষয়টি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। ইউরোপীয়ান অর্থনীতি ও সময়ের

সংগে পা ফেলে জাপানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে অনেক জাপানীর মুখ শুকিয়ে গেল। উপায়ন্তর না দেখে সিণ্টোইজমের রূপ পরিবর্তন করাই সাব্যস্ত হল এবং জাপানের যিনি এক দিন মাত্র সম্রাট ছিলেন হঠাৎ নূতন দর্শন মতে জাপান সম্রাট সূর্যপুত্র ত হলেনই উপরন্তু হয়ে গেলেন দেবতা। জাপান সম্রাট যেদিন থেকে দেবতা হলেন সেদিন থেকেই জাপানের ইতিহাস বদলে গেল। জাপানীরা আর ঘরমুখো না হয়ে বনমুখী হয়ে দাঁড়াল। জাপানের সর্বসাধারণের মধ্যে রাজভক্তি বিস্তার লাভ করল। যুবক যুবতী জাপান সম্রাটের মংগলার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল। এরূপ কিন্তু পূর্বে ছিল না। জাপানীরা ছিল "ইন্‌ডিভিজুয়েলিষ্ট।" ইন্‌ডিভিজুয়েলিষ্টরা যখন সংগঠন করে তখন তারা হয় ফেনাটিক। জাপানে জাতীয় ফেনাটিসিজম এসে দেখা দিল। সেজন্য জাপানীরা দায়ী নয় দায়ী ইউরোপীয়ান্ সাম্রাজ্যবাদী।

বৃটিশের কাছ থেকে জাপানীরা সম্রাটকে জাতের সর্বেসর্বা করে নেবার রীতিনীতি শিখে নিল, আর আমাদের কছে থেকে শিখে নিল পিতৃ পুরুষকে পূজা করা। আগে ছিল তারা ইন্‌ডিভিজুয়েলিষ্ট পরে তারা ইন্‌ডিভিজুয়েলিষ্টই রইল কিন্তু সে ইন্‌ডিভিজুয়েলিজম্ সমুদয় জাতটাকে নিয়েই করা হল। নূতন প্রলোভনও তাতে যোগ দেওয়া হল। যথা—মরলে পরে আমরা (মানে শুধু জাপানীরাই) স্বর্গে যাব, পৃথিবীর অন্যান্য জাত নরকে গিয়ে বাস করবে। আমরা নরকের কথা চিন্তা করব না। আমাদের সম্রাট সূর্যপুত্র। স্বর্ণরাজ্যে যাবার তিনিই আমাদের উপায় করে দিবেন।

কথাগুলি শুনতে বড়ই মামুলী কথা বলে মনে হয়, কিন্তু পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তার পেছনের দর্শন আর নেই, সকলের পেছনেই একটা মধ্যযুগীয় ভাব এসেছে। মধ্যযুগীয় ভাব ইউরোপ পরিত্যাগ করেছে। এশিয়ার স্থানে স্থানে এখনও পুরামাত্রায়ই আছে আর কোথাও বা নূতন রূপ নিয়ে ফেনাটিসিজমে

পরিণত হয়েছে। এই মধ্যযুগীয় ভাবকে জাপানী ব্লেক ড্রাগন কি করে ফেনাটিক করে তুলল তা পরে বলা হবে।

স্নান সমাপন করে পথ ধরে যখন রামাণীর বাড়িতে ফিরছিলাম তখন হঠাৎ দেখলাম কতকগুলি লোক নূতন উদ্যম নিয়ে সংবাদ পত্র বিক্রি করছে। যখনই নূতন উদ্যমে সংবাদ পত্র বিক্রি হয় তখনই যে কোনও ভাষায় সে সংবাদ পত্র বিক্রি হউক তা আমি ক্রয় করতাম। সংবাদ পত্রখানা কিনে ঘরে নিয়ে এলাম। রামাণীর পাচিকাকে গিয়ে বললাম "এতে কি সংবাদ আছে তা একটু দয়া করে পড়বেন এবং আমাকে বলবেন।" খুকসান তাই মন দিয়ে পড়ল এবং তার সারমর্ম আমাকে বলল।

পত্রিকা বিচিত্র তথ্যে পূর্ণ। কতকগুলি সোভিয়েট প্রজা যারা মানচুরিয়া এবং কোরিয়ার সীমান্তে প্রবাহিত সিংগোরী নদীতে অবস্থিত দ্বীপে বাস করত তারা হঠাৎ একদিন দ্বীপগুলি পরিত্যাগ করে মেইন লেণ্ডে চলে যায়। সোভিয়েট সরকার হটাৎ এদের চলে আসার জন্য শাস্তির বিধান করেন। যারা সোভিয়েটের কঠোর শাস্তির কথা জানত তাদের মধ্যে কতকগুলি লোক নৌকার সাহায্য নিয়ে জাপানে পালিয়ে আসার সময় জাপানী সামুদ্রিক পুলিশ তাদের প্রতি গুলি বর্ষণ করে। গুলি বর্ষণের ফলে তিনটি যুবক মারা যায়। সে জন্য জাপান সরকার বড়ই অনুতপ্ত। যারা বেঁচে আছে তাদের ও জাপান সরকার সোভিয়েট রুশিয়ার কন্সালের হাতে অর্পণ করবেন বলেই ঠিক করছেন।

এই ত গেল জাপানী খবর। তারপর যখন বৃটিশ এবং আমেরিকার সংবাদ-পত্রগুলি এই সংবাদটিই তাদের সংবাদ পত্রে প্রকাশ করলেন তখন সংবাদটি রূপ বদলে গিয়ে আরও ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করল। এদের সংবাদ পরিবেশন দেখে মনে হচ্ছিল ইউরোপীয়ান্ সাম্রাজ্যবাদীর সংগে হাত মিলিয়ে জাপানী উগ্রসাম্রাজ্য-বাদীরাও সোভিয়েট রুশিয়ার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। আমি তখনই রামাণীকে বলেছিলাম ঝুনা ইউরোপীয়ান্ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে ফেনাটিসিক

জাপান যদি পা ফেলে চলতে চেষ্টা করে তবে জাপানের ফেনাটিকদের অস্তিত্ব থাকবেনা। ঘটেছেও তাই।

কেনেডা যাবার টাকার অনেকটা বন্দোবস্ত হয়েছিল। ভাবলাম এখানে বসে থেকে আর লাভ কি ? এবার যদি টোকিওর দিকে রওনা হই তবেই ভাল। আমি টোকিওর দিকে রওনা হব জেনে রামাণী আমাকে বল্ল, চল আমরা রবিবারে স্থানীয় আমোদ প্রমোদের স্থানগুলি দেখে আসি। আমি তাতে রাজি হলাম এবং তাকে বল্লাম এর মধ্যে একদিন ওসাকা থেকে বেড়িয়ে আসব। মাত্র ত আটাশ কিলোমিটার, সকালে রওনা হয়ে শহরটা দেখে বিকালের দিকে ফিরে আসব। তার একটি বন্ধু আমার সংগে যাবে সে কথা তাকে বল্লাম এবং পরের দিনই আমরা জাপানের সর্ববৃহৎ কারখানাপূর্ণ শহরটি দেখতে যাব স্থির করলাম।

পরের দিন সকালবেলা রামাণীর বন্ধু এসে ডাকল এবং আমরা ও সাকার দিকে রওয়ানা হলাম। ওসাকাতে কোন্ পথ ধরে চলতে হবে তা আমাকে ভাবতে হল না। সংগের যুবকই তার সন্ধান নেবে এবং সেজন্যই নিশ্চিন্ত ছিলাম। প্রথম সমুদ্রতীর তারপর বড় রাস্তা পার হয়ে যখন আমরা গ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পথে এলাম তখন দেখতে পেলাম নূতন একটি রাস্তা হচ্ছে। নূতন রাস্তা ধানক্ষেতের উপর দিয়ে চলেছে। বাকেট বোঝাই করে ট্রলীতে চেপে ফলন্ত ধান ক্ষেতের উপর মাটি ফেলা হচ্ছে। যে সমস্ত ফলন্ত ধান মাটির নীচে চলে গেছে সেগুলি হয়ত এরই মাঝে পচে গেছে আর যে সকল ধানের থোবা মাটি নীচে যাবে যাবে করছে তারাও সকালের স্নিগ্ধ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। একটি কৃষক সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখছে। জাপানীদের মুখ দেখে কিছুই বুঝা যায় না সেজন্য বলতে অক্ষম লোকটির মনের ভাব তখন কি রকম সংগের যুবক নূতন ভাবের ভাবুক। ধনীর ছেলেরা যে ভাবে নূতন চিন্তা করে সেও সেই ধরনেরই। তাদের চিন্তাধারা হল কি সুন্দর ফুলটি। কিন্তু তারা বাগানের মালির ছেঁড়া কাপড়

দেখেনা। সেজন্য আমি তাকে জাপানী লোকটির সংগে কথা বলতে অনুরোধও করলাম না।

কোবে হতে ওসাকা পর্যন্ত নানারূপ যানবাহন চলাচল আছেই তবুও মাঝে মাঝে মনে হত নীরবতা বিরাজ করছে। আমরা যখন ওসাকার উপকণ্ঠে এসে পৌছলাম তখন সংগের যুবককে জাপানের কুটির শিল্প দেখাতে বল্‌লাম। যুবক আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে বল্‌লে জাপানে কুটির শিল্প নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কুটির শিল্প বলতে তুমি কি বুঝ? সে বল্‌লে এই ধরুন সূতা কাটা তাঁতে কাপড় বুনা ইত্যাদি। আমি বল্‌লাম আমাদের দেশে কুটির শিল্প বলতে তাই বুঝায়। জাপানে তা বুঝায় না। জাপানের কুটির শিল্প মানে ছোট ছোট ইলেকট্রীক মেসিনের সাহায্যে ছোট ছোট স্থানে কম লোকের সাহায্যে কনট্রাক্ট দিয়ে বশি কাজ করানো।

আমরা ওসাকার যে পথটা ধরে চলছিলাম তারই পাশে একটি কাঠের পুতুলের ফেক্টরী দেখতে পেলাম রসির মত ছোট করাতখানা বেল্টের মত ঘুরছে। মজুরেরা তাদের ইচ্ছা মত আঁকা বাঁকা টুকরা তাতে ধরে দিচ্ছে মিনিটের মধ্যে ঘোড়া উট ইত্যাদি জানোয়ার বের হয়ে আসছে। পাশেই চিত্রকর তুলি নিয়ে বসে আছে। এক একটি পুতুলকে একটু রং দিয়ে পাশের লোকের হাতে দিয়ে দিচ্ছে পাশের লোক সেই কাঠের পুতুলগুলিতে শেষকার্য সমাপ্ত করে অন্য লোকের কাছে দিচ্ছে। অন্য লোকটি পুতুলটাকে বাক্স বন্দি করে একদিকে ফেলে দিচ্ছে। অন্য আর একটা লোক তাতে লেবেল লাগিয়ে দিয়ে সুন্দর সারি করে রাখছে। এই হল জাপানের কুটির শিল্পের নমুনা।

জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ধর্মঘট হতে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এর পুর্বে জাপানের লোক ধর্মঘট কাকে বলে তা বুঝত না। কারণ তখন জাপানের মজুর জাপানী "থ্রি-প্রিন্সিপল" মেনে চলত। সম্রাট জাপান এবং জাপানী! এই যে তিনটি কথা তার পেছনে অনেক কথা আত্মগোপন করে রয়েছিল। যতটুকু বুঝতে

পেরেছিলাম তারই কিছুটা এখন আভাস দিচ্ছি। কথাটা বলবার পূর্বে আমাকে অন্য আর একটি কথাও বলতে হবে।

তখন ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা। সেই প্রতিদ্বন্দিতাতে জয়ী হবার জন্য প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদীই নিজের দেশের লোককে যেমন করে ঠকাবার চেষ্টা করেছে বিদেশীকেও তেমনি ঠকাবার চেষ্টা করেছে! এতে যদি জাপানীরা সামান্য অংশ গ্রহণ করেই বা থাকে তবে দোষের কিছুই নয়।

আমেরিকার অথবা বৃটিশের প্রাপগেণ্ডা পড়ে যারা জাপানীদের মন্দ বলেছেন তাদের আমেরিকার সাম্রাজ্যনীতিও একটু দেখতে বলি। বৃটিশ ত এখনও ভারতেই আছে। বৃটিশের পবিত্রস্থানের ধাক্কা সামলাবার পর জাপানদের উগ্রসাম্রাজ্যনীতির কথা চিন্তা করলে আর দুঃখের কিছুই থাকেনা।

ওসাকায় যেমন ছোট ছোট কুটির শিল্প ছিল তেমন বড় বড় কলকারখানাও ছিল। যে স্থানে যে ভাবেই কলকারখানা থাকুক তাতে ব্যাভিচার থাকবেই, অবশ্য কথাটা শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের দেশেই প্রচলিত। সোভিয়েট রুশিয়ায় তার বিপরীত। সেখানে কলকারখানাতে লোক সুখে থাকে এবং ব্যাভিচার থাকতে পারেনা। ওসাকাতে পৌছা মাত্রই কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আমার চোখের সামনে এসেছিল যার পরিচয় কিছুটা আমি কোরিয়াতে পেয়েছিলাম এবং কোরিতেও তার গন্ধ পেয়েছিলাম। সেজন্যই সাথের যুবকটিকে নিয়ে কোথাও আর না গিয়ে মস্তবড় একটা বিদেশী খাবারের দোকানে পৌছি।

বিদেশী ধরণের খাবার পাওয়া যেত বলেই খাবারের দোকানকে বিদেশী বলা হয় প্রকৃতপক্ষে খাবারের দোকানের মালিক এবং কর্মচারীরা সকলেই জাপানী। খাবারের দোকান দ্বিতল। নীচে যারা বসে খায় তারা হল ধনী জাপানী আর উপরে যারা খায় তারা হল বিদেশী যেমন ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান আমেরিকান ইত্যাদি। উপরে খাবারের দাম নীচের দ্বিগুণ অথচ খাদ্য একই। বসার পার্থক্য মাত্র। আমাদের দেশেও সেরূপ খাবারের দোকানের জন্ম হয়েছে, এবং প্রচলন ও প্রচুর।

আমরা উপরে নিয়ে প্রকাণ্ড স্থানে বসলাম এবং সেজন্যই আমাদের সাধারণ রকমে খাদ্য পরিবেশন করা হল। আমাদের পাশেই কতকগুলি বিশেষ বসার স্থান ছিল সেখানে যারা খেতে বসে তাদের খাদ্য এনে দেয় ঘেইসা গার্ল। ঘেইসা গার্লদের আমি "ঘেসা গার্ল" বলি। এরা কাছে এসে বসে এবং মধুর ভাষায় কথা বলে। খাবারের সময় খাবারের চিন্তাই করতে হয়, মিষ্টি কথার দরকার হয় না। অবশ্য এসব মিষ্টিকথার অন্তরালে অন্য কিছুও থাকে তা এখানে বলার নয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশে জন্ম নেবার পর থেকে যাদেরই তিন টাকা দিয়ে বই কেনার ক্ষমতা থাকে তাকে আর বলে দিতে হয় না "অন্তরালে" কি থাকে। ধনীর ছেলেরা 'অন্তরালে" কথাটাই সুখী হবেন না তারা আরও কিছু চাইবেন তা আমি জানি কিন্তু এ বই সর্বসাধারণের হাতে পড়বে সে জন্যই বিশদ ব্যাখা করা হল না।

সাধারণ জাপানীরা ঘেইসা গার্লকে ঘৃণা করে। ধনীরা ঘেইসা বালিকাদের প্রকাশ্যে গাল দেয়। কিন্তু জাপানী বালিকা কেন ঘেইসা বৃত্তি অবলম্বন করে সে কথা কেউ তলিয়ে দেখে না। আমাদের দেশেও বারবনিতাদের আমরা ঘৃণা করি গাল দেই আবার আমরাই তাদের দৈনিক আহার এবং বিহারের খরচ যুগিয়ে চলি।

আমাদের খাওয়া হয়ে গেল খাবারের দাম ধনীর ছেলে প্রায় একশত ইয়েনের মত দিয়েছিলে। একশত ইয়েন প্রায় একশত টাকা দুজনের খাবারের জন্য চলে গেল দেখে আমার বড়ই দুঃখ হল! আমি যুবককে সেজন্য কিছুই না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম যতদিন জাপানে থাকব ততদিন এরূপ স্থানে আর কখনও আসব না। আমার মনে হল এখানে আহার এবং বিহার সকলটার দাম একত্রে ধরা হয়। ইচ্ছা হয় শুধু খেয়ে যাও, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে খেয়ে বিশ্রাম করেও যেতে পার কিন্তু দামটা পুরাপুরি দিতেই হবে।

জাপানে নব্বই বৎসর পূর্বেও ঘেইসা ছিল না, মদের দোকান ছিল না কিন্তু যেদিন থেকে জাপান ইউরোপীয় কায়দার সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করল সেদিন থেকেই

তাদের দেশে সবই আসল। কতকগুলি জাপানী তা বুঝল আর কতকগুলি জাপানী তা বুঝেও চুপ করে চোখ বুজে রাখল। জাপান উগ্র সাম্রাজ্যবাদের দিকে ক্রমেই আগিয়ে চল্‌ল।

যুবকের হাত থেকে এতগুলি টাকা চলে গেছে দেখে ওসাকাতে বেড়াতে ভাল লাগল না আমি তাকে নিয়ে কোবের দিকে রওয়ানা হলাম। যুবকও আমার সঙ্গে সুখী ছিল। সে হয়ত ভাবছিল আমার ও নানারূপ দোষ আছে কিন্তু সে জানতনা যে দিন থেকে আমি পথে বের হয়েছিলাম সেদিন থেকে আমার নানারূপ দোষ সিঙ্গাপুরেই ছেড়ে দিয়ে আসছিলাম। ছিলাম ব্যাভিচারী পরে যখন পথে নেবেছিলাম তখন কয়েক মাসের মধ্যেই হয়েছিলাম ব্রহ্মচারী এবং, অদৃষ্টবাদী। তারপর যখন চীনে প্রবেশ করলাম তখনই বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের অদৃষ্ট মানুষই গড়ে সেজন্য অদৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য বজায় রেখে নিজের কাজের উপরই সব কিছু নির্ভর করে চলতাম।

যুবক চলতে পারছিল না সেজন্য পথে বিশ্রাম করতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি করে আমি এত চলতে পারি? আমি তাকে আমার ধৈর্যের কথা বললাম এবং বুঝিতে দিলাম যদি সে ধৈর্য ধরে ব্যবসা বাণিজ্য করে তবে সেও ধনী হতে পারবে। অনর্থক অর্থ খরচ করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে বড়ই অন্যায় কাজ। আমাদের খাবারের জন্য সে এত খরচ করেছে দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি তাও বলতে বাধ্য হলাম। আমার কথা শুনে সে দুঃখিত হয়েছিল। সে দিন থেকেই সে আমার সংগ পরিত্যাগ করে এবং আর কখনও আমার সংগে সাইকেল নিয়ে বেড়াতে যায়নি। ধনীর ছেলের পায়ে হাঁটা অভ্যাস ছিলনা। মোটরেই ভ্রমণ করত। হটাৎ সাইকেলে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেড়িয়ে এসে জ্বর হয়। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জাপানী ডাক্তার এল, ঔষধ দিল তারপর যুবক ভাল হল। হায়রে ভারতীয় ব্যবসায়ীর ছেলে

যদি জাপানে থেকে অন্তত জাপানী ব্যবসায়ীরা কিরূপে জীবন কাটায় দেখতে পারতে তবুও দেশের অনেক উন্নতি হত।

জাপান আজ পরাধীন বল্‌লেও শেষ হয় না। জাপান স্বাধীন ছিল, সাম্রাজ্য বাদী হয়েছিল, বিদেশে রাজ্য বিস্তার করেছিল। এতটুকু উন্নতিই বল আর অবনতিই বল সেইটুকু অর্জন করতে জাপানকে বেশ কিছু শিখতে হয়েছিল। আমাদের দেশের ধনীর ছেলেরা জাপানের সেই গুণ না দেখে শুধু ঘেইসা চরিত্রের দিকেই তাকিয়ে থাকত। আমেরিকান এবং বৃটিশ সেই ঘেইসা চরিত্রকেই আমাদের দেশের লোকের সামনে ধরে তুলত। জাপানের হাতে সর্বপ্রথম কোরিয়াদেশটাকে তুলে দেওয়া তারপর মানচুরিয়ার স্বাধীনতা অপহরণ করে জাপানকে সে দেশটা দিয়ে দেওয়া এসব কথা ভারতের ব্যবসায়ী নন্দনরা কখন ও চিন্তাও করতনা চীন সরকার মানচুরিয়া হতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে এর বেশি সংবাদ ভারতে সুধীসমাজের সভ্যরাও বলতেন। আসল খবর হতে দূরে থাকাই যেন আমাদের একটা অভ্যাস সেজন্যই বিদেশের ভারতীয় ধনীপুত্রদের কথা বলে সময় নষ্ট করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এবার আমার জাপানী অপেরা দেখার পালা। রবিবার এল। আমরা জাপানী অপেরা দেখতে চল্‌লাম। জাপানী অপেরা আমাদের দেশের অপেরা গৃহের মত নয়। শহরের একটু বাইরে এবং একটু নিরিবিলি স্থানে অবস্থিত। অপেরার গেইট্ এর কাছে পৌছা মাত্রই একটা স্নিগ্ধ ভাব এল। বেলা নটার সময় অপেরা আরম্ভ হবে। প্রত্যেকটি দর্শক লাইন দিয়ে টিকট কিনে অতিসন্তর্পণে হলগৃহে প্রবেশ করছিল। আমরাও নীরবে ঘরে প্রবেশ করে ইচ্ছামত সিটে বসলাম। জাপানী অপেরায় শ্রেণী নেই সিটের সংখ্যা কম। মাইক্রোফোন এমনি ভাবে চারিদিকে বসানো থাকে যে সকলেই সমান ভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীর সকল কথা বুঝতে পারে। জাপানী অপেরার স্থান বসার কায়দা এবং ঘরের সৌন্দর্য আমেরিকান অথবা ইউরোপীয়ানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকাল

বেলাতে অপেরা হয় বলে সকলেরই মনের ভাব ভাল এবং অপেরা গৃহের শৃংখলা বজায় থাকে।

আটটি দৃশ্য দেখলাম। প্রত্যেকটি দৃশ্য একাংকে সমাপ্ত। এতে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না এবং গানের বাহুল্য না থাকতে বিষয় বস্তুর উৎকর্ষতা বেড়ে যায় অপেরা সাধারণতই বর্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা কারা হয়। জাতীয়তা বাদ বেশ ভাল করে ফুটিয়ে তোলা হয়। বিদেশে জাপানীরা কি ভাবে অত্যাচারিত হয় তার ও দৃষ্টান্ত বেশ স্পষ্ট করে দেখান হয়। এখানে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া অন্যায় হবেনা।

একটী জাপানী যুবক জাপানেরই একটি চায়ের দোকানে বসে আছে। যুবকের পিতা যুবকের হাত খরচের জন্য পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়েছিল। সে পঞ্চাশ সেণ্টের চা কোন সময় যে শেষ করেছে তার মনেই ছিলনা। সে যখন চা খাচ্ছিল তখন এত তন্ময় হয়ে আরজেনটাইনের একটী ছবি দেখছিল আর ভাবছিল কি করে সে দেশে যাওয়া যায়? আরজেন্‌টাইনায় যেতে হলে ইমিগ্রেসন আইন মতে এশিয়াটীকদের প্রবেশ নিষেধ। জাপানীরাও তা হতে বাদ পড়েনি। প্রথমত ইমিগ্রেসন আইনের উপর তার ভয়ানক রাগ হল এবং কি করে ইমিগ্রেসন আইন উঠিয়ে দেওয়া হয় তারই জন্য উপায় চিন্তা করতে লাগল। যখন সে ইমিগ্রেসন আইন উঠাবার চিন্তা করছিল তখন তার পাশে হনুমানমুখী একটা চীনা এসে দাঁড়াল তারপর আসল একটা চতুস্পদী মালয়। মালয়টার পাশেই একটা পাগড়ীপরা লোক। তার মুখের এক দিক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। পাজামাটাতে নানারূপ বদ্‌রং চিত্রিত ছিল। দাড়িগোঁফ মোল্লা ধরণের ছাঁটা এবং খালি পা ছিল। মাথার চুল গুলি লম্বা মাঝে মাঝে উকুনের দংশন সহ্য না করতে পেরে মাথা চুলকাচ্ছিল জাপানী যুবকের মনে হ'ল জেগে সে স্বপ্ন দেখছে। এদিকে চায়ের দাম ষাট সেণ্ট হয়েছে। যুবক পঞ্চাশ সেণ্ট পরিশোধ করে পকেট হতে ফাঁউনটেন পেনটা চায়ের দোকানের মালিকের হাতে দিয়ে বল্‌ল, আপনার বাকি দশ সেণ্ট দিয়ে

কলম ফেরত নেব। চায়ের দোকানের মালিক মাথা নত করে বারবার ধন্যবাদ (আরে গাত গদাই মাস্) বল্‌ল তারপর যুবক নিজের ঘরের দিকে রওনা হল।

পথে দেখা হল তার বন্ধুর সংগে। বন্ধু কি বল্‌ল, সে কথা তার কানেও গেল না। সোজা নিজের পড়বার ঘরে গিয়ে একখানা বই বের করে তাতেই মন সন্নিবেশ করল। সারারাত বইটা পড়ে যখন বইখানা সমাপ্ত হল তখন সে স্নান করতে গেল। বেশ করে স্নান করে রক্ষিত খাবার খেয়ে শোবার ঘরে এসে বসল এবং অনেকক্ষণ কি চিন্তা করে একটা অপিসে গিয়ে কতকগুলি কাগজ পত্রে দস্তখত করে ত্রিশটি ইয়েন এনে সে সর্বপ্রথম চায়ের দোকানে গিয়ে দশ সেণ্ট দিয়ে নিজের কলমটা মুক্ত করে গ্রাম্য মন্দিরে গিয়ে নিজের পুর্বপুরুষদের পূজা দিল এবং প্রার্থনার সময় বল্‌ল "হে আমার পুর্বপুরুষ তোমাদের কাছে বলছি, আমি তোমাদেরই সন্তান। তোমাদের সম্মান রক্ষার্থে আমি আরজেনটাইনাতে যাব এবং সে দেশের বর্বরদের তোমাদের এবং তোমাদের বংশের সকলের গোলাম করব। এই কাজটি করতে আমার জীবন ত খরচ হবেই হয়ত আমার আরও অনেক জাপানী ভাইয়েরও জীবন খরচ করতে হবে। জীবন ত তুচ্ছ কিন্তু হে আমার মহামান্য পুরুষ তোমাদের সম্মান আমি আরজেনটাইনাতে কায়েম করবই।"

সুখের বিষয় জাপানীদের পুর্বপুরুষের পূজায় অর্থের দরকার হয় না। সেজন্য সেখানে তাকে একটী পয়সাও খরচ করতে হয় নি। যুবক ঘরে এসে তখন দেখতে পেলে তার মা বাবা খেতে বসেছেন। সে তাদের কাছে বসে ভক্তিভরে প্রণাম করল তারপর কিমোনোতে রক্ষিত ইয়েনগুলি তাদের কাছে রেখে দিয়ে আবার প্রণাম করে বলল, আমি আর পড়ব না, আমি বিদেশে চলেছি। ও এস্ কে জাহাজ কোম্পানীতে আমার চাকুরি হয়েছে। আমি আমার মহামান্য পিতৃ পুরুষের সম্মান রাখতে সামান্য চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

আমার প্রথম অর্জনের অর্থ তোমাদের কাছে আমার পূর্বপুরুষের নাম ক
নিবেদন করছি। তোমরা গ্রহণ কর।

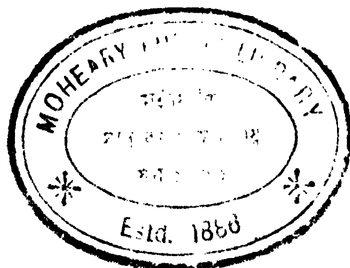
আর কোনও কথা হল না। যুবকের মা বাবা তাদের পিতৃপুরুষের না
মাথা নত করে একই সংগে ছেলের দেওয়া অর্থ গ্রহণ করল।

এখানেই অভিনয়ের শেষ। অভিনয়টা আমার কাছে বেশ লেগেছিল কি
যখন এই অভিনয়ের কথাই আমার দুটি জাপানী বন্ধুর কাছে বলেছিলাম তখ
তারা বলেছিল, 'হে আমাদের বিদেশী বন্ধু, অভিনয় বোঝনি, এটা অভিনয় নয়
সত্য ঘটনা। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এরূপ অভিনয় দেখে আমরা কেঁ
উঠি। এরূপ অভিনয়ের পেছনে রয়েছে ব্লেক ড্রাগনিষ্টদের উপদেশ এব
আদেশ।

এবার আমার কোবে (KOBE) যাবার সময় এসেছে তা পূর্বেই বলেছি সেজ
এক দিন আম্মাজানের সংগে গিয়ে দেখা করলাম। আম্মাজান বললেন টৌকি
হতে ফিরে এসে আমার সংগে সাক্ষাৎ করো। তাঁর কথায় সায় দিয়ে ঘর হ
বের হয়ে এসে দেখি সূর্য কিরণ যেন নূতন করে বাড়ির চারদিকে ছেয়ে ফেলেছে
কি সুন্দর সে সূর্য কিরণ! মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। কুয়াশার জল টবে রাখ
ছোট ছোট ফুলগাছের উপর বিন্দু বিন্দু হয়ে জমে রয়েছে। সোনালী সূর্য কির
তার উপর পড়ে মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ করছে। যতক্ষণ মনে শান্তি থাকে ততক্ষ
সৌন্দর্য বোধও থাকে। সেই সুপ্রভাতে আমার মনে শান্তি ছিল সেজন্যই এ
সৌন্দর্য বোধ আমার মনটাকে ছেয়ে ফেলেছিল।

আনমনা চিত্তে সাইকেলে উঠে বস্‌লাম। পথটা ভয়ানক উৎরাই। হঠা
সাইকেল হতে পড়ে গেলাম এবং বাঁ হাতের তলাতে একটি ছোট পাথর টুকরা ঢুকে
গেল। কোনরূপ চিন্তা না করে এক জাপানী ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তা
আমাকে বসিয়ে রেখেই এক খানা ছুরি দিয়ে চাম্‌ড়াটা একটু প্রশস্ত করে কো
পাথরটি বের করলেন এবং একটু বেন্‌জিন দিয়ে বেঁধে দিলেন। ডাক্তার কিছু

চাইলেন না। চাইল তার ছোট্ট একটি চাকর, সামান্য অর্থ। আমি তাকে একটি ইয়েন দেওয়ায় সে বড় সুখী হল। ডাক্তার রক্তচক্ষু করে ছেলেটাকে ধমক দিলেন। ছেলেটা যখন ইয়েনটি ফিরিয়ে দিতে এল তখন আমি পথে এসেছি। ডাক্তার যে ভাবে আমার হাতখানা বেঁধে দিয়েছিলেন তা পরের দিনও খুলিনি। তৃতীয় দিন সকাল বেলা হাতের ব্যাণ্ডেজ্‌টা খুলে দেখলাম হাত শুকিয়ে গেছে।



ওসাকা

সকাল সাতটা। ঘুম থেকে উঠেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শহর হতে বের হবার পথ পূর্বেই দেখেছিলাম, সেজন্য পথের আর ভুল হল না। সমুদ্রতীরে এসে দেখি এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সমুদ্রের স্বচ্ছ জল সমুদ্র তীরের বালুরাশির উপর ধীরে এসে ফেনিয়ে যাচ্ছে। তাতে পূর্বের আলো পড়ায় প্রত্যেকটি ফেনবিন্দুকে এক একটি মুক্তার মত দেখাচ্ছে। এক দিকে সুন্দর সাগর তীরের দৃশ্য আর অপর দিকে পাহাড় কাটা পথ—এর মাঝে এসে সাইকেল হতে নামলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম একবার ওসাকাতে গিয়েছি, আবার যাচ্ছি। এখন সেখানে গিয়ে কি দেখব? সেখানে গিয়ে জাপানী জীবন দেখব, জাপানের পলিটিক্স ভাল করে বুঝব। কোবেতে থাকার সময় কিন্তু জাপানীদের সম্বন্ধে বড় কিছু ধারণা করতে পারিনি কারণ স্বদেশবাসীর বাড়ীতে থাকলে স্বদেশের কথাই মনে হয়, অপরের কথা মনে খুব কমই আসে। তারপর আর একটি কথাও রয়েছে। অপরের বাড়িতে থাকলে মন যুগিয়ে থাকতে হয়, তাতে স্বাধীনতা মোটেই থাকেনা।

একটু বিশ্রাম করেই এগিয়ে চল্‌লাম্। সমুদ্রের তীরেই কতকগুলি জেলে যুবক শুষ্ক মুখে মাছ ধরছিল, এদের মুখ দেখে মনে হল এরা পরিশ্রান্ত। সারারাত এরা শুতে পারেনি তবুও এরা মাছ ধরছে। এদের যেন বিশ্রাম করার ইচ্ছা মোটেই নেই। এদের শ্রম কাতর মুখ দেখে দুঃখ হল। ভাবছিলাম এরা এত পরিশ্রম করছে কিন্তু মজুরী কি সে অনুপাতে পাবে? খুব বেশি ত দুই ইয়েন, কিন্তু এদের ধরা মাছই যারা বিক্রি করবে তারা পাবে অনেক টাকা। কোবেতে আমি মাছের দোকানে যেতাম। সেখানে দেখতাম



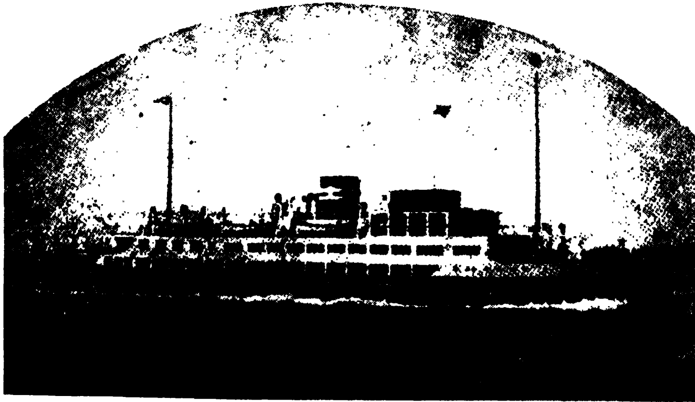
জাপান সম্রাজ্ঞীকে সর্বসাধারণ সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে



জাপানের অন্তর্বর্তী সাগর



নাগয়ার বৌদ্ধ মন্দির



জাপানী অন্তর্বর্তী সাগরের দৈনিক
যাত্রীবাহী জাহাজ এস্ এস্ হিয়েমারু

যেসকল জেলে সমুদ্রে মাছ ধরে হাটের বেপারীর হাতে তাদেরই ধরা মাছ ছেড়ে দিয়েছে তারাই নিজের খাবারের জন্য বেশী দাম দিয়ে ভাল ভাল মাছ কিনে নিচ্ছে। এটাকেই বলে মজুরী। আর এটাকেই বলে মজুরদের এক্সপ্লয়েট করা। রামাণীর দোকানেই একটা জাপানী ব্যবসায়ী আমাকে 'ভিখিরী বলে নিন্দা করেছিল। আমাকে ভিক্ষা করতে সে এক দিন দেখেছিল। যেদিন সে আমাকে নিন্দা করেছিল সেদিন আমি তাকে কিছুই বলিনি কিন্তু টোকিও হতে ফিরে এসে তার দেখা পেয়েছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, 'আমি ধারণা করেছিলাম জাপানের ব্যবসায়ীরা জাপানী মজুরদের ঠকায় না, কিন্তু টোকিও পর্যন্ত ভ্রমণ করে আমার ধারণা হয়েছে জাপানী মজুরদের জাপানীরা যেমন ঠকায় কোনও সভ্যদেশ তেমন ঠকায় না।

এই ব্যবসায়ী রামাণীকে সিল্ক সাপ্লাই করত। আমি তাকে বলেছিলাম কোবে হতে টোকিও পর্যন্ত আমি ভ্রমণ করেছি। এই পথটুকুর মধ্যে জাপানীরা আমাকে মাত্র দশ ইয়েন দিয়েছে। আমি কারো কাছে হাত পাতিনি, তারা নিজে ইচ্ছা করে দিয়েছে, আর ঐ যে দেখছেন হাজারে হাজারে ইয়েন পেয়েছি তা আমার দেশবাসী দিয়েছে, জাপানীরা দেয়নি। কিন্তু আমি এই সামান্য ভ্রমণের ভেতর দিয়েই বুঝতে পেরেছি জাপানী ব্যবসায়ীরা জাপানীদের কি প্রকারে ঠকাচ্ছে। লোকটা আমার কথা শুনে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল কারণ সে যদি বেশি কথা বলত তবে রামাণী তার সংগে নিশ্চয়ই ব্যবসা বন্ধ করে দিত।

কতক্ষণ যাবার পরই একটি গ্রাম পেলাম। পূর্বের দিন এই গ্রামে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়নি। আজ ইচ্ছা হল স্বাধীন ভাবে গ্রাম দেখতে। জাপানী গ্রাম ইউরোপীয় প্রথা কতকটা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এক দিকে কোবে আর অন্যদিকে ওসাকা। এত বড় দুটো শহরের মধ্যে যে সকল গ্রাম অবস্থিত তার প্রত্যেকটিই পশ্চিম দেশীয় প্রথা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

গ্রামে নানা রকমের দোকান রয়েছে। খাবারের দোকানেরও অভাব ছিল না। লজিং হাউস, যার অপর নাম আমাদের ভাষায় হোটেল তাও গণ্ডায় গণ্ডায় রয়েছে। আমার একটু চা খাবার দরকার ছিল। সেজন্য একটি চায়ের দোকানে গিয়ে উঠলাম।

গ্রামের চায়ের দোকান সাধারণত বারটার পরে খোলে। মজুররা তখন থেকেই গ্রামে ফিরতে থাকে। কিন্তু আমি যে সময় চায়ের দোকানে পৌঁছি তখন মাত্র নটা। দোকানের সামনের দরজা খোলা এবং আসবাব সবই পরিষ্কার হয়েছে। পরিচারিকা মাত্র ঘুম থেকে উঠে নীচে নেমে এসেছে। উপর তলায়ই পরিচারিকারা থাকে। তার আলুথালু বেশ। মুখ তখনও ধোয়নি তখনও পরচুল লাগিয়ে ঘেইসা রূপ ধারণ করতে পারেনি। এমনি সময় একজন বিদেশীকে দোকানের মালিক অথবা পরিচারিকা আশাও করতে পারেনি। আমাকে দেখামাত্র পরিচারিকারা আমার কাছে এসে বসল এবং কি চাই জাপানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, যেন আমি তার বিশেষ পরিচিত। আমি এক পেয়ালা ইংলিশ চা আর কখানা ইংলিশ বিস্কুট চাই বলামাত্র পরিচারিকা বেল টিপ দিল। যুবক আসলে তাকে আমার দরকারী জিনিস আনতে বলল। জাপানী পরিচারিকা যাদের ঘেইসা বলা হয় তারা শুধু গ্রাহকের পকেট উজাড় করতেই জানে। তারা খাদ্য এনে দেয় না। যদিও বা এনে দেয় তবে গ্রাহকের সৌভাগ্যই বলতে হবে। যুবক আমাকে খাদ্য এনে দিল আর ঘেইসা আমার গা ঘেঁসে বসে থাকল। আমি তা পছন্দ করলাম না। দাঁড়িয়ে চা খেয়ে দুখানা বিস্কুট পকেটে ফেলে ঘেইসা স্ত্রীলোকটির হাতে একটি ইয়েন গুঁজে দিয়ে "ছায়াপারা" বলেই বিদায় নিলাম।

আমি বিদেশী এবং অপরিচিত। আমার কাছে এরূপ ভাবে ঘেঁসে বসা যুবতীর ঠিক হয়নি। যুবতীও ইচ্ছা করে আসেনি। অভ্যাস বশে এসেছে। তাদের এই কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত করা হয়েছে। যদি সে এই কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত না

থাকত তবে সে আমার কাছেও আসত না। ইংলিশ আমেরিকান খাবার বিক্রেতা যুবতীরা আমার কাছেও আসত না। যখন তারা খাবার দেয় তখন মনে হয় নিজের কোনও আত্মীয়ই খাবার দিচ্ছে আর খাবার খাচ্ছি। জাপান এই কুঅভ্যাস চীনদের কাছ থেকে আয়ত্ব করেছে। চীনের চায়ের দোকানের বালিকা অর্থাৎ যুবতীরা এই ভাবেই গা ঘেসে বসে এবং লোকের পকেট উজাড় করে। জাপান স্বাধীন হয়েও পরাধীন চীনের এই কুঅভ্যাস গ্রহণ করার একমাত্র কারণ হল, এতে বেশ অর্থাগম হয়। এইটাকেই পূর্বদেশীয় বৈশিষ্ট্য বলে। যাতে ধনলাভ হয় তা যে দেশেরই দোষ বা গুণ হউক তা সবই গ্রাহ্য, আর যাতে ধনলাভ না হয় তার সবই পরিত্যজ্য। ইউরোপীয় প্রথায় যুবতীদের খাবার দোকানে নিযুক্ত করতে শিখেছে কিন্তু ইউরোপীয়ান প্রথামতে যুবতীদের দ্বারা খাবার পরিবেশন করাতে শেখে নি এইটাই হল মজা।

কাফে হতে বের হয়ে বড় রাস্তাটা পরিত্যাগ করে গ্রাম্য পথ ধরলাম। জাপানের গ্রাম্যপথ আর চীনের গ্রাম্যপথ একই ধরণের। পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত। ধান ক্ষেত হতে দুর্গন্ধ আসছিল। চীনে যেমন মানুষের মলমূত্র ধান ক্ষেতে সাররূপে দেওয়া হয় জাপানেও তাই। সেজন্যই এত দুর্গন্ধ। গ্রাম্য পথ দিয়ে চলার সময় এক খানা কুটির দেখতে পেলাম। কুটির খানা অবিকল আমাদের দেশের ঘরের মত। দুখানা চাল। চাল দুখানা বাঁকা করে দেওয়াতে ধনুর মত বেঁকে রয়েছে। ঘরের মেজেটাও আমাদের দেশের মতই মাটির এবং বেশ উঁচু। ঘরখানা দেখলেই মনে হয় বাংলা দেশের কোনও চাষার বাড়ীতে এসেছি।

ঘরের বারান্দায় বসে একটি ছেলেহাঁপাচ্ছিল। ছেলেটির বয়স দশ এগারর বেশি হবে না। মুখ দেখেই বুঝলাম তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। ছেলেটি আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল কিন্তু কিছু বলল না। ঘরের ভেতরও যে কেউ আছে তা বুঝতে পারলাম না। আমি তার দুঃখে দুঃখিত হলাম বটে কিন্তু ভাবতে

লাগলাম, এদেশের লোকইত মান্চুরিয়ার লোকের উপর অত্যাচার করছে। শিং হত্যা থেকে আরম্ভ করে যত অপকর্ম কিছুই বাদ দিচ্ছে না অথচ তাদের নিজে দেশে এরূপ অসহায় ছেলেমেয়েরা রোগে ভুগছে তা কি পরিতাপের বিষয় নয়! আমার ধারণা ছিল যারা অপরের দেশ শাসন করে এবং অপরের দেশ করার প্রবৃত্তি রাখে তাদের নিজের দেশে সবই আছে এবং রোগ শোক বলে কিছুই নেই। কিন্তু এই দৃশ্যটি দেখার পর আমার মনের পরিবর্তন হল। ইচ্ছা হল শুধু জাপানী গ্রাম এবং পর্ণকুটিরগুলিই ভাল করে দেখি। হয়ত বুঝতে পারব জাপনীরা কোন দুঃখে দুঃখী হয়ে অপরের সোনার সংসার ছারখারে দিচ্ছে।

আমি যখন এই ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে অন্য আর একটি বড়-গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন পথে এক জন জাপানী মিলিটারী অফিসারের সংগে দেখা হয়। তাঁকে আমিই নমস্কার করি। তিনি তাতে সুখী হন এবং আমার এক খানা ফটো নেন। ফটোতে তাঁরও মুখখানা যাতে উঠে সে লোভ তাঁর ছিল বলেই তিনি ক্যামেরাখানা ফিট করে আমার কাছে মিনিট খানেক দাঁড়াতেই ক্যামেরা হতে ক্লিক করে শব্দ হল। তিনিও আমাকে বিদায় দিয়ে নিজের পথ ধরলেন। তিনি বোধয় আমাকে ভুল করেছিলেন কারণ আমার আসার কয়েক দিন পূর্বেই একজন গুজরাতী মুসলমান কোবেতে আসেন এবং তিনিও পর্যটন আরম্ভ করেন। তাঁর বেশ পাবলিসিটি হয়েছিল। আমার পাবলিসিটি মোটেই হয়নি। মিলিটারী অফিসার বোধহয় আমাকে গুজরাতী পর্যটক ভেবেই একসংগে ফটো উঠিয়েছিলেন। গুজরাতী পর্যটকটি ভারতীয় স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বারা জাপানের সর্বত্র সম্বর্ধিত হয়েছিলেন এবং তিনি দরিদ্র জাপানীদের সংগে কখনও মিলামিশা করতেন না। জাপানী ব্যবসায়ীরাও তাই চাইত।

ফটো উঠানোর পর ওসাকার দিকে যখন আমি রওনা হলাম তখন বড়

গ্রামটি হতে একটি যুবক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাননীয় পর্যটক, আজকাল অনেক পর্যটকের আগমন জাপানে হচ্ছে, এতে কি জাপানের ক্ষতি হবেনা ?" আমি যুবককে বললাম ভারতীয় পর্যটকদ্বারা জাপানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, অন্য দেশের পর্যটকদের দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে কারণ তারা হল স্বাধীন দেশের লোক। নানা মতলব নিয়ে চলে। আমাদের যদিও বা কোনও মতলব থাকে তবে মতলব হবে আমাদের জন্মভূমিকে স্বাধীন করা। আমাদের জন্মভূমি স্বাধীন হলে যদি আপনাদের কোনও ক্ষতি হয় তবে আমাদের পর্যটনেও আপনাদের ক্ষতি।

জাপানী অথবা চীনাদের কাছে কথার কথায় বা কায়দা করে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করতে নেই। তাদের কাছে ধীরে কথা বলতে হয় এবং মনের ভাব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হয়। যুবক আমার কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সুখী হসে ওসাকা পর্যন্ত সাইকেলে আমার সংগে রওয়ানা হয়েছিলেন। যুবক কলেজের ছাত্র। জার্মাণ ভাষাও কিছু জানতেন এবং পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি আমাকে তাঁদের গ্রাম দেখবার পর তাঁদের গ্রাম সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। সর্বপ্রথমই আমি গ্রামের কুটির শ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করলাম এবং তৃতীয় শ্রেণীর ঘরের সংগে পূর্ব ভারতের গৃহপ্রণালীর সংগে যে সমতা রয়েছে তা বুঝার জন্য পথের পাশে বসেই চিত্র এঁকে বুঝাতে আরম্ভ করলাম। যুবক আমার কথা মনদিয়ে শুনল এবং বলল জাপানে মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়না। মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান ধর্মের গোঁড়ামী নাশ করে, জাতীয়তাবাদকে লোপ করে, মানুষ সত্যি যা চায় তাই বলে দেয়। আমি যুবকের কথায় সায় দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম সে কি করে মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতকথা জানতে সক্ষম হয়েছে ?

"সে বললে" ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সে মানচুরিয়াতে একটি

কমিউনিজম প্রচার করতে নিয়োজিত হয়েছিল। সেখানে সে বেশ ভাল করে মেণ্ডারিণ ভাষা শিক্ষা করে এবং মেণ্ডারিণ ভাষাতেই প্রপাগাণ্ডার কাজ চালায়। সে তখন বাধ্য হয়ে মনুষ্যতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আহরণ করতে বাধ্য হয়। যদিও সে এন্‌টি-কমিউনিজম মান্‌চুরিয়াতে প্রচার করেছিল তবুও তার মন যেন কমিউনিজিমের দিকে আপনি ধাবিত হচ্ছিল। যুবকের কথা শুনে নিজেকে সংযত করতে হল। আমি কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছি সেকথা গোপন করার জন্যই বল্‌লাম, মনুষ্যতত্ত্ববিজ্ঞান মানুষের জানা থাকলে অনেক রকম "ইজম" হতে রেহাই পাওয়া যায়।

আমি যখন জাপানী গৃহনির্মাণের সংগে ভারতীয় গৃহ নির্মাণের তুলনা দিচ্ছিলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করল, শহরে যে সকল জাপানী গৃহ দেখছেন সেই ঘরগুলিরও বোধহয় কোনও বিদেশী ঘরের সংগে সাদৃশ্য রয়েছে? নিশ্চয়ই মশাই, যে সকল উন্নত ধরণের একতলা ঘর শহরে অথবা গ্রামে দেখা যায় সেই ঘরগুলি হল পর্তুগীজ দস্যুদের ঘরের অনুকরণ। পর্তুগীজ দস্যুদের গৃহের মেজেটা ফাঁপা থাকে। সেখানে তারা অপরলোকের কাছ থেকে ডাকাতি করে যে সকল জিনিস আনত, তাই এনে লুকিয়ে রাখত। আপনাদের দেশে পর্তুগীজরা এসে লুঠতরাজ কিছুই করতে সাহস করেনি কিন্তু বিদেশ হতে লুট করে যেসকল ধনরত্ন আনত, তা লুকিয়ে রাখবার জন্য তাদের সেই পুরাতন ধরণের গৃহই নির্মাণ করেছিল। সেই গৃহনির্মাণ আপনারা সর্বপ্রথম দেখেছেন এবং সাধারণ ভাবে তাই গ্রহণও করেছেন। দেখবেন আপনাদের প্রত্যেকের ঘরের মেজে ফাঁপা এবং সেই ফাঁপা স্থানটাতে সকল রকমের মূল্যবান জিনিস রক্ষিত হয়।

যুবক এবং আমি উভয়ে মিলে ওসাকাতে পৌঁছলাম এবং যুবকের সাহায্যেই একটি ছোট্ট জাপানী হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। থাকা খাওয়া মাত্র এক ইয়েন। জাপানী যুবক আমাকে হোটেলে রেখেই বিদায় নিল। সে

াকবে অন্য হোটেলে। যুবক আমাকে বলেছিলো ওসাকা দেখা একদিনে বেনা। আমি কয়েক দিনই থাকতে রাজি হয়েছিলাম।

বাইরে সাইকেল এবং জুতা খুলে রেখে, যে রুমে আমাকে থাকতে হবে সেই মে প্রবেশ করলাম। হোটেলের একজন মেয়ে চাকর আমাকে এক খানা কমানো এনে দিল। আমি কিমানোটি প'রে মাণিব্যাগ কলম, পাসপোর্ট ইত্যাদি লে গায়ের সার্টটা একদিকে রেখে দিলাম, গেন্‌জিটাও খুলে ফেল্‌লাম। মোজা জাড়া কাছে রেখে দিয়ে গামছা নিয়ে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে চলে গেলাম। সখানে আচ্ছা করে হাত পা ধুয়ে রুমে এসে দেখলাম সবই আছে, নাই শুধু রণের কাপড়গুলি। বুঝলাম এসব ধোবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বর্সে যখন সিগারেট ফুঁকছিলাম তখন অন্য আর একটি স্ত্রীলোক খাবার নিয়ে ল। আমি জাপানী খাদ্যে কিছুটা অভ্যস্থ হয়েছিলাম সেজন্য অপেক্ষা না রেই চামুচের সাহায্যে খেয়ে নিলাম। আমি কি রকমে খাই তা দেখার জন্য কউ এলনা। এতে আমার সুবিধাই হল। প্রচুর পরিমাণে ভাত খেতে সক্ষম লাম। জাপানী ভাতে বেশ আঠা থাকে। জাপানীরা বলে যে ভাতে মাঠা কম সেই ভাত কম পুষ্টিকর। পাঠ্য পুস্তকে সেকথাটি লিখতেও চারা ভুলে না। আমাকে যা খেতে দেওয়া হয়েছিল তাও অখাদ্য নয়। দুটি ডম সিদ্ধ, মুলা সিদ্ধ, ঝোল যে কিসের তা ঠিক করতে পারছিলাম না তবে চাতে মূলা পাতার গন্ধ ছিল। আর ছিল গোটা দশেক সেলমন মাছ। আমি মামার মণিবেগে নুন লুকিয়ে রাখতাম। জাপানীরা মাছে নুন ব্যবহার করেনা, চারা গুড় ব্যবহার করে। আজ সুবিধা হল কেউ সামনে না থাকায় মণিবেগ থকে নুন বার করে মাছে দিয়ে দিলাম তাতেই এত মাছ এবং প্রচুর ভাত খেতে াক্ষম হয়েছিলাম।

থাওয়ার পর ঘুম। ঘুম থেকে উঠে দেখি ব্রিচেস্‌টা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ভাঁজ করে আমার কাছে রেখে দেওয়া হয়েছে। গেন্‌জি, কামিজ,

মোজা এবং রুমাল খানাকেও পরিষ্কার করে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে আমার কাছে রেখে দেওয়া হয়েছে। সবগুলি জিনিস পরিষ্কার দেখে মনটা নেচে উঠলো কোন ভাষায় ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পেলাম না। নীচে গিয়ে দেখি জুতা জোড়াকে পালিশ করে রাখা হয়েছে এবং সাইকেলটাকে এত পরিষ্কার করা হয়েছে যে যেন নূতন রূপ ধরেছে। এদের ব্যবহারে সুখী হয়ে কতক্ষণ বাইরে বসে থাকলাম, তারপর হোটেলের মালিক যেখানে বসে ভম্ ভম্ করছিলো সেখানে গেলাম। হোটেলের মালিক খাঁটি সিন্টো। তিনি অন্য কোন ধর্মের ধার ধারেন না। খাঁটি সিন্টোরা নিরামিষ ভোজী। যে সকল জাপানী নিরামিষ খায় তারা দেশদ্রোহী বলে গণ্য হয় সেজন্য বৃদ্ধ নূতন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি শাকসব্জী খেয়ে ভাল থাকেন বলতেন এবং সেজন্য তাঁকে শাক সব্জীই দেওয়া হত আমাদের দেশের মত উৎকট নাকসিঁটকোনো নিরামিষভোজীদের মত তিনি ছিলেন না। জাপানে ছুৎমার্গ কখনও ছিলনা এবং ছুৎমার্গের প্রচলন নরদেহধারী পশুদের মধ্যেই প্রবর্তিত হতে সক্ষম হয়েছে যাদের একটু মনুষ্যত্ব আছে তারা কখনও এমন বর্বরতা করবে না।

বৃদ্ধের ঘরে বসে যখন কথা বলছিলাম তখন ইয়ামেতো অর্থাৎ পূর্বপরিচিত যুবক এসে উপস্থিত হলেন। আমি কোনও লোকের নাম লিখতে সাহস করিনা, কারণ নামটা সত্য না মিথ্যা বল্ল কে জানে কিন্তু এই যুবককে দেখেই বৃদ্ধ ইয়ামেতো বলায় এই যুবকের নাম এখানে বলে ফেললাম। ইয়ামেতো এসেই আমাকে বৃদ্ধের সংগে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—চলুন, এখন আমরা কতকগুলি স্থানে যাব যেসব স্থানে গেলে হয়ত আপনার কিছু অর্থব্যয় হতে পারে কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। আমি যুবকের কথায় রাজী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যুবক আমাকে সর্বপ্রথম একটি বিয়ারের দোকানে নিয়ে যান।

বিয়ারের দোকানটি এক তলা একটি ছোট্ট ঘর। ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েক জন যুবক সেখানে বসে বিয়ার খাচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকের নাক মুখ

লাল হয়ে উঠেছিল এবং অনেকটা নেশাও হয়েছিল। তাদের এরূপ অবস্থা দেখে আমার ঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু যুবক আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন। পাশে বসা যুবকগণ যদিও নেশাসক্ত তবুও তারা বেশি কথা বলছিল না এবং যে দু'একটা কথা বলছিল তাও গুণতে পারা যায়। আমাদের দেশের লোকের মত একটু খেয়েই মাতলামী করতে আরম্ভ করেনি।

ইয়ামাতো আমাদের প্রত্যেককে এক বোতল করে আশাই বিয়ার দিতে বললেন। একটি যুবতী আশাই বিয়ার নিয়ে এল এবং পূর্ণ গ্লাস দুটি আমাদের সামনে রেখেই ভূমিতে পড়ে প্রণতি জানাল। আমার কিন্তু ওসব মোটেই ভাল লাগলনা। আমি যুবকের লক্ষ্য সেদিকে আকর্ষণ করলাম এবং বল্লাম—এটা কি ভাল দেখায়? আমরা পরাধীন আমাদের দেশে না হয় এসব শোভা পেতে পারে কিন্তু আপনাদের দেশ স্বাধীন এবং অনেক উন্নতি করেছে, আপনাদের এসব শোভা পায়না। নারীকে এমন ভাবে অপদস্ত করা কোন মতেই উচিত নয়। যুবক দাঁত কামড়ে বল্ল, দেখুন টাকার জন্য আমরা মেয়েলোকদের কত নীচে নামিয়ে এনেছি, আমরা মানচুরিয়া দখল করেছি, চীন হয়ত দখল করব অথচ আমাদের নয়, এ দোষ পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে আর থাকবেও যতদিন ধনের দৌলত থাকবে।

আমাদের এসম্বন্ধে আর কোন কথা হলনা। আমাদের বিয়ার খাওয়া হয়ে গেলে আমরা দোকান থেকে বের হয়ে এলাম এবং মস্তবড় একটি জাপানী লজিং হাউসে করে প্রবেশ করলাম। এখানেও সেই একই ব্যবহার। তিনজন জাপানী স্ত্রীলোক এসে মাথা নত করে আমাদের নমস্কার জানাল। আমরা বসার পর আমাদের চা খেতে দিল। মিষ্টি মুখে কথা বলল তারপর যখন তারা চলে গেল তখন আমরাও চলে এলাম। পথে বেরিয়ে এসে মিষ্টার ইয়ামাতো বললেন এটাই হল আমাদের সভ্যতা, এই সভ্যতার বাহাদুরীই আমরা

সারা দুনিয়াময় প্রচার করি। আপনার দুঃখ করে লাভ নেই, দুঃখ পাওয়া উচিত, আমাদের।

এখান থেকে আমরা গ্রীণ হাউসের দিকে রওয়ানা হলাম। গ্রীণ হাউসের অপর নাম বারবনিতালয়। পাঠক বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন বারবণিতালয়ের কথা শুনে। মনে রাখবেন এটা ভ্রমণ কাহিনী। যতটুকু সম্ভব ততকুটুই লিখব।

গ্রীণ হাউসগুলির সামনে নীল রংগের ছোট্ট একটি বালভ জ্বলছে। দলে দলে লোক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই বাতির নীচে কি দেখছিল। আমরাও সেখানে গেলাম। দেখলাম অনেকগুলি যুবতীর ছবি লটকানো রয়েছে। আমরা এই পর্যন্ত দেখেই চলে আসলাম তারপর আবার সেই বিয়ারের দোকানে। বার বার একই বিয়ারের দোকানে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? আর যে যাবার স্থান ছিলনা, সেজন্যই বার বার সেখানে যেতে হচ্ছিল। এই বিয়ারের দোকানেই নিরাপদে কথা বলতে পারা যেত।

স্বাধীনতা অমূল্য রত্ন কিন্তু সেই অমূল্য রত্নকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে মুখ বন্ধ রাখতে হয়। অনেক সময় মুখ খুলার জন্য শাস্তিও পেতে হয়। স্বাধীনতারও রকম আছে। সকল স্বাধীনতা এক নয়। তাকে পরিবর্তন করতে গেলেই একদলের লোক বাধা দেয় আর এক দলের লোক এগিয়ে আসে। এই আগু পাছুতে প্রাণও দিতে হয়। জাপানে সেই আগুপাছু হবার প্রেরণা এসেছিল কিন্তু সাড়া পড়ছিল না, তখন শুধু গোপনেই পরামর্শ চলছিল। এই ছোট্ট বিয়ারের দোকান তার মধ্যে একটি।

ইয়ামাতো আমাকে বললেন, যে সকল জাপানী অতিশয় গরীব, তারাই তাদের মেয়েদের গ্রীণ হাউসে কয়েক বৎসরের জন্য বেচে দেয়। যে যুবতী খুবই সুন্দর তাকে বৎসরে তিন হাজার ইয়েন পর্যন্ত বিক্রি করা হয়। কোন যুবতীই তিন বৎসরের বেশী বিক্রি হয় না। আইন মতে তিন বৎসরের বেশী

বিক্রি করতে পারা যায় না। জাপানীরা দেশের আইন মান্য করে চলে কেউ তাদের মেয়েদের তিন বৎসরের বেশি সময়ের জন্য বিক্রি করেওনা।

যুবতীদের যখন তিন বৎসর কন্‌ট্রাক্ট ফুরিয়ে যায় তখন তারা নিজ নিজ পিত্রালয়ে গিয়ে নিজের লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে। যখন তারা স্বাস্থ্য ফিরিয়ে পায় তখন পিতাই সংবাদ পত্রে এইবলে বিজ্ঞাপন দেয় যে "আমার কন্যা আমাকে সুখী করবার জন্য তিন বৎসর বারবনিতালয়ে কাটিয়ে এসেছে। তার শরীরে কোনরূপ রোগ নেই। যদি কোনও যুবক এই পিতৃভক্ত কন্যাকে বিয়ে করতে চান তবে সত্বর আসুন, বিলম্বে হতাশ হবেন।" এরূপ যুবতীকে বিয়ে করার জন্য অনেক দরখাস্ত আসে এবং সাতদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। জাপানী যুবকের ধারণা, যে যুবতী তার পিতাকে সুখী করার জন্য এতটুকু কষ্ট করতে পারে সে তার স্বামীর জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করতে সক্ষম হবে।

এতগুলি সংবাদ দিয়ে যুবক আমাকে লজিং হাউসে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ এই পর্যন্ত। কাল সকাল বেলা দেখা হবে না; ঠিক দুপুর বেলা এসে কয়েকটি ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যাব। মনে রাখবেন, জাপানের ফ্যাক্টরীতে সকলকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। আপনার জন্য আমি সমুদয় সকাল বেলাটা খাটব তারপর যদি পাস পাই তবে আপনার বাসনা পূর্ণ হবে। ইতিমধ্যে যদি পারেন ত ওসাকা পেলেসটি দেখে আসবেন। দেখার মত জিনিস, দেখা আপনার কর্তব্য। জাপানী স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য কিছু যদি দেখতে চান তবে সেখানেই দেখতে পাবেন।

পরের দিন সকাল বেলাই ওসাকা পেলেস্ দেখার জন্য রওয়ানা হলাম। পথে একজন পুলিশের সংগে দেখা হল। পুলিশ লোকটি বেশ ভদ্র। আমাকে পেলেসের সামনে রেখে দিয়েই বিদায় নিল। আমি পেলেসের দিকে অগ্রসর হলাম। পেলেসের চারিদিকে নানা জাতীয় পাইন বৃক্ষ। বৃক্ষরাজি পার হয়ে

একটি পরিখা। পরিখাতে পরিষ্কার জলে নানা জাতীয় মাছ। মাছগুলি অবিকল চীনা ধরণের। তারপরই সম্রাটের প্রাসাদ। প্রাসাদে লোক জন নাই, বোধহয় কোনও সময়ে কোনও সামন্ত রাজা বাস করতেন, এখন খাস সম্রাটের। প্রাসাদটি বহু পুরাতন। তাতে কাঠের কারুকার্য এত বেশি মনে হল হাজার হজার লোকের একটি মাত্র কাঠের স্তম্ভ তৈরী করতে কয়েকমাস সময় লেগেছে। প্রাসাদের কোথায় কি আছে তা বলে দেবার মত লোক ছিল না। নিজের ইচ্ছা মতই বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। প্রাসাদের প্রায় স্থানেই কাগজের, কাপড়ের এবং সিল্কের মাছ লটকান ছিল। মাছগুলি সবই আমাদের কাতলা মাছের আকৃতি। লটকানো মৎস্যগুলি দেখলে অনেক সময় সজীব মৎস্য বলেই ভুল হয়। সন্নিবিষ্ট চিত্তে অনেকক্ষণ মৎস্যই দেখলাম। আমার মত অনেক জাপানীও পেলেস্ দেখার জন্য এসেছিল। তাদেরই এক জন বল্ল নাগয়াতে আর একটি পেলেস্ আছে। সেই প্রাসাদের উপরে প্রমাণ আকৃতির দুটি সোনার মৎস্য যুগ যুগান্ত হতে আছে। অনেকেই বলতে পারেনা এই দুটি মৎস্য তৈরী করতে কত সোনা লেগেছে।

আমাদের দেশে যেমন রায়বাহাদুর জাতীয় খেতাব যাদের আছে তাদের আমরা সরকারী লোক বলেই গণ্য করি, জাপানেও যারা রাজপ্রাসাদ ধর্মস্থান ইত্যাদি দেখাতে সময় ক্ষেপণ করে তাদের জাপানী সরকার ভাল লোক বলেই গণ্য করেন। আমিও সেই হিসাবে ভাল লোকের পর্যায়ে এসেছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলছি, রাজতন্ত্র অথবা সম্রাটতন্ত্র এসব যে বর্বর তন্ত্রেরই একটি অংশ তা আমি ভাল করেই জানতাম। এসব জেনে শুনেও আমার ধর্মমন্দির এবং রাজপ্রাসাদ দেখতে যাবার একমাত্র কারণ হল আমি পুরাতনকে জানতে চাইতাম মাত্র, পুরাতনের উপরই নূতন ভিত্তি গড়ে ওঠে।

ওসাকার সম্রাট প্রাসাদ দেখায় সময় আগ্রার তাজমহলের কথা মনে হয়েছিল। আমি যখন সাজাহানের কবর দেখেছিলাম তখন একটি লোক কবরের

পর দুটি পয়সা রেখে হাত জোড় করে নমস্কার করছিল। এখানে কিন্তু রূপ ভাবে কেউ কোনও কবরের উপর পয়সা রেখে নমস্কার করেনি। কিন্তু খানে যদিও সেরূপ ঘটনা ঘটছিল না তবুও এমন কিছু ঘটছিল যা আমদের শের অজ্ঞ রাজভক্তির চেয়েও ভয়াবহ ছিল। এখানে প্রত্যেকেই রাজপ্রাসাদটিকে জের চেয়ে বড় ভাবছিল এবং রাজপ্রাসাদের সম্মান রক্ষার্থে জীবন পর্যন্ত দিতে স্তুত ছিল। সেই জীবন দেবার প্রবৃত্তি মনে বলবৎ রেখে যারা রাজপ্রাসাদ খেছিল, তাদের মুখে একটা প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল। আমি সেই মুখগুলিই য়ে দেখছিলাম। অনেকে হয়ত জিজ্ঞসা করবেন, এমন চিন্তা কি করে আপনার নে জাগল? চীন সম্রাট হেন্‌রী পুইকে রিপাবলিকান চীনারা কি ভাবে ঘৃণা রত তা দেখে এসেছি, তাই বুঝতে চেষ্টা করছিলাম চীনারা যখন তাদের দেশের ম্রাটের বাড়ি দেখত তখন তাদের মুখে কি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল আর এখানে ক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। চীনারা রাজতন্ত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখত বং রাজার স্মৃতিকে পর্যন্ত ধ্বংস করতে চাইত, আর এরা রাজার স্মৃতিকে বিন দিয়ে রক্ষা করতে চাইছে। ধ্বংস আর রক্ষা কি একই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে লে? আমি নিকৃষ্ট আর সম্রাট উৎকৃষ্ট এই ভাবটি যখনই জাতের ভেতর বেশ করে তখনই জাত হয় নিজে ধ্বংস হয় নতুবা অপরকে ধ্বংস করে।

পেলেস্ আমার দেখা হল। হোটেলে ফিরে এলাম। অনেকক্ষণ বিশ্রাম রলাম আর ভাবতে লাগলাম রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কথা। রাজা হয়ে াজ্য ত্যাগ কমকথা নয়। রাজা হয়ে দেশের মংগলের জন্য ফকির হওয়া কি কম কথা? আমরা দু আনা পয়সা মায়া ত্যাগ করতে পারিনা ার জাপানের সামুরাইগন জাপানের মংগলের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পরেছে তা কি কম কথা! অনেকক্ষণ ত্যাগের কথাই ভাবলাম, তারপর াবলাম আমার কি দেশের মংগলের উদ্দেশে কিছুই দেবার নেই? অনেক জে দেখলাম দেবার মত কিছুই নেই। সাহস, শক্তি, ধৈর্য এর একটাও

নেই যা দিয়ে দেশ সেবা করতে পারি। নিজকে নিঃস্ব ভেবে বড়ই দুঃখিত হলাম।

প্রায় দেড়টার সময় যখন ইয়ামাতো আমার কাছে এলেন তখন তাকে আমার মনের কথা বলাতে থ মেরে গেলেন। কতক্ষণ পরে বললেন, আপনিও দেখছি আমাদের মতই ভাবপ্রবণ। আমাদের দেশের অনেক যুবক যুবতী সমাজের কিছুই করতে পারলেন না ভেবে দুঃখিত হয়। পরে যখন দুঃখের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন তারা আর সহ্য করতে পারেনা, তারা তখন নিরুপায় হয়ে মাউণ্ট ফুজিয়ামার দিকে যায় এবং ফুজিয়ামাতে যে সকল আগ্নেয় সুড়ং রয়েছে তাতে হাত ধরাধরি করে গহ্বরে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু কথা হল, শুনেছি বন্ধু নাকি চীন এবং কোরিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন; আমার ধারণা ছিল আপনি বাস্তববাদী হয়েছেন। চীনে যদি একজন প্রগ্রেসিভ চীনকে দেখে থাকেন তবে আপনার মুখ থেকে এসব কথা বের হত না। এ পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট সারি বেঁধে দাড়িয়ে আছে। যদি আপনি তার একটাকেও হত্যা করে মারতে পারেন তবেই আপনার জীবনের অনেক কাজ হবে। চলুন এখন দেখবেন ত ঐ কারখানা গুলি, যেখানে জাপানী হয়ে জাপানীরা নিজের ভাই বোনদের রক্ত মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে।

ইয়ামাতোর কথায় প্রাণে সাড়া এল। উঠে বসলাম। চল্লাম কারখানার দিকে। কারখানা মাইল খানেক দূর। সাইকেলটা যেন ফন্ ফন্ করে আপনা হাতেই কারখানার দিকে চল্ল। ইয়ামাতো বললেন এখন ভুলে যান আপনি একজন ইণ্ডিয়ান্, ভাবুন আপনি একজন জাপানী। একজন জাপানী হয়ে জাপানীদের কি কি উন্নতি দরকার তাই একবার ভাবুন নতুবা জাপান সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করতে পারবেন না। রাজ প্রাসাদে আপনাকে পাঠিয়ে অন্যায় করেছি।

কোনও বড় কারখানায় প্রবেশ করার অনুমতি পাইনি। এখানে ডানলপ

কোম্পানী পরিচালিত একটি কারখানা আছে। কারখানার সকলেই পুরুষ মজুর। অতএব দেখার মত কিছুই ছিলনা। ডানলপের কারখানায় মজুর ইউনিয়ন ছিল এবং সেখানকার মজুর দুএকবার বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন নিবেদন করে যখন কোনও ফল পায়নি তখন ধর্মঘটও করেছিল। এখানে আমেরিকানদের পরিচালিত আর একটি কারখানাতে তখন জোরসে ধর্মঘট চলছিল। ইয়ামাতো এই দুটি কারখানা আমাকে দেখিয়ে অনুমতি পত্র নিয়ে একটি জাপানী কাপড়ের কলে গিয়ে প্রবেশ করেন। কারখানাটি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল কারণ তখন-ও আমি কোনও বৃহৎ কাপড় তৈরীর মেশিন দেখিনি।

মেশিনটা যেন একটা দৈত্য। সে যেন হাঁ করে আছে মানুষ খাবার জন্য। যারা সেখানে কাজ করছে তাদের পেছনে একজনও সুপারভাইজার ছিলনা। কলের মেশিনগুলিই সুভারভাইজারী করছিল। এক একটি স্ত্রীলোক তৎপরতার সহিত তিনটি টাকোতে কাজ করছিল। এমন কষ্টকর কাজ আমি দেখেছি বলে মনে হয় না। প্রত্যেকটী স্ত্রীলোকের নাকে একটা করে নাককজ ছিল। এটা লাগবার প্রধান কারণ হল, নাকে মুখে তুলা যেন প্রবেশ না করতে পারে। মনে হল, এরূপ কিছু যদি আমার নাকে মুখে লাগিয়ে রাখি তবে নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠব। ইয়ামাতো বলছিল এটা অভ্যাস হয়ে গেলে আর কষ্ট হয় না।

একটা কলে টিফিনের সময় উপস্থিত ছিলাম। টিফিনে এরা বেশ ভাল খাদ্যই খায়। কিন্তু যুবকগুলিকে যুবতীদের গাঘেঁসে বসতে দেখে বড়ই রাগ হচ্ছিল। এরূপ করে গাঘেসে বসাটা আমেরিকান্‌দের কাছ থেকে এরা শিখেছে। পূর্বে নাকি এরূপ কুপ্রথা ছিলনা।

প্রত্যেকটি যুবতী যেন এক একটি পদ্মফুল। এত যে পরিশ্রম করছে তাতে এদের শরীর মোটেই ভাংছে না। কতলোক তাদের গাঘেঁসে বসছে সেদিকে তারা লক্ষ্যও করছে না, তারা খেয়ে যাচ্ছে আপন মনে। এদের খাওয়া হয়ে

লে আবার তারা আপন আপন কাজে চলে গেল। আমাদের দেশে অনেক চুর স্ত্রীলোক দেখেছি। এদের দেখলেই মনে হয় এরা অভুক্ত কিন্তু জাপানী চুর স্ত্রীলোকদের দেখলে সেরূপ কিছুই মনে হয় না। টিফিনের সময় অনেকে ামাকে খাদ্য দিতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। আমার মনে চ্ছিল যে খাদ্য এরা নিজেদের জন্য নিয়ে এসেছে তা তাদের পক্ষেই প্রচুর নয়। র মাঝে যদি আমি ভাগ বসাই তবে তাদের নিশ্চয়ই কম হবে। তারা ভদ্রতা রেই আমাকে খাদ্য দিতে চেয়েছিল, তারা যাতে আমার প্রতি রাগ না করে জন্য আমি খেয়ে এসেছি সেকথাটা বার বার বলতে হয়েছিল। ইয়ামাতোকে জ্ঞাসা করলাম কাজের শেষে এরা কি মজুর গৃহে যায় না তাদের নিজের মা বাবার র যায়। ইয়ামাতো বললেন মজুরগৃহ বলে অবিবাহিতদের জন্য কিছুই নেই। রা বিবাহিত তারাই মজুরগৃহে থাকতে পারে। কোনও মজুরগৃহ দেখবার জন্য ামি ওসাকাতে যাইনি। মজুরদের মুখ দেখেই আমি সুখী হয়েছিলাম।

কারখানাগুলি দেখে আসার পর ইয়ামাতো আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ালোক মজুরদের দেখে আপনার কি ধারণা হল?

ইয়ামাতো যেন আমার মুখ থেকে একটা মস্তবড় কথা আদায় করতে চাইছেন। ামি তাঁর কথায় সোজা জবাব না দিয়ে বললাম, পূর্বদেশগুলিতে যেখানে যত জুর দেখেছি আপনাদের মজুরের স্বাস্থ্য সব চেয়ে ভাল।

সত্যিই কি তাই?

হাঁ মহাশয় সত্যিই তাই। মাইনের দিক দিয়েও খারাপ নয়। দৈনিক ই ইয়েণ কি কম কথা? (যুদ্ধের পূর্বে জাপানে দুই ইয়েণ দিয়ে যা কিনতে ারা যেত এখন বোধ হয় পাঁচশত ইয়েণ দিয়েও তা কিনতে পারা যাবে না। দ্ধের ফলে জাপানের কি দুর্দশা হয়েছে তা এই সামান্য বিষয় থেকেই বুঝতে ারা যাবে।) ইয়ামাতোকে আরও বললাম—মালয়, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, ন্দোচীন এবং কোরিয়াতে কোথাও আট ঘণ্টা খেটে দুই ইয়েণ সাধারণ

মজুর পায় না। চীন আর ভারতবর্ষের মজুররা দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ করে যা পায় জাপানী মজুর তার চারগুণ পায়।

আমার কথা শুনে ইয়ামাতো চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কবে এখান থেকে রওয়ানা হবেন ?

আপনি যখনই বিদায় দেবেন।

আপনাদের দেশের রাজা এখানে আছেন, সে কথা জানেন কি ?

আমি জানতে চাই না।

কেন ?

আমি রাজতন্ত্রী নই। আমি রাজদর্শনকে অপমান মনে করি।

আপনি কি কমিউনিষ্ট ?

কমিউনিষ্ট হওয়াটা তত সোজা কাজ নয়।

কেন ?

জানতে হয়, শুনতে হয়, সর্বসাধারণের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। আমাকে বিলিয়ে দেবার মত ক্ষমতা হয়নি অতএব আমি কমিউনিষ্ট নই। উপরন্তু আমাদের দেশ পরাধীন। দেশ আগে স্বাধীন হউক তারপর পূর্বপশ্চিম ঠিক হবে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে। সেই প্রবাদটি হল ঘর তৈরী করার পূর্বে দরজার কথা চিন্তা করতে নেই।

ইয়ামাতো আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হলেন বটে কিন্তু আমি তাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ভাল মনে করলাম না কারণ যে ভাবে ইয়ামাতো কথা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল তিনি একজন এস্‌কাইত। এস্‌কাইতরাই এটি কমিউনিজম যেমন প্রচার করতে পারে তেমনি একটা লোককে উসকিয়ে দিয়ে ধরিয়েও দিতে পারে। সে সংবাদ আমার জানা ছিল।

জাপানীরা সিনেমা জগতে পৃথিবীর লোকের সংগে সংযোগ রেখে চলাটা মোটেই পছন্দ করেনি। তারা পৃথিবীর সিনেমা জগতের নিয়ম কানুন পরিত্যাগ

করে নিজের নিয়ম কানুন স্থাপন করেছে। সিনেমা জগতে নূতন এবং পুরাতন সকল রকমের চিত্রই দেখান হয়। জাপানীরা সেই নিয়ম মান্তে রাজী নয়, তারা সিনেমাতে পুরাতন চিত্রই দেখানো পছন্দ করে। নূতন ধরণের সামাজিক চিত্র সিনেমাতে দেখানো হয় না। দু'হাজার বৎসর পূর্বে লোকে কি ভাবে থাকত, তখন তারা জাপানের কি কি উন্নতি করেছিল তাই দেখিয়েই জাপানী সিনেমা কোম্পানীগুলি সুখী থাকতে বাধ্য হয়। অনেক বৎসর কোনও এক বিষয়ে বাধ্যবাধকতার ভেতর থাকলে অভ্যাসে পরিণত হয় সেজন্য সামাজিক চিত্র কিভাবে তৈরী করতে হয় সে কথা জাপানী সিনেমা উৎপাদনকারীরা চিন্তা করতেও পারেনা।

মিষ্টার ইয়ামাতো আমাকে একটি সিনেমা গৃহে নিয়ে গিয়ে সেকথাই বুঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বার বার বলতে লাগলেন এতে জাপানের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে তবুও কর্তৃপক্ষ সামাজিক চিত্র তৈরী করতে দিতে রাজী নন্ এটাকি ভালকথা ?

এ আবার আর এক নূতন বিপদ। ইয়ামাতোকে কলকারখানার বিষয় ভুলাবার জন্য আমিই অপেরার কথা উঠিয়েছিলাম। যখনই কোন লোক বিপদ সংকুল রাষ্ট্রনৈতিক তর্ক হতে রেহাই পেতে চায় তখন সে অপেরা, সাহিত্য চর্চা, ধর্মচর্চা, অথবা দর্শনের কথা উত্থাপন করে, আমিও তাই মনে করে অপেরার কথাই উঠিয়েছিলাম, এখন দেখতে পেলাম তাতেও বিপদ লুকিয়ে আছে। এত ভয় করলেও আবার চলেনা। সেজন্য এ বিষয়টাকে নিয়েই কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

আমি বল্লাম যদি জাপানী কর্তৃপক্ষ মনে করেন সামাজিক চিত্র সিনেমায় আনা ভাল হবেনা তবে তার পেছনে নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে এবং সে কারণটি আপনার নিশ্চয়ই জানা থাকা দরকার। আমার মন্তব্য করা এখানে সম্ভবপর নয়। আমি হালে জাপানে এসেছি, আমি এখনও জাপান সম্বন্ধে কিছুই জানতে সক্ষম হইনি। আপনিই বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

ইয়ামাতো বললেন, আমাদের দেশের যুবক যুবতীরা পুরাতন পোষাক পরে সিনেমাতে নামতে ভালবাসেনা, সেজন্য দেখবেন প্রৌঢ়বয়স্ক এবং শিশুরাই জাপানী সিনেমাতে অভিনয় করে। দ্বিতীয় কারণ হল যারা জাপানের কর্তা তারা চায়না সামাজিক চিত্র জাপানে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠুক। তারা বুঝতে পেরেছে যদি সিনেমাতে একবার সামাজিক চিত্র দেখানো হয় তবে ভবিষ্যৎ তাদের অন্ধকার। সেই জন্যই অপেরা কোম্পানী গুলিকে সামাজিক চিত্র দেখাবার ভার দিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটি অপেরার বই সর্বপ্রথম কর্তৃপক্ষকে দেখতে হয় তার পর অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের শিক্ষা দিতে হয়। এতেই বুঝতে পারছেন আমাদের দেশের রংগমঞ্চ কত কঠিন ভাবে শাসিত হয়। একে যদি স্বাধীনতা বলা হয় তবে দুঃখের বিষয় আর কিছুই থাকবেনা।

ইয়ামাতোর কথায় আমি কোনও মন্তব্য না করে তার হাত হতে রেহাই পাবার জন্য ওসাকা হতে নাগয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম এবং তাঁকে জানালাম যদি এখানে কিছু দেখার থাকে ত আমাকে দেখাবেন, আমি সত্বরই স্থানত্যাগ করব।

ইয়ামাতো আমাকে যা বলেছিলেন তা অতি সত্যকথা। জাপানীরা সামাজিক চিত্র সিনেমাতে দেখাতে রাজী নয়। তা বলে সকল জাপানী সমান নয়, তাদের মধ্যেও বিদ্রোহী আছে। আমেরিকায় যাবার পর জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত একখানি জাপানী সমাজ চিত্র দেখে সুখী হয়েছিলাম। নিউইয়র্কের ফরটি সেকেণ্ড ষ্টিটে সে চিত্র দেখানো হচ্ছিল। যিনি এই ছবির ডাইরেক্টর ছিলেন তাঁর জীবন কথা এবং কি ভাবে এই চিত্র জন্ম নিয়েছিল তাও ছবিতে বলা হয়েছিল।

জাপানী সিনেমা জগতে বিদ্রোহ বহুপূর্বেই আসত, কিন্তু জাপানী ব্লাক ড্রাগন এবং উগ্রজাতীয়তাবাদীরা তাতে বাধা দেয়। উগ্রজাতীয়তাবাদীরা এমনি শক্তহাতে সিনেমা একটর এবং একট্রেসদের শাসন করতে আরম্ভ করছিল

যে পুরুষগুলির চুল মুণ্ডন করেছিল, আর যুবতী এবং বৃদ্ধদের মাথার তালুর উপরে
চুল ক্ষুর দিয়ে চেঁচে ফেলেছিল। আবার কতগুলি সিনেমা একটর এবং এ
ট্রেসকে হত্যা করাও হয়েছিল।

বিদ্রোহী জাপানীদের আড্ডা পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে
বিদ্রোহী জাপানীরা সকল সময়েই চীনা বিদ্রোহীদের দলে মিশে কাজ করে এ
সর্বজন বিদিত। তারা কখনও কোরিয়ান্ কখনও ককোনরী মোংগল পোষাকে
থাকে। এরা কখনও জাপানী ব্ল্যাকড্রাগন অথবা উগ্রজাতীয়তাবাদীদের সমর্থ
করেনা এবং সকল সময়ই এই দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিদ্রোহীরা দুটি দলে বিভক্ত। এক দল হল রিপাবলিকান, আর অন্যদ
হল রিফরমিষ্ট। রিপাবলিকান্‌রা রাজতন্ত্র উড়িয়ে দিতে চায় আর রিফরমিষ্ট
রাজতন্ত্র বজায় রেখে দেশের উন্নতি করতে চায়। রিপবলিকান্‌দের মধ্যে খাঁ
জাপানীর সংখ্যা খুবই কম। তাদের পিতা বিদেশাগত এবং মাতা জাপানী
এরা বিদেশী ভাষা শিখতে মোটেও রাজি হয় না কিন্তু যারা রিফরমিষ্ট তারা বিদেশ
তারা বিদেশী ভাষা শিখতে না পারলে রিফরমিষ্ট দলের সভ্যও হতে পারেনা
রিফরমিষ্টরা বিদেশী বিদ্রোহীদের সাহায্য কমই পায় কিন্তু যারা রিপাবলিক
তাদের বিদেশী বিদ্রোহীরা লুফে নেয়। বিদ্রোহী দলেরই সহায়তায় আমেরিকা
দুখানা বিশিষ্ট ফিল্ম তৈরী হয়েছে। এই দুখানা ফিল্ম যদিও জাপানীদের মোটে
ভাল লাগেনা এমন কি জাপানে দেখানোও হয় না। কিন্তু এই ফিল্মে যা দেখা
হয়েছে নিচে তার চুম্বক দিলাম।

দুটি জাপানী যুবতীর জন্ম কালিফর্নিয়াতে হয়। কালিফরনিয়াতে জাপা
সংখ্যা বেশি। এই দুটি যুবতী কোনও কারণ বশতঃ কালিফরনিয়া পরিত্যা
করতে বাধ্য হয় এবং নিউইয়র্কের নিকটবর্তী কোনও শহরে বসবাস করতে থাকে
যুবতীদ্বয় ছোট বেলা হতেই আমেরিকান্ আচার ব্যবহার অভ্যাস করে
থাকে।

এক দিন কথা প্রসংগে প্রথম যুবতী দ্বিতীয় যুবতীকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা বলত আমাদের কেন আমেরিকান্‌রা ঘৃণা করে ?

দ্বিতীয় যুবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করে জবায় দেয়, আমরা যে জাপানী, পূর্বদেশবাসী।

এসব হল নেহাৎ বাজে কথা, পূর্ব আর পশ্চিম মানে কি রে ? বিশুদ্ধ ভূগোল মতে পূর্ব পশ্চিম বলতে কিছুই নেই, এই সেদিনও ত প্রফেসার বুঝিয়ে দিলেন, তারপরও পূর্ব পশ্চিম ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

হাঁ, অনেকটা তাই। প্রফেসর প্রফেসরী করে। সে আমেরিকান্‌। আমেরিকান্‌দের কাছে সে বিশ্বপ্রেমিক হতে চায়, কিন্তু জেনে রাখিস আমি যা বল্‌ছি তাই হল বাস্তব। তুই না দেশে যাবি ?

হাঁ, আমি দেশে যাব স্থির করেছি, সেদিনও দাদার চিঠি পেয়েছি, বাবাও পত্র দিয়েছেন। বাবা লিখেছেন দেশে না গেলে জাপানী ভাষা শিখতেই পারবনা। জাপানী ভাষা শিখে আমার কি লাভ বলত ? বাবা আমেরিকান সিটিজেনশিপ হারিয়েছেন, বড় ভাই, ইংলিশ ও জানেন না। এদের এদেশে এসে কাচ্চা বাচ্চা তৈরী করার কোন মানেই হয় না।

প্রথম যুবতী হেসে বললে, তুই হলি কবি, ইরান দেশের কবি, হাওয়াতে তোর জন্ম আর হাওয়াতে তোর লয়। উপরন্তু তুই মার্কসিজম পড়েছিস' তোর জন্য দেশ আর জাত বলতে কি আছে ? যেখানে মজুরী পাবি, সেখানেই চলে যাবি, খাওয়া থাকার সংগে তোর সম্বন্ধ।

তা নয় ত আর কি হতে পারে ? শুধু জাত আর জাত। জাত বলতে ত তিনটা জাতই আছে মাত্র, ধনী, মজুর আর চাষা। ধনী জাতটা হল আগাছা, এদের উপ্‌ড়িয়ে ফেলতে হবে। তুই যাকে রাজা বলে শ্রদ্ধা করিস সে ধনী ছাড়া আর কি হতে পারে ? তুই নিতান্ত অবুঝ, এই বলেই প্রথম যুবতী একখানা বই নিয়ে তাতে মন দিল।

দ্বিতীয় যুবতী বল্‌লে এ দুনিয়ায় তোর মত সবাই হল বুদ্ধিমান আর সবাই বোকা কেমন নয় কি ?

হাঁ হাঁ। এই দেখ, মহম্মদের আছে বিশ কোটী চেলা, বুদ্ধের আছে নব্বই কোটী চেলা আর যিশুর ছত্রিশ কোটী চেলা। লোক মাত্র তিনটী আর চেলা তোরা সবাই। একবার চিন্তা করে দেখছিস এই তিনটা লোক তোদের মাথার মাঝে কি করে অনবরত ভো ভো করছে আর তোরা সেই ভো ভো শব্দের তালে তালে চলছিস। আমরা সেরূপ নই, প্রত্যেকটা জিনিস বাজিয়ে নেই সেজন্য তোদের এই তিন প্রভু আমাদের আনাচেও আসতে পারেনা। থাকগে এসব কথা, তুই তা হলি ব্ল্যাক ড্রাগণের মেম্বর আর আমি হলাম মার্কসিষ্ট। মার্কসিষ্টও আমাকে ঠিক ঠিক বলতে পারিস না। আমরা যদি মার্কসেও কোনরূপ দোষ পাই তবে তাও কেটে ছেটে বাদ দেই। ত্রিপিটক, কোরাণ আর বাইবেল হতে তোরা একটা অক্ষরও বাদ দিয়ে দেখত তোদের সাহস কত, অমি একবার দেখে নেই ! তা তোরা করতে পারিসনা, যা করতে পারিস তা ত দেখছিই। এখনও বলত দেশে গিয়ে তোর জন্য কি নিয়ে আসি ?

যা নিয়ে আসবি তা আমি জানি, এই বলেই প্রথম যুবতী মুখ্‌ লুকায়।

তবুও বল্‌ না ? তুই যখন এখানে আবার ফিরে আসবি তখন তোর শরীর অর্ধেক খানা হয়ে যাবে, মুখে আর কথা সরবেনা, তুই হয়ে যাবি আধমরা, তারপর তোর মনের গতি কোন দিকে যাবে কে জানে ?

দ্বিতীয় যুবতী কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান যাবার টিকিট কিন্‌ল, পাসপোর্ট করাল, টাকায় মানিবেগ ভর্তি করল তারপর একদিন "কনভয়েজ" করে জাপানের দিকে রওয়ানা হল। জাহাজ নির্ধারিত সময়ে জাপান পৌঁছুল। যুবতী ভেবেছিল হয় তার বাবা নয় তার দাদা এসে তাকে জাহাজ ঘাটে সম্বর্ধনা করবেন, কিন্তু কেউ আসেনি।

যুবতী তার বাবার চিঠিখানা বের করে পথের একখানা মানচিত্র বের করল

তারপর একখানা ট্যাকসি ডেকে ভাংগা জাপানীতে বলল "টুমি আমাকে অমুক গ্রামে নিয়ে চল, হামার ঘর সেখানে আছে।" জাপানী টেক্সি ড্রাইভার তাকে যথাস্থানে পৌছে দিয়ে গাড়ি হতে নামতে বল্ল। গাড়িতে উঠার সময়ও জাপানী ড্রাইভার তাকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করেনি, নামবার সময়ও করল না দেখে যুবতী চটে গেল এবং বল্ল "হামারইচ্ছা ছিল টোমাকে পঁচিশ টাকা দেই, কিন্তু টুমি অভদ্র আছে সেজন্য দশ টাকা দিলাম।" জাপানী ড্রাইভার দশটি ইয়েন নিয়েই সন্তুষ্ট হল কারণ এখানের ভাড়া মাত্র তুই ইয়েন। তুই ইয়েনের স্থলে দশ ইয়েন পাওয়া কি কম কথা।

তারপর যুবতী এক হাতে মানচিত্র আর অন্য হাতে ছাতা নিয়ে গ্রাম্য পথে চলতে লাগল। পথের তুদিকে ধানের ক্ষেত্র দেখে যুবতী গান ধরল

হে পৃথিবী তুমি চাষার হাতে গড়া
চাষী মজুর মিলে
(যে দিন চাষী মজুর মিলে) নাচবে তালে তালে
সে দিন নাচব আমি হয়ে দিশে হারা।

যুবতী যখন গান গাইছিল তখন কয়েকটা ফাজিল ছোকরা তার পেছন নেয় এবং ঢিল ছুঁড়তে থাকে। যুবতী মুখ ফেরাবার সংগে সংগেই তারা ধানের আইলে লুকিয়ে যায়।

যুবতী বাড়িতে পৌছেই চিৎকার করে ডাক দিল "বাবা কোথায়, দাদা কোথায়?"

কেউ এলনা। এল একটি ঝি। সে জাপানী প্রথায় যুবতীকে অভিবাদন করল কিন্তু একটি কথাও বলল না। ঝি-এর মুখখানা এতই গম্ভীর যে সে মুখ দেখলে সাপ মাথা নত করে, বাঘ জংগলে পালিয়ে যায়। ঝি-এর মুখ দেখেই যুবতীর মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়।

তারপর এলেন দাদা। দাদা সামনে দাঁড়ালেন মাত্র কিন্তু একটি কথাও

বললেন না। দাদাকে দেখে যুবতী কত অনুনয় বিনয় করল কিন্তু দাদা গ
হয়ে রইলেন। গম্ভীর মুখে দাদা চলে গেলেন।

পিতা আসলেন জাপানী পোষাক নিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে পিতা আশী
করলেন কিন্তু কথা বললেন না। পিতা ইংগিতে কাপড় বদলাতে আদেশ করলে

যুবতী জাপানী পোষাক নিয়ে ভিতরে গেল। পোষাক বদলোল তারপর বাইরে আসল তখন সেও গম্ভীর। কতক্ষণ পর দাদা এসে যুবতীর একটা টান দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে মায়ের শেষ চিহ্ন সেই চিতাভস্মের দেখিয়ে বললেন এখানেই আমাদের মায়ের চিতাভস্ম।

মায়ের চিতাভস্মের কথা মনে হতেই যুবতীর চোখ দিয়ে আপনি
এল। কতক্ষণ যুবতী ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল তারপর যখন তার জ্ঞান হল ত
সে হাসল। আপন মনেই বলতে লাগল, মাতৃশোক আমাকে অভি
করেছিল, 'এটাই সত্যি এর বেশী নয়।' এর পর যুবতী আবার গম্ভীর

দিন যেতে লাগল। ক্রমেই যুবতী জাপানী ভাষায় এবং অ
কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। যুবতী প্রত্যেক দিন পিতৃপুরুষকে পূজা ক
এবং লোকে তা দেখে। যুবতীর হাবভাব এবং মনের পরিবর্তনে গ্রা
লোক খুবই খুসী। অবশেষে একদিন যুবতীর বিয়ের সম্বন্ধ এল।

যুবতী আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে তার ইউরোপীয়ান পোষাক পরল,
ছাতাটি হাতে নিল তারপর পিতা ও ভ্রাতাকে ইংলিশে বলল গুডবাই ফাদার
ব্রাদার। তারপর সে সহরের দিকে গিয়ে আমেরিকান কন্সালের বাড়ি
আশ্রয় নিল।

কন্সাল নানা কথা বললেন। প্রত্যেক কথার পেছনেই জাপানী বিদ্বে
যুবতী প্রত্যেক কথায় সায় দেয় যেন সে জাপানীদের কত ঘৃণা করে।

যুবতী জাহাজে উঠে আবার বলল "গুডবাই জাপান।" তারপর তুমাস
হল প্রথম যুবতীর সংগে সাক্ষাৎ।

প্রথম যুবতী ব্ল্যাক ড্রাগন পার্টির কাজে বড়ই ব্যস্ত। সে জিজ্ঞাসা করল
মন দেখলি ?

হাঁ, তাই বলার জন্য অপেক্ষা করছি। আমার কথা শোন আর মনে করে
খিস। বাবা এবং ভাইকে দেখেছি। তারা চেয়েছিলো আমি পূর্বপুরুষকে
জা করি, তাদের ইচ্ছামত আমার বিয়ে হউক। আমি যেন মানুষ নই।
রীরের সংগে মনের জন্ম। শরীরের যখন ধ্বংস হয় তখন মনও আপনা
ত লোপ পায়। যা ধ্বংস হয়েছে তারও পূজা করতে হবে, তা তোমাদের দ্বারা
ব। আমি যখন বাবা আর ভাইকে দেখিয়ে মায়ের চিতাভস্ম পূজা করতাম
ন তারা ভাবত সত্যিই আমি পূজা করছি, কিন্তু তারা জানত না আমি তখন
বতাম, যে মরে গেল তার আবার পূজা কিসের, শ্রদ্ধা জানানো চলে
ত্র। তারপর ঐ গ্রাম্য ভাব। আমাকে তারা বিয়ে দেবে। আমার যেন
া নেই। তারপরই চলে আসা।

হাঁ, আর একটা কথা—আমেরিকানদের সংগে জাপানীরা যুদ্ধ করবে। হার
ত কার হয় জানি না, সে সময় আমরা চেষ্টা করব উভয় দেশে যাতে সাম্যবাদ
য়েম হয় বুঝলে ? তখন আমেরিকান ধনীদের পোষ্যপুত্র আণ্ডার গ্রাজুয়েট
সাসিয়েসন আর জাপানীদের ডিক্টেটর ব্ল্যাক ড্রাগন উভয়ের ধ্বংস চেষ্টা করব।
ার সংগে আমার থাকা সম্ভব হবেই না, তুই হলি জাপানী। আমি আমে-
কানদের সংগেও থাকব না, আমি আমার দলে ভিড়ে যাব।

তোদের দলের নাম কি ?

দ্বিতীয় যুবতী বললে, 'শত্রুর কাছে কিছু বলতে নেই' বলেই
তী চলে যায়।

এটা হল প্রথম চিত্র। দ্বিতীয় চিত্র হল প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে। জাপানের
াকৃতিক দৃশ্যে এত সৌন্দর্য আছে তা জাপান তিনবার দেখেও বুঝতে পারিনি
তে পলিটিক্সের নাম গন্ধও ছিল না। শুধু সৌন্দর্য। কি সুন্দর সে দৃশ্য।

নারা

ওসাকাতে আরও কলকারখানা দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ইয়ামতোর সংগ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সেজন্য নারা যাব বলেই ঠিক করেছিলাম। নারা ওসাকা হতে বেশি দূর নয়। আমি নারা যাব শুনে ইয়ামাতো বল্লেন তিনি আমার সংগে কিওটো পর্যন্ত যাবেন। কোনও এক সময়ে কিওটোতে জাপানের রাজধানী ছিল। কথাটা কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না। কিওটো, নারা, নাগয়া এবং টোকিও সবই যদি জাপানের রাজধানী হয় তবে জাপানের বর্তমান অবস্থা মোটেই আসতে পারত না। মধ্যযুগে হয়ত কোনও রাজা থাকতেন সেজন্যই এরা বলে একদা রাজধানী ছিল।

কথা হল যাকে পরিত্যাগ করার জন্য নারাতে (Nara) চলে যাওয়া সেই যদি সংগে থাকল তবে আর তাড়াতাড়ি করে লাভ কি ? সেজন্য ইয়ামাতোকে বলেছিলাম আমি ঘেইসা বালিকাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, যদি তা আমাকে জানান তবে বড়ই বাধিত হব। ইয়ামাতো আমাকে ঘেইসা বালিকাদের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাই বলছি।

ভারতবর্ষে বর্তমানেও দেবদাসী দেখতে পাওয়া যায়। দেবদাসীরা শুধু মহাদেবেরই অর্চনা করেন। বর্তমানে অবশ্য গণপতি এবং কার্তিক প্রভৃতি দেবতার সেবাও করতে হয়। না করে উপায় নাই। অর্থের সংগে সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ। যে ভদ্রলোক কার্তিক অথবা নারায়ণের উপাসক তিনি তাঁর মন্দিরে যদি দেবদাসী নিয়োগ করেন তবে দেবদাসী অর্থের বিনিময়ে সে কার্য গ্রহণ করবেই। আসলে কিন্তু দেবদাসীরা শুধু শিবের উপাসনাই করত। জাপানেও একটি দেবতা ছিলেন এবং এখনও আছেন সেই দেবতা হলেন শিব। শিবেরই অপর নাম শিম্ব পরে শিম্বা কথাটাই শিণ্টো কথায়

পরিণত হয়েছে। শিবের সন্তুষ্টির জন্য যে সকল বালিকা গান করত তাদেরই বলা হত ঘেইসা। ঘেইসা বালিকারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করত এবং সমাজে তাদের বেশ সম্মান ছিল। ক্রমে ঘেইসা বালিকারা রাজা, সামুরাই এবং ধনীদের বাড়িতে বহু অর্থের বিনিময়ে যেত এবং সেখানে দেবসেবার মতই ধনী এবং গণ্যমান্যদের সেবা করত। ক্রমে বিষয়টি ব্যপক হয়ে পড়ে এবং ঘেইসা বালিকা না হলে কোনও আমোদ প্রমোদই হয় না বলে সাধারণ লোকের মধ্যে একটি ভাবধারা জেগে ওঠে। কিন্তু জাপানে যেমন ব্ল্যাক ড্রাগণ আছে তেমনি উন্নতিকামীও আছে। এই উন্নতিকামীরা শুধু সামাজিক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখত। তারা দেখতে পেলে ঘেইসাদের সংখ্যা যেরূপভাবে বেড়ে যাচ্ছে যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি না কমান যায় তবে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। সে জন্য এই উন্নতি-কামীরা নিজেদের বোন এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদে বের হতে লাগলেন। অনেকে আফিস ফেরতা টাইপিষ্ট এবং বাসের বালিকা কন্‌ডাক-টরদের নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বের হতে আরম্ভ করলেন। এতে তাদের খরচ মোটেই হত না। যাকে সংগে করে নিয়ে যাওয়া হল তিনি ঘেইসা নন্। তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে ঘরে পৌঁছে দিলেই হল। এরূপ করে যখন সমাজ উন্নতিকামীরা ঘেইসাদের পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করতে লাগল তখন ঘেইসাদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল এবং তারা নূতন নূতন ব্যবসাও অবলম্বন করতে আরম্ভ করল। বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কথা বলছি, ঘেইসার সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপানে ঘেইসা বলতে কিছুই ছিল না। সকলেই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপান যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেয়নি তবুও তাদের আমোদ প্রমোদ লোপ পেয়েছিল। চীন যুদ্ধেই জাপান অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঘেইসা গার্লদের দেবসেবা সাময়িকভাবে এখানেই সমাপ্ত হল। ভবিষ্যতে আবার ঘেইসা গার্ল জাপানে দেখা দেবে কি না, তা কে জানে ?

যখন দেখলাম ইয়ামাতোকে কোন মতেই সংগ ছাড়া করতে পারা যাবে না তখন তাকে নিয়েই নারার দিকে অগ্রসর হলাম। বেলা তখন সাড়ে সাতটা। আমার প্রস্তুত হবার পূর্বেই ইয়ামাতো এসে উপস্থিত হলেন। আমিও প্রস্তুত হয়ে পথে নামলাম।

আমার স্থানীয় রেল ষ্টেশন দেখা হয়নি সেজন্য ইয়ামাতোকে বললাম আমি এখানকার রেল ষ্টেশন দেখে নারাতে যাব। ইয়ামাতো আমার কথায় রাজি হলেন এবং রেল ষ্টেশনে গিয়েই একখানা মানচিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মানচিত্রে দেখান হয়েছিল কোন কোন দেশে কত দৈনিক মজুরী পাওয়া যায় এবং সেই দেশগুলিতে যেতে হলে কত ইমিগ্রেসন খরচ জমা রাখতে হয়। মানচিত্রখানা একটু ভাল করে দেখলেই বুঝা যায় বিদেশীরা জাপানীদের বিদেশ যাবার পথ কত রকমে বন্ধ করে রেখেছে। আমার মত লোকেরও মানচিত্রখানা দেখামাত্র রাগ এবং ক্ষোভ হয়। ইয়ামাতো আমার রাগ এবং ক্ষোভ যে হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি আমাকে রেল ষ্টেশন হ'তে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ধরুণ আমি একজন আমেরিকান। আমার দেশে আপনার আসবার কি দরকার? নিজের দেশটা আমার দেশের মত করে নিয়ে স্বদেশে থেকে বিদেশের আনন্দ অনুভব করতে কি কেউ নিষেধ করে? তা না করে যদি আমেরিকানদের প্রতি ক্ষোভ দেখান হয় তবে তা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশে ধনী শ্রেণীর লোক দরিদ্র মজুরদের কিছুই দিতে রাজি নয় অথচ বিদেশের ধনদৌলতের দিকে বেকুব মজুরদের লেলিয়ে দিতে একের নম্বর ওস্তাদ। আপনি এরূপ মানচিত্রের দিকে একটুও তাকাবেন না। পরের দেশের ধন দৌলত দেখে কি লাভ? ঐ ত আমরা মানচুরিয়া জয় করেছি কিন্তু আমাদের অবস্থা আজ নারাতে গিয়েই বুঝতে পারবেন। আপনারা ভাবেন জাপান প্রাচ্যদেশগুলি উদ্ধার করবে, একবার নিজের দেশ জাপানীরা উদ্ধার করুক তারপর অপরের কথা চিন্তা করার সুযোগ হবে।

এর সংগে বন্ধুত্ব করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? আবার ভাবলাম আর কিছুও হতে পারে, যাক পথ চলাই ভাল। আমরা নারার দিকে অগ্রসর হবার পূর্বে ফাঁড়িপথ ধরা হবে কি বড় পথ ধরা হবে তাই বিবেচনা করা গেল। আলোচনা করে ঠিক হল ফাঁড়িপথ ধরলে আমরা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই নারাতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। আমরা ফাঁড়িপথ ধরলাম।

বড় পথটা পার হয়ে যখন ফাঁড়িপথে এসে পড়লাম তখন থেকেই একটা দুর্গন্ধ অনুভব করছিলাম। এই দুর্গন্ধ আমার পরিচিত। চীন দেশেও এই দুর্গন্ধ অনেক দিন অনুভব করেছি। জাপানী কৃষকও মলমূত্রের দ্বারাই ভূমিকে সরস করে তুলে।...একটি চাষাকে তার জমিতে সার ছড়িয়ে দিতে দেখে ইয়ামাতোকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই জমিগুলি কাদের?

ইয়ামাতো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার জমি আছে কি?

নিশ্চয়ই আছে, তবে আমরা নিজে চাষের কাজ না করে অপরকে চাষ করতে দি। কেহ খাজানা দেয় আর কেহবা অর্ধেক ফসল দেয়; অবশ্য বীজ ধান আমাদেরই দিতে হয়।

ইয়ামাতো একটু চিন্তা করে বললেন, এই জমিগুলি দেখছেন সবই একটি সিন্টো মঠের। চাষারা মঠের অধিবাসীকে ধান না দিয়ে প্রত্যেক ফসলের জন্য টাকা দেয়। অবশ্য তাতে আপনারা যেরূপ পান, মঠের মালিকও ততটাই পান। এখানে অনেকগুলি সিন্টো মঠ আছে, যদি ইচ্ছা করেন ত পথে দেখিয়ে যেতে পারি। আমি অস্বীকার করে বল্লাম নারা শহরটা নাকি মঠে পূর্ণ, সেখানে গিয়ে ধীরে সুস্থিরে মঠ দেখা হবে। এখন পথ চলাই কর্তব্য। মাইল দশ যাবার পরই আমাদের পথে একটি কৃত্রিম ফোয়ারা এল। আমরা ফোয়ারা হতে মুখ দিয়েই জল খেলাম। ফোয়ারার জল একটি পাইপের সাহায্যে পথের পাশে আনা হয়েছে। এরূপ জলের ফোয়ারা জাপান এবং তুর্কী ছাড়া

এশিয়ার কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে ভাবছিলাম কাকে আশীর্বাদ করি ? ভেবে দেখলাম এই আশীর্বাদের দ্বারা যদি কারো কোনও উপকার হয় তবে তার পাওনাদার হল ইউরোপীয় সভ্যতা। ভারতবর্ষে জলছত্র করা হয় বটে কিন্তু পবিত্রতার নামে সমাজের যে অনিষ্ট করা হয় তা অবর্ণনীয় এবং অক্ষমনীয়।

আমরা নারার দিকে যতই অগ্রসর হতে লাগলাম ততই যেন নিরিবিলি অনুভব করতে লাগলাম। পথে লোক নাই। গ্রামে লোক নাই। দোকানগুলিতে লোকজন অতি অল্প। লোক মোটেই থাকেনা। আমি ইয়ামাতোকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এখানে লোক ইচ্ছা করেই এরূপ জীবন কাটাতে চায়। এখানে লোক ধ্যান করতে আসে, কেহ কেহ বৎসরের পর বৎসর কারো সংগে কিছু না বলে মঠে কাটিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এরা প্রায়ই ধনীর ছেলে এবং যখনই তারা দরকার মনে করে তখনই তারা নারা সহরের আশেপাশে যে সকল মঠ আছে তাতে এসে বাস করে। এরূপ নিঃসংগ জীবন কাটানো মহা কষ্টকর তবে এরূপ জীবন কেহ কেহ কেন পছন্দ করে জানতে চাইলে ইয়ামাতো এসম্বন্ধে কিছুই বলতে রাজি হলেন না।

দ্বিপ্রহরে আমরা একটি লজিং হাউসে গিয়ে উঠলাম এবং দৈনিক এক ইয়েনে খাওয়া ও থাকা পাব ঠিক করলাম। এই সহরে এই লজিং হাউসটিই সবচেয়ে সস্তা জেনে সুখী হলাম। ইয়ামাতো একই লজিং হাউসে থাকলেন না। অন্য লজিং হাউসে চলে যাবার পূর্বে বলে গেলেন এখানে আমাদের আজ ছাড়া আরও দুদিন থাকতে হবে। আমার তাড়াতাড়ি কিছুই ছিলনা। সেজন্য নারাতে মোট তিন দিন থাকতে রাজি হলাম।

বিকেলবেলা রেল ষ্টেশন দেখে ফেরবার পথে কতকগুলি পালা হরিণের দেখা পেলাম। পথের ছোটছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হরিণের পানে ঢিল ছোঁড়ে না অথবা সাইকেলে করে এদের গায়ে গিয়ে পড়ে না। আমাদের দেশ হলে কত

বাহানা করে ছেলে মেয়েরা হরিণের দলকে বিরক্ত করত তার হিসাব দেওয়াই কষ্টকর। এগিয়ে যাওয়ার পর হরিণগুলি আমাকে দেখে একটি পার্কে প্রবেশ করল, বাইরে থাকতে সাহস করল না। বুঝলাম এরা আমাকে শত্রুরূপে গণ্য করেছে, অথচ আমারই পাশদিয়ে একজন ইউরোপীয়ান চলে গেল তাকে একটুও ভয় করলনা। চীনা জাপানী এরা সর্বভুক, ইউরোপীয়ান্‌রা না খায় কি অথচ পালা হরিণ কাউকে ভয় না করে আমাকে ভয় করছে তার কারণ খুঁজে পেলুম না। এ বিষয় নিয়ে একটি শ্বেতরুশিয়ানের সংগে সেদিনই কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন 'বন্ধু, আপনার শরীরে সিমেটিক অর্থাৎ আরব রক্ত রয়েছে। যাদের শরীরে সিমেটিক রক্ত থাকে, তাদের গৃহপালিত জীবও ভয় করে; কারণ সিমেটিকদের অন্তরে যেমন হিংসার বাতি অনবরত প্রজ্জলিত থাকে তেমনি গৃহপালিত জীবেরও স্বতঃস্ফুর্ত স্বভাব হল এই হিংসুকদের কছে থেকে দূরে থাকা। কথাটা কতটুকু সত্য তা তখন আমি বুঝতে সক্ষম হয়নি কিন্তু যাদের মধ্যে একদিন শূলে চড়ানো প্রথা প্রচলিত ছিল, যারা এখনও গৃহপালিত জীবের রক্ষণাবেক্ষণ জানেনা তাদের মনে এরূপ হিংসা প্রবৃত্তি থাকাই সম্ভব।

নারা বহুপুরাতন সহর। হাজার বৎসর পুর্বে এখানে বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এখানকার অন্যান্য ধর্মমন্দিরগুলি বৌদ্ধ মন্দিরের মতই। যেমন "দয়া" Goddess of Mercy। এখানে সিন্‌টোইজমের প্রভাব কম বলেই মনে হল।

পরের দিন সকালবেলা এখানে দুটি ঘটনা ঘটে তা বড়ই আশ্চর্য-জনক। সকাল বেলা একটি যুবক আমার কাছে এল এবং আমাকে বৌদ্ধধর্মের রোমান অক্ষরে একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বলল। যতদুর সম্ভব আমি তাই ব্যাখ্যা করলাম। তারপর যুবক আমাকে বললে সে সাবমেরিণে কাজ করে; সে জিজ্ঞাসা করল মৃত্যুর পরে তার কি পুনরায় জন্ম হবে? যদি জন্ম হয় তবে কি সে জাপানীর ঘরে জন্ম নিতে সক্ষম হবে? এসম্বন্ধে আমার নিজের মতবাদ না বলে

বুদ্ধদেবের উপদেশই বলতে বাধ্য হলাম। বৌদ্ধদের নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়াই চরম লক্ষ্য। এখন সেই নির্বাণ কি এই দেহের অবসানেই হয় কি অন্য কোন প্রকারে হয় সেকথা বুদ্ধদেব বলে যাননি। আমরা পার্থিব জীব। আমরা এমন কোনও প্রমাণ পাইনি যাতে করে কেউ পুনরায় জন্ম নিয়ে নব শরীরে পুরাতন কার্য সমাপন করে গেছে। যা শুনি সবই গল্প। অতএব মৃত্যুর পর জাপানী হয়ে জাপানকে সেবা করার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

যুবক তখনও বসে ছিল। ইতিমধ্যে একজন পুলিশ এসে আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইল। আমি তাকে পাসপোর্ট দেখালাম এবং তারপর সে আমার পুঁটলিটা ভাল করে তল্লাসী করে যখন কিছুই পেলনা তখন আমার মাণিবেগ দেখতে চাইল। মাণিবেগ তার হাতে দিলাম। সে মাণিবেগে নব্বই ইয়েন দেখতে পেয়ে বললে, 'শুনেছি তুমি ভিক্ষা কর, ফের যদি তোমাকে ভিক্ষা করতে দেখি তবে জাপান থেকে তাড়িয়ে দেব। আমি নীরব থাকাই পছন্দ করলাম এবং একটা বালিসে মাথাটা রেখে ঘরের উপর দিকে চেয়ে থাকলাম।

পুলিশ যাবার পর যুবক পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তবে পুনরায় জাপানী হয়ে ফেরবার উপায় নেই, এই ত আপনি বলতে চান ?

আমি বললাম,' আমি এখন কিছুই বলতে চাইনা, লোকে যা বলে গেছে তাই বলছি। আমি সামান্য লোক আমার বলার কি অধিকার আছে, বিশেষ করে আপনাদের দেশে।

চুপ করে যখন শুয়েছিলাম হঠাৎ ইয়ামাতো এসে হাসতে লাগলো এবং বলল এবার একটু শিক্ষা হয়েছে। আমাকে পুলিশ বেশি কিছু বলেনি বলবেওনা, কারণ এখনও আমরা মনে করি বৃটিশ আমাদের চেয়ে বলবান। যেদিন বুঝব বৃটিশ আমাদের চেয়ে বলবান নয় সেদিন বৃটিশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে কোনরূপ ত্রুটি করব না। আমি ইয়ামাতোর কথায় জবাব দিলাম না, শুধু জানালা দিয়ে পাশের পাইন বাগানের দিকে চেয়ে থাকলাম।

কতক্ষণ পরই কয়েক জন বৌদ্ধ পুরোহিত লজিং হাউসে এলেন এবং আমাকে অতি বিনয় করে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম।

মরণের পর কি জন্ম আছে? যদি না থাকে তবে পুনর্জন্ম বলে যে কথাটা ভারতে প্রচলিত আছে তার আসল মানে কি?

মরণের পর আর জন্ম হয় না। ভারতের পণ্ডিত সমাজ সাধারণ লোককে ঠকাবার জন্য এই নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে এবং সিণ্টো-ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এই নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। আমি তার প্রমাও পেয়েছি। এই যে যুবকটি বসে আছেন তিনিও জানতে চান মরণের পর জন্ম আছে কি না? আর যদি জন্মই হব তবে তাঁর জন্ম জাপানে হতে পারে কি না?

সিণ্টোধর্মাবলম্বিরা বলতে চান মরণের পর জন্ম হয় এর মানে তুমি দেশ সেবা, রাজ সেবা করে মৃত্যু বরণ কর, পুনরায় তোমার জন্ম হবেই, তখন তুমি তোমার পূর্ব জন্মে যে সুকাজ করেছ তার সুফল পাবে এবং সুখী হবে। এটাকেই বলে ধর্মের উল্টা ব্যাখ্যা, এবং এটাই হল লোভীদের কাজে নিযুক্ত করার প্রকৃত উপায়। আমি এদেশে ধর্ম প্রচারও করতে আসিনি কিছু শিক্ষা করতেও আসিনি, শুধু দেখতে এসেছি জাপান কেমন দেশ।

বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণও কঠিন লোক। তারা বলতে লাগলেন, শুনেছি ভারতে শৈবধর্মের প্রচার শংকর করে গেছেন, তিনি নাকি বলে গেছেন এ সংসার মায়া। সংসারের মায়া হতে মুক্ত হওয়াই মানুষের একমাত্র কামনা। আমাদের দেশে সিন্টোরা কিন্তু মুক্ত হওয়ার চেয়ে ফিরে আসাটাই বেশী পছন্দ করেন।

লজিং হউসে বসে থাকা ভাল লাগল না। বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের সংগে তাদের মঠের দিকে বেড়াতে বের হলাম। বৌদ্ধদের মঠে আজ কি জানি আমার

বেশ ভাল লাগছিল। হাজার বৎসরের বৌদ্ধমূর্তি এবং সেই মূর্তিটার কাছেই নানা রকমের কারুকার্য শোভিত প্রস্তর এবং কাষ্ঠ স্তম্ভগুলি দেখে সুখী হলাম। জাপানের বৌদ্ধ কারুকার্যের সংগে ভারতীয় বৌদ্ধকারুকার্য একদম মিলে যায়। যে মূর্তিটিকে দয়ার দেবী বলা হয়েছে তার পেছনে যে মুকুটটি রয়েছে তাতেও বৌদ্ধধর্মের ছাপ রয়েছে। দয়ার মূর্তিটি অনেকক্ষণ বসে দেখেছিলাম। এরূপ মূর্তি কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছিল না। বাস্তবিকই মূর্তিটিতে যেন দয়া ফুটে বের হচ্ছিল। কারিগর মনে প্রাণে কাজ করেছিলেন তার প্রমাণ প্রথম দর্শনেই দর্শকের মন আকর্ষণ করে। নারাতে এক জন ভারতীয় ব্যবসায়ীর দর্শন পাই। সেই লোকটি একজন ভারতীয় কট্টর মুসলমান। তাকে নিয়ে যখন আমি মূর্তিটি দেখলাম এবং বললাম এই মূর্তিটি আপনি ভেংগে টুকরা টুকরা করতে পারবেন? আমার কথা তাঁর কানে পৌছল না। তিনি তন্ময় হয়ে মূর্তিটি দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন এতে কোনও ভূত লুকিয়ে আছে, আমার এই মূর্তি ভাংগতে মনেও আসেনা। আমি তাঁকে ঘরের বাইরে এনে বলেছিলাম "এখানে ভূত প্রেত কিছুই নেই আছে শিল্পীর একটানা নৈপুণ্য। যে কোন লোক নিপুণতার সহিত যে কোন কাজ করুক অপর লোক তা ধ্বংস করতে পারবেনা। সেই জিনিসই ধ্বংস হয় যার পেছনে নিপুণতা নেই। লোকটি জাতে ব্যবসায়ী। ধর্ম তাঁর যাই হোক আসলে তিনি ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তিনি পুনরায় মন্দিরে গিয়ে পাঁচ ইয়েনের এক খানা নোট মূর্তিটির পাদদেশে রেখে এসেছিলেন।

নারা অপূর্ব এক শহর। এখানে লোক আসে নির্জনে বাস করার জন্য। ইয়ামাতো বলছিলেন, এখানে তিন শ্রেণীর লোককে আসতে দেখা যায়। প্রথম হ'ল সিন্টো পুরোহিতের দল। তারা এখানে এসে বৌদ্ধ পুরোহিতদের সংগে অনবরত পুনর্জন্ম নিয়ে চর্চা করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয়। অন্য দল হল জ্ঞানান্বেষী। তারা মরলে পরে কি হবে তাই নিয়ে আলোচনা করে সময় অতি-

বাহিত করতে বড়ই ভালবাসে। অনেক চীনা, আমেরিকান এবং অন্যান্য
গাতের লোক এখানে এসে সময় কাটাতে ভালবাসে। তখন চীন জাপান যুদ্ধ
পুরাদমেই চলছিল। জাপানীরা চীনাকে উৎখাত করতে বসছিল কিন্তু যারাই
নারাতে গিয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করতে চাইছিল তাদের যেমন চীনা সেপাই পথ
ছড়ে দিচ্ছিল তেমনি জাপানীরাও বিনা ভাড়ায় স্বদেশে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল।
নারা হল পুর্বদেশের ভ্যাটিকান। মান্চুরিয়া, মোংগোলিয়া এবং সিংকিয়াং
তে বৌদ্ধ এবং মুসলমান দানশীলরা এখানে এসে জ্ঞানের চর্চা করে ধন্য হয়।
১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এক শত বৎসর পুর্বের পুলিশ রেকর্ড দেখলে দেখতে পাওয়া যায়
জাপানের নারা শহরে একটিও চুরি হয়নি, অথবা কোনও নারীর প্রতি অবমাননা
করা হয়নি। এরূপস্থানে আমি মাত্র একজন ভারতীয় মুসলমানের সাক্ষাৎ
পয়েছিলাম আর কোনও ভারতবাসীর দেখা পাইনি। তবুও একজন ভারতীয়
সলমানের দর্শন পেয়ে সুখী হতে পেরেছিলাম। এখানে অন্যান্য ভারতবাসীর
র্শন না পাবার প্রথম কারণ হল, এখানে এমন কোন দেবদেবী নাই যার দর্শনে
াপ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

আর এক শ্রেণীর লোক এখানে আসে তারা হল জাপানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-
ারী। এরা এখানে এসে বড় বড় বাড়িতে থেকে জাপানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ
রে। তাদের সংগে এক অথবা দুজনের বেশি লোক থাকেনা। তাদের
াড়িতে টেলিফোন অথবা রেডিও থাকেনা। তারা বাইরের জগতের সংগে চিঠি
ত্রের সাহায্যেই সম্পর্ক বজায় রাখে। এখানে বসেই তানাকা মেমোরিয়াল
চনা হয়েছিল। এখানে বসেই জেনারেল টগো কি করে রুশদের ডাইরেন্ এবং পোর্ট
ার্থারে পরাজয় করবেন তার খসড়া তৈরী করেছিলেন। এখানেই হল ব্ল্যাক
াগনিষ্টদের হেডকোয়ার্টার। অথচ এই স্থানটি নীরবতায় যেমন প্রসিদ্ধি লাভ
রেছে তেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বড় বড় রাষ্ট্রনৈতিকবাদের মাথা খেলাবার
ান দিয়ে। জাপানের, রাষ্ট্রকেন্দ্র হতে বড় বড় লোক এখানে

বিশ্রাম করতে চলে আসেন। তাঁদের সংগে গণ্ডায় গণ্ডায় বয় বাবুর্চি থাকেনা। তাঁরা আসেন খালি হাতে আর চলে যান খালি হাতেই। তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য রেলষ্টেশনে লোক দাঁড়ায় না। রিকসা, টেকসি রেল ষ্টেশনে থাকে না। পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছেতে হয়। বাস্তবিকই নারা জাপানের আশ্চর্য শহর।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পার্কে লোক মোটেই নেই। পার্কে নীরবে বসে থেকে চিন্তা করতে আমার বড়ই ভাল লাগত। পার্কে গিয়ে বসে আছি। কতক্ষণ পর দেখতে পেলাম এক নবীন সন্ন্যাসী আমারই পাশে একটা পাইন গাছে পিঠ ঠেস দিয়ে কি একটা বই পড়ছে। সন্ন্যাসীর যৌবন সবে মাত্র দেখা দিয়েছে। মাথার চুলগুলি মুণ্ডন করার জন্য মাথার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হয়েছে। ছোট ছোট চোখগুলিতে সূর্য কিরণ ভেদ করে নূতন আলোক বের হচ্ছে। সামান্য এবং মামুলী কিমানো সন্ন্যাসীর শরীরের শ্রীবৃদ্ধি করছে। সর্বোপরি সন্ন্যাসীর চরণ যুগলে কাঠের জাপানী খড়ম যেন আনন্দে হাসছে। আমি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করলাম না আমি শুধু দেখছিলাম বিশুদ্ধ যৌবনের প্রভাব কত? জাপান বলেই নবীন সন্ন্যাসী বিশুদ্ধ যৌবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, অন্যত্র যদি হ'ত তবে এরূপ বিশুদ্ধ যৌযন রক্ষা করা হয়ত সম্ভব হতনা।

আমি অনেকক্ষণ নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে শেষটার নিজেই হায়রান হয়ে গেলাম নবীন সন্ন্যাসী একটার পর একটা করে বইএর পাতা উলটিয়ে যাচ্ছিল। বইটা মস্ত বড়। মনে হচ্ছিল নবীন সন্ন্যাসী বইটাকে পড়ে শেষ করতে পারলেই যেন বাঁচে। ইয়ামাতোর পার্কে আসার কথা ছিল। তিনি বেলা আড়াইটার সময় পার্কে এসে যখন দেখলেন আমি নবীন সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে আছি তখন তিনি বল্লেন এ লোকটা হল সিন্টো পাদরী,—এ চায় জাপানী জাতকে গোলাম করে মিকাডোর পায়ে নিয়ে একটা একটা করে বলি দিতে। এর দিকে চেয়ে থাকবেন না। এরা দেখতে মানুষ কিন্তু কাজে শয়তান। তারা হালে একটা বই বে

করেছে, তাতে লিখেছে, মিকাডো হলেন সূর্যের অবতার। মিকাডোকে যারাই পুজা করবে তারাই সূর্যালোকে গিয়ে বসবাস করতে পারবে, আর যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে জাপানেও ফিরে আসতে পারবে। আমার মনে হ'ল আমাদের দেশের কবিও গেয়ে গেছেন "মরলে পরে অমর হব, পাব স্বর্গ অনুপম, র'বে সদা আসর গরম" এই গানটি স্বদেশী যুগের প্রথম ভাগে গাওয়া হ'ত এবং সে গানের এমনই সম্মোহন শক্তি ছিল যার প্রভাবে অনেকেই মরতে রাজি হ'ত। স্বদেশী যুগের প্রথম স্তরের সংগে জাপানী মান্চুরিয়া দখল যুগের বেশ সম্পর্ক রয়েছে দেখে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম।

বাস্তবিকই নিহত হওয়া এবং নিধন করা একদিন ছিল বীরত্ব সূচক কর্ম। ক্রমেই সেই বীরত্বের নাম বদলে গিয়ে 'পশুত্বে' পরিণত হচ্ছে। একদিন জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য জাতের লোককে হত্যা করে লোক সুখী হত, এখন আর তা নেই, এখন জাতীয় ভাবের পরিবর্তন এসে দেখা দিয়েছে। চীনার মৃত্যু এবং পরাজয় দেখে কোন কোন জাপানীকেও দুঃখিত বলে মনে হচ্ছে। ইয়ামাতো তারই একজন। পূর্বে ইয়ামাতোকে আমি বিশ্বাস করতাম না, ভাবতাম ইয়ামাতোও একজন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু এখন দেখছি তিনি সে পথের পথিক নন্, নূতন মতাবলম্বী। আমাদের দেশে আমরা আমাদের মনের কথা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে ফেলি, কিন্তু জাপানীরা সেরূপ নয়, তারা মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে না, কাজে প্রকাশ করে।

পরের দিন ইয়ামাতোকে নিয়ে নূতন পথের নূতন স্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। এবার আমি নাগয়ার পথে।

নাগয়ার পথে

কিয়োটো পার্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। আমাদের দেশে প্রতাপ সিং যেমন মোংগলদের ভয়ে চিতোরে নূতন রাজধানী করেছিলেন তেমনি জাপান সম্রাটও চীনা দস্যুর ভয়ে টোকিও পরিত্যাগ করে কিয়োটোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন চীনা দস্যুর দুর্দান্ত প্রতাপে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসীরা কাঁপত। চীনা দস্যুরা আলাস্কা হতে আরম্ভ করে কেপহর্ণ পর্যন্ত ডাকাতি করে বেড়াত। জাপান সম্রাট কিয়োটোতে আসার পর থেকেই শহরটির শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়, আবার সম্রাটের টোকিও যাওয়ার পর থেকেই শহরটির অবনতিও ঘটতে থাকে। যদিও শহরটির অবস্থা ততদূর উন্নত ছিল না তবুও আমাদের দেশের কোনও শহরের সংগে কিয়োটোর তুলনা করা চলে না।

নারা হতে আমরা গ্রাম্য পথ ধরেছিলাম। সরু গ্রাম্য পথ দিয়ে চলার সময় আমাদের জমির আইলের উপর দিয়েও চলতে হয়েছিল। আমরা যখন জমির আইলের উপর দিয়ে চলছিলাম তখন দেখতে পাচ্ছিলাম প্রত্যেকটি ধান্যক্ষেত্রে জলের কল রয়েছে। যখনই চাষের জন্য জলের দরকার হয় তখনই কল খুলে দেওয়া হয়। জাপানের চাষাদের জন্য জাপানের ধনীরা যে এতটুকু করেছে তা দেখে আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে জাপানের চাষাদের অবস্থা বৃটেনের চাষাদের চেয়ে অনেক উন্নতই ছিল। তবে এর থেকেও ধারণা করা ভুল হবে যে জাপানী চাষাদের অবস্থা খুব ভাল। এখনও জাপানী চাষারা মধ্যযুগে তলিয়ে আছে। তাদের অনেক কিছুরই দরকার হয় না। তারা দরকার বলে এখনও অনেক কিছুই বোঝে না।

আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে যদি একটি শিশুর মৃত্যু হয় তবে লোকে বলে

'ঈশ্বরের ইচ্ছা'' কিন্তু শিশু কি রোগে মারা গেল তার সন্ধান নেওয়া তাদের ানেই আসে না। কি করে শিশু মড়ক নিবারণ হয় তার কথাও ভাবতে পারে া। জাপানের চাষাদের অবিকল সে অবস্থা না হ'ক তারাও আমাদের দেশের নরক্ষর মজুর অথবা চাষাদের মতই রাজআজ্ঞা পালন করতে পারলেই ভাবে, াকল কাজের শেষ হল। বৃটেনের চাষা অথবা মজুর সেরূপ নয়। তাদের গ্রানের স্তর জাপানী চাষাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, সে জন্য তার দরকারও বেশি। তার দরকার বলেই সে মালিকের সংগে ঝগড়া বাধায়, ধর্মঘট করে প্রাপ্য আদায় করে, সে জন্য বৃটেনের মালিকরাও যতটুকু না দিয়ে পারে চেষ্টা করে। জাপানী াষার লড়াই করার প্রবৃত্তি নেই বলেই জমির মালিক পণ্যব্যবসায়ীদের আদেশে জাপানী চাষাদের প্রত্যেক টুকরা জমিতে জলের কল করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিয়োটোতে সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর বাস অনেক বেশি। জাইবাত্তুদের অনেকে সখানে বাস করে বলেই পাহাড় ঠেলে কিয়োটোর দিকে চলছিলাম।

াকা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গ্রাম্য পথে চলেছি। জমির আইল দিয়েও াইকেল চালাতে সক্ষম হচ্ছি। যে দিকেই চাইছি সে দিকেই সবুজ বৃক্ষ, সবুজ াান্যক্ষেত্র, আর সুখী মুখগুলি দেখতে পাচ্ছি।

জাপানের জমির মালিক আর ব্যবসায়ী সমশ্রেণীর লোক নয়। যারা জমির মালিক তারা ব্যবসায়ের দিকে খুব কমই যায়। তারা তাদের জমি, াষাদের মধ্যে বিলি করে দেয়, সারের যোগাড় করে। ধান হয়ে গেলে ধানগুলি বিলি করে। তারপর যখন টাকা হাতে আসে তখন চাষাকে কিছুটা দেয় এবং নিজে বাকিটা নেয়। জাপানী চাষা নিজের বাড়িতে ধান জমিয়ে রাখে না এবং নিজের ঘরে নবান্ন করার জন্য পুরোহিতকেও ডেকে আনে না। ধান তৈরী হয়ে গেলে, চালের কলের মজুর এসে জাপানী চাষার বাড়ি হ'তে সবগুলি ান উঠিয়ে নেয়। চাষা পূর্বে যেমন দোকান হতে চাল কিনে খেত ধান তৈরী হবার পরও সে তেমনি দোকান হতেই চাল কিনেই খায়। সেজন্য জাপানী

চাষীর বাড়িতে আমাদের দেশের চাষার মত হাই-হুল্লড় এবং অপরিচ্ছন্নতা মোটেই নেই। জাপানী চাষার বাড়ি একখানা সাজানো বাগানে এক পরিবার পরিশ্রম করে জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছে। এরূপ সুখী পরিবার আমাদের পথে অনেকই দেখতে পেয়েছিলাম। ইয়ামাতো আমাকে সেরূপ একটি পরিবারে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই চাষার বাড়ির চারিদিকে নানারূপ বৃক্ষ। একটিও ফলের বৃক্ষ মনে হল না। কোথাও দু'তিনটা গাছ একত্রে বড় হওয়াতে কোনটাই ছাতরা বাঁধতে পারেনি, শুধু আকাশের দিকেই ধেয়ে চলেছিল। আমরা যখন চাষার বাড়িতে উপস্থিত হলাম তখন চাষা বাড়িতে ছিল না। সেজন্য আমি চাষার বাড়ির একটা নমুনা পেনসিল দিয়ে এঁকে ফেললাম। চাষার বাড়িতে একখানা মাত্র ঘর। ঘরটা পূর্বে পশ্চিমে লম্বা। পূর্বদিকে প্রবেশ পথ। মাটির মেজে। মেজের উপর থেকেই কাঠের দেওয়াল। ঘরখানা খড় দিয়ে ছাওয়া। ঘরের টুলি (উপরিভাগ) কি রকমে বেতের সাহায্যে বাঁধা হয়েছে তাও দেখে নিলাম। তারপর যখন চাষা আসল তখন আমরা তার ঘরের ভেতর প্রবেশ করলাম। বেশ পরিষ্কার ঘর। ঘরের মেজে বসবার একটা সুন্দর স্থান রয়েছে। ঘরের দেওয়ালে জানলা না থাকাতে ঘরটার ভেতর বেশ অন্ধকারই মনে হচ্ছিল। ঘরখানার ভেতরের দিকটা দেখে মনে হচ্ছিল আমি আমার স্বগ্রামের কোনও বাড়িতে এসেছি। পশ্চিম দিক হতে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। চাষা লাউয়ের খোলে জল ভর্তি করে রেখেছিল। সে জল আমাদের খেতে দিল। কদুর খোলের ভিতরে বার ঘণ্টা পূর্বে জল ভর্তি করে রাখলে বেশ একটু টক হয় এবং গরমের সময় তা খেতে বেশ আরাম লাগে। বর্তমানে ভদ্রপরিবারে লাউয়ের খোলে জল ভর্তি করে রাখে না কিন্তু পূর্ব বংগ এবং আসামের যে সকল এলাকায় নারিকেল সামান্য পরিমাণে হয় অথবা হয় না, সেই এলাকাগুলিতে দরিদ্র মুসলমান এবং অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুর বাড়িতে লাউএর খোলের ভেতর এখনও রাত্রে জল ভর্তি করে রাখে

এবং মজুর যখন পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফেরে তখন তাই খায়। লাউএর খোলের ভেতরে রক্ষিত জল খেয়ে আমি ঘরের মেজেতে শুয়ে পড়লাম এবং ভুলে যেতে বাধ্য হলাম আমি জাপানে এসেছি। ভাবতে লাগলাম জাপান এবং আমদের দেশে পার্থক্য কোথায় ? আমরা এত হীন আর জাপান এত উন্নত কেন ?

কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর চাষার স্ত্রী ঘরে এলেন। পিঠে একটি ছেলে বাঁধা আর হাতে ধরে একটি কন্যা। আমাদের দেখেই গৃহলক্ষ্মীর চক্ষু লাল হয়ে গেল। চাষা কতরকমে কত ইসারা করল কিন্তু গৃললক্ষ্মী আর সহ্য করতে না পেরে অগত্যা আমাদের ঘরের বাইরে গিয়ে বসতে বল্লেন। আমরা ঘরের বাইরে বসলাম না, একেবারে গ্রাম্য পথে চলে এলাম। গৃহকর্ত্রীর এরূপ উগ্রভাব কেন হয়েছে তা ইয়ামাতোর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। ইয়ামাতো বল্লেন হয়ত ঘরে চাল নাই। ঠিক বাংগালী পরিবারের সংগে এই পরিবারের মিল রয়েছে। নিজে চাষা হয়ে ঘরে চাল নেই এরূপ ঘটনা পূর্বে বাংগালী পরিবারে দেখা যেত না এখন ভারতের চাষাদের ঘরে ঘরে সর্বত্র এরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা আর কোথাও না গিয়ে কিয়োটোর দিকে সোজা পথে রওয়ানা হলাম। পথে কতকগুলি ছাত্রের সংগে সাক্ষাৎ হল। ছাত্রগুলি আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। গ্রাম্য পথটার দুদিকে ইলেক্‌ট্রিকের থাম এবং এমন কতকগুলি মেশিন দেখলাম যা দেখে মনে হল নিকটেই কোথাও পাওয়ার ষ্টেশন রয়েছে।

পথ ক্রমেই খাড়া হয়ে চলছিল সেজন্য আমাদের সাইকেল হতে বার বার নামতে হচ্ছিল এবং পায়ে হেঁঠে সাইকেল ঠেলে চলতে হচ্ছিল। বেলা দুটার সময় আমরা কিয়োটো পৌছি এবং একটি বিশিষ্ট লজিং হাউসে স্থান নেই। এই লজিং হাউসটিকে যে কোনও ইউরোপীয়ান হোটেলের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। থাবারের কোনও সংস্থানই ছিল না। আমি লজিং হাউসে স্থান নিয়ে

হাতমুখ ধুয়ে রেল ষ্টেশনের হোটেলে গিয়ে রাইস কারী খেয়ে এলাম। ইয়ামাতো তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেলেন।

বিকাল বেলা যখন তিনি ফিরে এলেন তখন আমরা শহর দেখতে গেলাম। এখানেও একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ আছে, প্রাসাদটির ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। দর্শকরা রাজপ্রাসাদের বাগান বাড়ি এবং অন্যান্য স্থান দেখেই সুখী হয়। আমরাও বাগান বাড়ি এবং তারই আশপাশের চারিদিক দেখে সুখী হলাম। তারপর আমরা চল্‌লাম যে দিকে সাধারণ লোক বসবাস করে। দিনটা বেশ গরম ছিল সেজন্য যাতে পথে ধুলা না হতে পারে সেজন্য পাশের বাড়িগুলি হতে পথের উপর জল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। জাপানে ঝাড়ুদার এবং মেথর নেই। রাজপথের দুদিকে যারা বাস করে তাদেরই পথ পরিষ্কার রাখতে হয়। মেথর শহরে রাখার কোনও দরকার হয় না কারণ যে সকল বাড়িতে ক্লসেট সিষ্টেম নেই সেই বাড়ি হতে চাষারা মানুষের মলমূত্র কিনে নিয়ে যায়। চাষারা মানুষের মলমূত্র নিয়ে যায় বলে কেউ তাদের অচ্ছুৎ করে রাখেনি এবং সে সাহস কারো নাই।

সাহসের কথা যখন উঠল তখন আরও একটু বলা চাই। আমাদের দেশে যারা ছুৎমার্গ করে তাদের অনেকে প্রশংসা করে, অনেকে তাদের ভক্ত হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছুঁলে অপবিত্র হয়েছে প্রকাশ্যে বলে ফেলে তখন নিম্নবর্ণের হিন্দু তা নীরবে সহ্য করে যায়। অনেক মুসলমানও কোন হিন্দু বাড়ীতে গিয়ে কিছু ছুঁতে সাহস করে না। এই দুর্বলতার একটা ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিক তথ্য আমি বলতে যাব না, কিন্তু কি পূর্বদেশ এবং কি পশ্চিমদেশ এরূপ বর্বরতাকে কেউ নীরবে সহ্য করে না। তারা ঠিক ঠিক জবাব দেয়। তুমি আমাকে ঘৃণা করে ছুঁতে চাও না, আমিও তোমাকে ছোঁব না। আমাকে তুমি অবমাননা করে রেহাই পেতে পার না।

জাপানে কোনও এক সময়ে গোমাংসভোজিদের অনেকে ঘৃণা করত, এমন

কি সামাজিক উৎপীড়নও করত, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যারা গোমাংসভোজিদের হিংসা করত তাদের অনেকে এই পৃথিবী হতে উধাও হয়েছে। যখন এই বেকুবরা বুঝল যে তাদের অপকর্ম যারা পছন্দ করছে না তারাই এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তখন তাদের হুঁস্ হল। বাকি যারা রইল তারা আর গোমাংসভোজিদের ঘৃণা করার সাহসও করত না। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সার্থক হয়েছে। অপমান সহ্য করা পাপীদের দ্বারাই সম্ভব।

কিওটো শহরে বারবণিতার সংখ্যা খুবই বেশি। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে গ্রীণ হাউস্ পাড়ার দিকে চলে যাই। ইয়ামাতো আমাকে গ্রীণ হাউসের কাছে নিয়ে বল্‌লেন, 'বলুন ত এখানে এত গ্রীণ হাউস কেন?' এসব কথার জবাব দেওয়া তখন কষ্ট হত না। চট্‌করে বলে ফেল্‌লাম এখানে ধনীদের আগমন বেশি হয় সেজন্যই বারবণিতার সংখ্যাও বেশি। ইয়ামাতো বল্‌লেন ঠিক বলেছেন। আমি আগামী কল্য হতে আর আপনার সংগে থাকবনা। আমাদের দেশটা ভাল করে দেখে যাবেন, ভুলে যাবেন জাপান প্রাচ্য দেশের মিত্র। যে দেশের নারীরা অর্থাভাবে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য হয় সেই দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ স্বাধীন করে দেবে তা মূর্খরাই কল্পনা করতে পারে। কথারও শেষ আর ইয়ামাতোরও অন্তর্ধান।

লজিং হাউস থেকে বেশি দূরে যাইনি রক্ষা নতুবা লজিং হাউসে ফিরে আসাই আমার পক্ষে কঠিন হত। সংগী ছাড়া হয়ে তাড়াতাড়ি করে লজিং হাউসে এসেই, লজিং হাউসের ঠিকানাযুক্ত একখানা কার্ড পকেটে রেখে পুনরায় ঘর হতে বের হলাম। এবার আমি শহরের অন্তস্থলে বেড়াতে লাগলাম। অনেকেই বেড়াতে বের হয়েছিল। আমি একটি ফলের দোকানে গেলাম এবং সেখান থেকে দুটি আপেল দশ সেণ্ট দিয়ে কিনে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আপেলগুলি আসে কোথা হতে? জাপানে ত একটিও আপেল গাছ দেখতে পেলাম না। দোকানী ইংলিশ জানত। সে

আমাকে জানালে হকাইদো এবং উত্তর চোজেন অর্থাৎ উত্তর কোরিয়া হতে এই ফলগুলি আসে। ফল কিনে লজিং হাউসে ফিরে এসে দেখি আমার জন্য পুলিশ ঘরে এসে বল্লে, 'মিষ্টারো ইউ নো বেগ নাও? অর্থাৎ মিষ্টার আপনি কি এখন আর ভিক্ষা করেন না? আমি বল্লাম, 'হাঁ এখন আর ভিক্ষা করিনা। তারপর আপন মনে একটার পর একটা করে আপেল চিবিয়ে খেতে লাগলাম। জাপানী পুলিশের আমার প্রতি যেমন খারাপ মনোভাব ছিল আমারও তেমনি তার প্রতি খারাপ মনের ভাবই ছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ একের প্রতি অন্যে চেয়ে থাকলাম তারপর পুলিশটি চলে গেল। বুঝলাম জাপানী পুলিশ আমাকে মোটেই পছন্দ করছে না। ওদের পছন্দ আর অপছন্দতে আমার কিছুই আসে যায় না। লোকে সকল বিষয়ের উপর টাকার কথাই ভাবে বেশি। আমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল, সংগে সাইকেলও ছিল। টোকিও পর্যন্ত যাওয়া ত সাত দিনের কথা। তারপর যদি কোবেতে গাড়িতেই ফিরে আসতে হয় তারও খরচ ছিল। সেজন্যই আমার চিন্তা মোটেই ছিলনা।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ওটসু (O T S U) নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। যদিও স্থানটির দূরত্ব অতি অল্পই ছিল, তবুও পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। পার্বত্য পথে চলা বড়ই কঠিন কাজ। কতকগুলি লোক গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে চলছিল। আমি তাদের সংগে সাইকেল চালিয়েও পেছনেই পড়ে যাচ্ছিলাম, সেজন্য সাইকেল হতে নেমে পায়েই হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ যাবার পর দেখতে পেলাম কতকগুলি লোক একটা পর্ণঘরে একত্রিত হয়েছে। সাইকেল বাইরে রেখে তারা কি করছে দেখতে গেলাম। দেখলাম তারা তরমুজ কেনা বেচা করছে। ত্রিশ সেণ্ট দিয়ে আমিও একটি তরমুজ কিন্‌লাম। এখন কথা হল কোথায় বসে খাই। জাপানের পথঘাট পরিষ্কার। কোথাও নোংরা করতে প্রবৃত্তি হত না



নারাতে বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে করুণার প্রতিমূর্তি। প্রকাণ্ড
মন্দিরের ভেতর এই মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল



জাপানী সম্রাট হিরোহিতোকে সর্বসাধারণ সম্বর্দ্ধনা করিতেছে

তরমুজ কাটলেই মিষ্টি জল পড়ে মাছির আড্ডা হবে। শীতপ্রধান দেশের মাছি বড়ই সাহসী এবং অনিষ্টকারক। সামান্য নোংরা স্থান হতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এদের জন্ম হয়। সেজন্য এক জন জাপানীকে বলে তরমুজটি কাটালাম এবং কয়েক টুকরা খাবার পর বাকিটা তাকে দিয়ে বললাম, নোংরা স্থানটা পরিষ্কার কর। সে কোথায় চলে গেছে ভেবে আমি পা দিয়ে তরমুজের খোসাগুলি দূর করে ফেলে দিচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে সেই লোকটা আমাকে স্থানটা পরিষ্কার করতে দেখে আমাকে সেই কাজ থেকে বিরত করল। সর্বপ্রথমই সে নোংরা স্থানটিতে কতকটা নুন ঢেলে দিয়ে তরমুজের খোসাগুলি একটা গর্ত করে তাতে পুতে ফেলল এবং তার উপর নুন ছড়িয়ে দিল। এরূপ করাটা আমাকে দেখাবার জন্য নয়। অন্যত্রও এরূপ করতে অনেক স্থানেই দেখেছি।

ওতসু পৌছার পর আমার যেন কি হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে পর্বত আর মধ্যস্থলে গাঢ় নীল জলরাশি। জলে নৌকা পাল তুলে চলেছে। দ্বিপ্রহরের গরমে এরূপ দেখছি ভেবে একটি বাড়ি হতে জল চেয়ে নিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেললাম। তারপরও ঐ দৃশ্য। জল বহুদূরে মনে হচ্ছিল। ভাবলাম এরূপ করলে ত হবে না। কতক্ষণ বসা চাই তারপর দৃশ্যটা দেখতে হবে। প্রায় আধঘণ্টা উল্টাদিকে চেয়ে থাকলাম। আমি চেয়ে রয়েছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। আকাশ খুব পরিষ্কার। সূর্যটা যে মাথার উপর তা মোটেই মনে হয় না, শুধু নীল আকাশ আর তিন দিকেই সবুজ বৃক্ষনিচয়। কতকগুলি লোক আমার ভাবান্তর দেখে আমাকে একটি লজিং হাউসে নিয়ে গেল। আমি লজিং হাউসে গিয়ে অন্যান্য দিনের মত জুতা মোজা পরিত্যাগ করে শরীর হতে সকল কাপড় ছেড়ে কিমণো পরলাম, তারপর হাত মুখ ধুয়ে বেশ করে খেয়ে খিড়কী দরজা দিকে চেয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা হ্রদ। হ্রদেরই তীরে

লজিং হাউস অবস্থিত। মানচিত্র খুলে দেখলাম হ্রদটির নাম (Lake Biwa) বিওয়া হ্রদ।

মানস সরোবরের নাম শুনেছি এবং চিত্র দেখেছি। চিত্রে সৌন্দর্য বেশ ফুটে উঠেছে, কিন্তু মানস সরোবরের সৌন্দর্য আর বিওয়া হ্রদের সৌন্দর্য এক নয় কাজল কালির নীল সমুদ্র। সমুদ্রের চারিদিকে সবুজ বৃক্ষরাজিতে ঘেরাও করা। তারই মধ্যে নানা রংএর পাল তুলে নাবিকের দল আসা যাওয়া করছে। তারা কোন হ্রদে ভ্রমণ করছে তারাই কি জানে ? তারপর বিকাল বেলা যখন হ্রদের তীরে বের হলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন আমি এক অজানা সৌন্দর্যময় নগরে আনন্দে ভ্রমণ করছি। আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যেন বলছিল, হেঁটে নেও, দেখে নেও, এ জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখবে না।

হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের তীরে একটি কাফি খানায় গিয়ে পৌছলাম। এখানে ইউরোপীয় ধরণে ছোট্ট একটি কাফিঘরে ছোট ছোট পাত্রে দশ সেণ্ট করে কাফি বিক্রি হচ্ছিল। আমি দু'পেয়ালা খেলাম, সংগীকে এক পেয়ালা খাওয়ালাম। তারপর দোকানীকে একটি ইয়েন দিলাম। দোকানী আমাকে সত্তর সেণ্ট ফেরৎ দিল এবং বারে বারে ধন্যবাদ (আরেগাত, গদাই মাছ্‌) বল্‌ল। আমিও তাকে ধন্যবাদ দিলাম। ধন্যবাদ দিয়ে পুনরায় আমরা হ্রদের তীরে পায়চারী করে একটা গাছের উপর গিয়ে বসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল। নীল জলের উপর কোথা হতে ধোঁয়া এসে ছেয়ে ফেল্‌ল। হ্রদের নৌকাগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। উপরের তারকাগুলি ঝল মল করতে লাগল। পাশের বাড়িগুলি হতে বিজলি বাতি প্রজ্বলিত হয়ে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করতে লাগল। আমিও গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম এবং পথে এসে পথিকদের সংগে মিশে গেলাম।

গ্রামের লোক বেশিক্ষণ পথে থাকল না। তারা আপন আপন ঘরে চলে গেল আমিও পুনরায় কাফির দোকানে গিয়ে আর এক পেয়ালা কাফি খেয়ে লজিং হাউসে ফিরে এলাম। লজিং হাউসের মালিকের একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির

বয়স অনুমান বৎসর পনেরো ষোল হবে। সে এতই লাজুক যে আমার সংগে কথা বলার প্রবল বাসনা রেখেও আমার সামনে আসতে পারছিল না। অবশেষে সে তার পিতার শরণাপন্ন হয় এবং পিতা পুত্রকে সংগে করে আমার রুমে এসে বসেন। পিতা নানা ভাষায় পণ্ডিত। রুশ, ফ্রেন্‌চ, ইংলিশ ভাষা তাঁর বেশ জানা ছিল। তিনি ইউরোপে অনেক বৎসর ছিলেন। তিনি ঘরে এসেই আমাকে জাপানী কায়দায় নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করে আমারই বিছানাতে বসতে বল্‌লাম।

ভদ্রলোক সর্বপ্রথমই বল্‌লেন তিনি একবার কলিকাতায় এসেছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্‌সেলর আশুতোষ মুখার্জির সংগে সাক্ষাৎ করেন। ভাইসচেন্‌সেলর মহাশয়ের কথার ভেতর নাকি এমন কতক-গুলি কথা ছিল যা দাম্ভিকতায় পূর্ণ। তিনি বল্‌লেন জাপানীরা মুখে দম্ভ প্রকাশ করে না। আমি কথাটা চাপা দিয়ে বল্‌লাম, সে ছিল এক দিন্, এখন আর সেদিন বোধহয় নেই। তারপরই তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে কতগুলি কথা বল্‌লেন যা এখানে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে হয়।

জাপানীদের মধ্যে নানা ভাষায় সুপণ্ডিত লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এহেন পণ্ডিত লোক সামান্য একটি লজিং হাউস পরিচালনা করেই সুখী থাকছেন দেখে অনেকে হয়ত আশ্চর্যান্বিত হবেন, কিন্তু জাপানে কাজের মর্যাদা দেওয়া বৌদ্ধযুগ হতেই আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের রাসবিহারী রুটির দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলায় অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অনেকে আবার আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ হল এখনও আমরা কাজের মর্যাদা দিতে সক্ষম হইনি।

জাপানী পণ্ডিত আমার কাছে বসেই তাঁর ছেলের জিজ্ঞাস্য কয়টি প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে আদায় করে ছেলেটিকে বিদায় করে দিলেন এবং একটু ভাল করে বসে কিমনোর পকেট থেকে কতকগুলি সিগারেট বের করলেন।

কিমনোর পকেট থাকে হাতে। হাতের কনুইএর দিকে কতকগুলি কাপড় ঝুলে থাকে, তারই মধ্যে পকেট তৈরী করা হয়। সিগারেটগুলি ছিল রুশ দেশের সিগারেটের মত। জাপানীরা বোধ হয় সর্বপ্রথম রুশ প্রথায় সিগারেট প্রস্তুত করা শিক্ষা করেছিল, সেজন্য এখনও তারা বৃটিশ প্রথায় যে সকল সিগারেট তৈরী হয় তা পছন্দ করেনা। পণ্ডিত পকেট হতে রুশ প্রথায় তৈরী কতকগুলি সিগারেট বের করে তারই একটি আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁর সিগারেটটি ফিরিয়ে দিয়ে ইংলিশ প্রথায় তৈরী একটি চেরী সিগারেট মুখে দিলাম। তিনিও রুশ প্রথায় তৈরী সিগারেটটি মুখে দিয়ে একটু হাসলেন। তাঁর হাসির অর্থ আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। সিগারেটের দিক দিয়ে আমাদের জাতের মৌলিকত্ব ছিলনা, সেকথাটা আমিই বললাম। আমার কথা শুনে ডাক্তার সুখী হলেন এবং বললেন, "আপনার এক খানা ভিক্ষাপত্র আমি দেখেছি। আপনি আমাদের দেশে এসেছেন এবং আমাদের দেশের আচার ব্যবহার দেখাই আপনার একমাত্র কাজ সেই ভিক্ষা পত্রে লিখেছেন। আমি আপনাকে আমাদের দেশের খুঁটিনাটি বিষয়ও বলব। কিন্তু এসব কথা বলবার পূর্বে আমি একটি গল্প বলব তা আপনাকে দয়া করে শুনতে হবে।"

আমি বললাম, "গল্প শুনতে আমি রাজী নই, আপনার যদি কোনও সত্য ঘটনা বলার থাকে তবে দয়া করে বলেবেন।"

"নিশ্চয়ই পর্যটক মশাই আমি তাই বলতে যাচ্ছি আপনি দয়া করে শুনুন।"

"আপনাদের দেশে কাণপুর বলে একটি শহর আছে, সেখানে আমি প্রায় পাঁচ বৎসর ডাক্তারী করেছি। সেখানে যখন আমি ডাক্তারী করতাম তখন আমাকে সকলেই চীনা ডাক্তার বলে ডাকত। আমি কখনও নিজের পরিচয় দিতাম না, চীনা ডাক্তার বললেই আমি জবাব দিতাম। ফি খুব কম থাকায় ভারতীয় ডাক্তার নয় ডেকে আমাকে অনেকেই ডাকত।

"এক দিন রাত তিনটার সময় আমাকে এক ধনী ব্যক্তির ঘরে ডাকা হয়। গিয়ে দেখি ধনী ব্যক্তির একমাত্র ছেলের কলেরা হয়েছে এবং সে মরে গেছে বলে তাকে টেনে ঘরের বাহির করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে যাতে সজ্ঞানে রাম নাম করতে পারে সেজন্য তার কাছে বসে একটা লোক রাম নামও বলছিল। আমার পৌছার পর আমাকে আর রোগী দেখতে দেবার দরকার নাই ভেবে ধনী লোকটি আমার ফি দিয়ে বিদায় করতে চাইছিল। আমার প্রাপ্য ফি হাতে নিয়ে ধনী লোকটিকে বল্লাম, 'যদি দয়া করে আমাকে রোগীর কাছে একটু বসতে দেন তবে হয়ত রোগীকে বাঁচাতেও পারব।' ধনী লোকটি তৎক্ষণাৎ রাম নাম কথককে সরে যেতে বল্লেন। লোকটা সরে না গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আর বেশি বাকি নাই, ম্লেচ্ছটাকে কাছে এনে মৃতের অসৎ গতি করতে দেব না।' আমি হিন্দি বেশ বলতে পারতাম এবং এখনও পারি। লোকটার কাছে গিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে দুটি ইন্‌জেকসন দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেলাইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করি। রোগীকে বাইরে পেয়ে ভালই হয়েছিল। গরমের দিনের শীতল বায়ু রোগীর পক্ষে বেশ সহায়ক ছিল। রোগীকে যখন আমি সেলাইন্ প্রয়োগ করছিলাম তখন সে জল খেতে চায়। আমি জল আনতে বলায় কেউ পরিষ্কার জল এনে দিতে রাজি হল না, অবশেষে নিজে কুঁয়া হতে জল উঠিয়ে রোগীকে খেতে দেই।

"রাত্রি বারটা পর্যন্ত আমি ঘরের বাইরেই রোগীকে নিয়ে বসে থাকি। অবশেষে যখন বেশ ঠাণ্ডা পড়তে লাগল তখন রোগীকে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতে বলি। কিন্তু হিন্দু প্রথা মতে যে রোগীকে একবার ঘরের বাহির করা হয় তাকে আর ঘরের ভেতর নেওয়া চলে না। অবশেষে রোগীর জন্য একটা মোটা কাপড় দিয়ে একটা ঘর তৈরী করা হল। অবশ্য আমাকে ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রাত্রি চারটার সময় যখন রোগীর অবস্থা দেখবার জন্য ঘর থেকে কাপড়ের ঘরে এলাম তখন দেখতে পেলাম রোগী

ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপচে। আমি ধনী লোকটাকে ধরে এনে তাঁরই সাহায্যে আমাকে যে বিছানা দেওয়া হয়েছিল সেই বিছানাতে রোগীকে নিয়ে রাখলাম। পরের দিন যখন বুঝলাম রোগীর বিপদ কেটেছে তখন আমি কাণপুরে ফিরে আসি এবং স্থানীয় স্কুলের এক বাংগালী শিক্ষককে গত রাত্রের ঘটনা বলি। শিক্ষক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বলেছিলেন, 'এরূপ ভাবে কত লোক অকালে মরে তার সংখ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব।' আমি বাংগালী শিক্ষককে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম; 'তবুও আপনাকে বলতে হবে বৎসরে এরূপ ভাবে কতলোক মরে?' শিক্ষক বলেছিলেন, 'দশ লক্ষেরও বেশি।' এখন বুঝে নিন আপনারা বৎসরে কত লোক হত্যা করেন। রুশ জাপান যুদ্ধে, চীন জাপান যুদ্ধে এবং বর্তমানের চীন মান্‌চুকো যুদ্ধে যত সেপাই মরেছে তাদের সব একত্র করলেও দশ লক্ষ হবে না। শুনেছি আপনাদের দেশের লোকরা নরহত্যাকারী বলে আমাদের ঘৃণা করে এবং যা ইচ্ছা তাই বলে, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের অজ্ঞানতার জন্য বৎসরে যত লোক মরে আমাদের সৃষ্ট তিনটি যুদ্ধেও তত লোক মরে নি। আপনারা নরহত্যাকারী নন্ ত নরহত্যাকারী আর কে হতে পারে? কুসংস্কারকেও আমরা একটা অস্ত্র বলি। বন্দুক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রের চেয়ে কুসংস্কার আরও ভয়ানক অস্ত্র এবং তার দ্বারা যেমন সহজে নরহত্যা হয় তেমনটি আর কিছুতে হয় না।

"তারপর যুদ্ধের কথা বলে আপনাদেরর দেশের লোক ইউরোপ এবং জাপানকে শাসিয়ে বলে 'যে সভ্যতার পেছনে রয়েছে কেবলই যুদ্ধ সে সভ্যতা আমরা চাই না।' সভ্যতা চাইবে কেমন করে বলুন? যাদের মন রয়েছে কুসংস্কারে ভর্তি তারা যুদ্ধ কাকে বলে তাও বোঝে না। গত মহাযুদ্ধে গণ-শক্তির শক্তি বাড়ল তা আপনি বুঝতে পেরেছেন কারণ আপনি চীন ভ্রমণ করে এসেছেন এই মাত্র, আমাকে বলেছেন। আগামী যুদ্ধে অনেক পরাধীন দেশ স্বাধীন হবে এবং সেই নূতন স্বাধীন দেশগুলি একটু শক্তিসম্পন্ন

হতে না হতেই পৃথিবী জুড়ে আর একটি যুদ্ধ বাধবে তা হবে গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর সকল দেশেই আপন আপন রূপে ব্যক্ত হবে। সেই গৃহযুদ্ধ হতেই হবে পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। পৃথিবীর তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর দেখবেন আর একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশেরও সাম্রাজ্য থাকবে না। তখন হবে সঠিক গণ জাগরণ। যখন গণ জাগরণ হবে তখন আবার গৃহযুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধ ভারতে এমন এক গণ সংগ্রামে পরিণত হবে যে, পৃথিবীতে যুদ্ধক্ষেত্রে যত লোক মরবে তার অন্তত দশগুণ মরবে আপনাদের দেশে। তখন আসবে আপনাদের দেশের সঠিক স্বাধীনতা। তখন আপনাদের দেশে একটিও ধর্ম থাকবে না। ভারতের লোক এতই ধর্মবিদ্বেষী হবে যে জগতের লোক গিয়ে যদি তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করে ধর্মস্থানগুলি রক্ষা করতে বলে তবুও তা রক্ষা করা যাবে না।"

অনেকক্ষণ লোকটির কথা চিন্তা করে পিস্তলটি তাঁর হাতে ফেরত দিলাম এবং বললাম, "পণ্ডিত প্রবর, আপনি আজ যা বললেন আমাকে চীন দেশে আর একজন পণ্ডিতও সেরূপই বলেছেন, তবে তিনি কমিউনিষ্ট আর আপনি জাতীয়াতাবাদী এই যা প্রভেদ।" পণ্ডিত ঘর হতে বের হবার পূর্বে বললেন 'কোনও জাতীয়তাবাদীর এতটুকু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকতে পারে না মিষ্টার পর্যটক।" পাশে রক্ষিত পিস্তলটি সংগে করে নিতে ভোলেন নি।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে যাব ভাবছিলাম কিন্তু নানা বিষয়ে পণ্ডিত লজিং হাউসের মালিক এসে বললেন, "আজও এখানে থেকে হ্রদের সৌন্দর্য উপভোগ করে যান। আপনাকে আমি একটুও বিরক্ত করব না। আজ একটা নূতন কথা আপনাকে শোনাব। চলুন আপনার প্রিয় কফির দোকানে যাই।" আমরা সকলেই সেখানে গেলাম। তখনও সকালের আমেজ শেষ হয়নি। তখনও শিশির বিন্দু নানা রকমের পাইন বৃক্ষের পাতায় পাতায় মুক্তার মত ঝকমক করছিল। তখনও কফি প্রস্তুত করার জন্য গরম জল তৈরী

হয়নি। আমরা কাফে গৃহে বসার পর দোকানী আমাদের জাপানী মিষ্টি এনে দিল। আমরা তাই খেতে খেতে কফির জল তৈরী হল এবং কফি খেয়ে যখন মন প্রফুল্ল হ'ল তখন জাপানী ভদ্রলোক যাঁকে আমি পূর্বে পণ্ডিত লোক বলেছি তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "জাপানে নারীর সম্মান নেই বলে পশ্চিম দেশের লোক চিৎকার করে। আমরা তাতে প্রতিবাদ করি না, আমরা জানি জাপানে নারীর সম্মান নেই। তবে অতিসত্বরই জাপানী নারী ইউরোপীয়ান্ নারীর সমতা লাভ করবে। এখন বলুন ত আপনাদের দেশের নারীর অবস্থা কী ?"

আমি পণ্ডিতের কথার জবাব দিতে সক্ষম হলাম না, কারণ বিদেশে গিয়ে স্বদেশের নাম বজায় রাখতে অনেক সময়ই মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে। আজ এই ভদ্রলোকের কাছে আর মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা হল না।

আমাকে নীরব দেখে জাপানী ভদ্রলোক বল্লেন, "বুঝতে পেরেছি, আপনি কথা বাড়িয়ে বলতে চান না। ইরাণ ও আফগানিস্থানের সীমান্তে আমি অনেক বৎসর কাটিয়েছি। সেখানেও আমি চীনা ডাক্তার বলেই পরিচিত ছিলাম। সেখানে দেখেছি, সিয়া শ্রেণীর স্ত্রীলোককে সুন্নিরা বিয়ে করবার জন্য চুরি করে নিয়ে যায়। স্ত্রীলোক চুরি করার সময় পাঠান এবং আরবগণ শিশুহত্যা করতেও কসুর করে না। আর আপনাদের দেশে দেখেছি হিন্দুর স্ত্রীলোক মুসলমান চুরি করে নিয়ে বিয়ে করে। হিন্দুরা ইজ্জত যাবে বলে কিছু বলে না। বলুন ত আমাদের দেশে সেরূপ কিছু দেখতে পেয়েছেন কি না ? আমাদের দেশে সেরূপ হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবেনা কারণ জাপানী পুরুষ নারীর সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

"আমাদের দেশে বারবনিতা আছে, গেইসা আছে, ইউরোপের কোন সভ্যদেশে তা নাই ? যখন আপনি আমেরিকায় যাবেন তখন দেখবেন দরজায় রাত্রে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে আর জিজ্ঞাসা করছে 'Do you want a partner ?' আপনি কি সংগী চান ? এসব স্ত্রীলোকও বারবনিতা একথাট

আপনার জানা উচিত। তবে আর আমাদের স্ত্রীলোকদের দোষ দিয়ে লাভ কি ? মিষ্টার ইয়ামতোর মত লোক আপনাকে আমাদের দেশের বদখত বিষয়গুলি ধরিয়ে দেবে তা আমি জানি। তারা যে আপনার পেছন নিয়েছে সে সংবাদও অনেকে অবগত আছে, তা বলে আপনি পথ চলার বাধা পাবেন না। আপনার কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ, যখনই সাম্রাজ্যবাদী জাপানের কথা ওঠাবেন তখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীর কথা ভুলবেন না এবং পারলে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীর সংগে জাপানকে তুলনা করতেও ভুলবেন না। একদেশ-দর্শী হয়ে যদি জাপানকে অনবরত বকতে থাকেন তবে আপনার কথার মূল্য থাকবে না।

—"জাপানকে আজকাল সকলেই ফ্যাসিষ্ট বলে, আমি তা স্বীকার করি এবং জানি জাপান ফ্যাসিষ্ট বই আর কিছুই নয়। কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত একশত বৎসর পূর্বে যদি আমরা কোরিয়া এবং মান্‌চুরিয়া দখল করে নিতাম তবে কেউ আমাদের ফ্যাসিষ্ট বলত না। সময়ের পরিবর্তনে একদা যা সাম্রাজ্যবাদ বলে পরিচিত ছিল, আজ সেই কথাটাই ফ্যাসিবাদে পরিণত হয়েছে। জাপানের ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ আপনি যে শব্দই ব্যবহার করুন এসব জাপানীরা শিখতে বাধ্য হয়েছে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। একশত বৎসর পূর্বে জাপানীরা বিদেশে যাওয়া পাপ মনে করত। জাপানীরা তাদের নিজের সাগরের চারিদিকে মৎস্য শিকার করে সুখী থাকত। অনেক জাপানী চীনা সামুদ্রিক দস্যুর সংগে মিশে বিদেশে গিয়ে দস্যুতা করে বেশ ধনরত্ন নিয়ে আসত। জাপান সম্রাট যদি বৃটিশ সম্রাটের মত এই দস্যুর দলকে প্রশ্রয় দিতেন তবে দুইশত বৎসর পূর্বে জাপানীদেরও বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। অবশেষে যখন সামুরাইগণ দেখলেন যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে যদি পা বাড়িয়ে না চলা যায় তবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হবে না তখন জাপানী সামুরাই এবং ব্যবসায়ীরা সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

"শুধু তাই নয়। পিটার দি গ্রেটের সময় থেকেই পূর্ব দেশ অভিযানে রুশরা তৎপর ছিল। অবশ্য তাদের কেউ বলে দেয়নি পূর্বদেশ অভিযান করতে। সাধারণ প্রজা থেকে আরম্ভ করে রুশিয়ার ধনী সম্প্রদায়ও পূর্বদেশের গুণ গরিমা জানত এবং পূর্বদেশগুলি লুটে নেবার জন্য চেষ্টা করত। ক্রমেই রুশরা চীনাদের সাইবেরীয়া হতে কিরিণ, হাইলসেংকী প্রভৃতি স্থানে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। রুশরা ভাবছিল যখন তারা সিংগোরী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত করায়ত্ত করবে তখন তারা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হবে। কোরিয়াদেশে রুশদের লুট করা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অনেক কোরিয়ান জাপানে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এসব দেখেশুনে যদি আমাদের চক্ষু না খুলত তবে আমরাও আপনাদের মতই দাসখতে নাম লিখিয়ে এতদিন কার পদানত হয়ে থাকতে বাধ্য হতাম সেকথা যদিও এখন কল্পনার অতীত তবুও ভাল করে মাথা ঠিক রেখে যদি চিন্তা করা যায় তবে মনে হয়, হয় পর্তুগীজ নয় ডাচরা আমাদের দেশ দখল করে সুখে রাজত্ব করত।

"উন্নতির দুটি দিক আছে। ভালর দিকে এবং মন্দের দিকে। যদি বৃটিশের উন্নতি তাদের মংগলের দিকে হয়ে থাকে তবে আমাদের উন্নতিও আমাদের মংগলের জন্যই হচ্ছে। যদি বৃটিশের একদিন পতন হয় তবে আমাদেরও পতন হবে। বৃটেন স্কচ, আইরিশ ও ওয়েলস্‌দের জয় করে এখন একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আজও আইরিশরা ইংলিশের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি হচ্ছে না। ডি ভেলেরা স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ড স্থাপন করেছেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বৃটিশের রাজ্য খসে পড়ছে, আমাদের বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদেরও খসে পড়তে কতক্ষণ ?"

কফি খাওয়া হয়ে গেলে আমরা লজিং হাউসে ফিরে এলাম এবং লজিং হাউসের মালিক আমাকে দুখানা বই দিয়ে "বললেন বই দুখানা পড়ুন। একখানা বইও জাপানীদ্বারা লিখিত নয়, কিংবা জাপানে ছাপানো হয়নি। বই ছাপা

হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। পাবলিশার মহাশয় ভয়ানক চালাক লোক, পূর্ব দেশের কোন প্রতিভাই স্বীকার করতে রাজি নন্। তবুও রুশ ভাষা হতে বইখানা অনুবাদ করে ইংলিশে ছাপানো হয়েছে। কেন ছাপানো হয়েছে তারও তাৎপর্য আছে।" পণ্ডিত বললেন, "আমি যখন লণ্ডনে ডাক্তারী করতাম তখন এই দুই খানা বই আমি পুরাতন পুস্তকের দোকান হতে ক্রয় করি এবং পারশেল করে আমার লাইব্রেরীতে রাখবার জন্য পাঠিয়ে দেই। আমার লাইব্রেরী যদিও কোবেতে অবস্থিত তবুও মূল্যবান বইগুলি নিজের কাছে রাখতে ভালবাসি বলেই, আজ আপনাকে বই দুখানা পড়তে দিয়ে সুখী হতে পারলাম।"

বুঝলাম এখানে আরও কয়েক দিন থাকতে হবে। আমিও আরাম করে বই দুখানিতে মন দিলাম। আমি তাড়াতাড়ি কোনও ভাল বই শেষ করতে পারি না। আমি যখন চীন দেশে মার্ক্সবাদ পড়তাম তখন এক একটি প্যারা বুঝতে দুদিন পর্যন্ত লেগে যেত, সেজন্য আমি মার্কসবাদের বই কোনটাই শেষ করতে পারিনি। আবার কোন বইএর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতেও সময় হয়ে ওঠেনি। বইএর মাঝখান থেকে যখন যে কোন পাতা পড়েই বইখানা ফেলে দিতাম। কিন্তু আজ প্রথম পাতা হতে শেষ পাতা পড়তে ইচ্ছা হল। প্রথম বই খানা যা হাতে নিয়েছিলাম তা শেষ করতে দুদিন লেগেছিল। দ্বিতীয় বইখানার মাঝ খানের দুপাতা পড়েই স্থান ত্যাগ করি। প্রথম বইএ ছিল কি করে চীনারা প্রশান্ত মহাসাগরে বাণিজ্য করত, চীনাদের সংগে পর্তুগীজদের লড়াই, জাপানীদের চীনাদের সংগে থাকা এবং ব্যবসা করা, চীন জাপানীর সাগালিন অভিযান এবং স্থানীয় লোকের প্রতি অত্যাচার, চীনা এবং জাপানীদের ফরমোজা দ্বীপে অবতরণ এবং সেখানে তাদের ফরমোজাবাসীদের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি। দ্বিতীয় বই খানাতে ইউরোপীয়ানদের এশিয়াটিকদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ ছিল।

অত্যাচার মানুষের প্রতি মানুষের চলছে। এই পাপ হতে রেহাই কি ক
পাওয়া যায় তাই নিয়ে লজিং হাউসের মালিকের সংগে কথা হয়। আ
ভাবছিলাম তিনি সাম্রাজ্যবাদী ধরণে ধর্মের দোহাই দেবেন, কিন্তু তিনি ত
না করে বললেন, "অত্যাচার চলেছিল, অত্যাচার চলছে এবং চলবে। ক
দিয়ে বেশি নেওয়াই তার একমাত্র কারণ যদি বলা হয় তবে দোষ হবে, কি
না দিয়ে সবই নিয়ে যাওয়াই হ'ল তার একমাত্র কারণ। এসব দেনা পাওনা
হিসাব বর্তমানে আমরা যে প্রক্রিয়াতে করছি তা না করে যদি আমাদে
পূর্বপুরুষের প্রথা অবলম্বন করি তবেই সকল বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যে
পারে, কিন্তু সেই স্তরে ফিরে যেতে হলে নানারূপ উন্নতি করতে হবে।" পশ্চি
দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা যেমন করছে, এটাই হল প্রথম স্তর। এ স্তরে
পৌঁছানোই সকলের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। এ দিকে এগিয়ে যাও
আমাদের পক্ষে কখন সম্ভব হবে তা বলা খুবই কঠিন।" (ভদ্রলোক ১৯৩
খৃষ্টাব্দে কথাগুলি বলেছিলেন। আমার মনে হয় জাপানে যেরূপভাবে ও
পালট হতে আরম্ভ হয়েছে তাতে জাপান অতি সত্বরই প্রলিটারিয়েট ডিক্টেটর
সিপের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। আমেরিকা জাপানে ডেমোক্রেটি
সম্রাট রাখবার চেষ্টা করবে সত্য কথা, কিন্তু জাপানীরা যদি তা না চায় ত
আমেরিকার পক্ষে জাপান সম্রাটকে তক্তে বসিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।)

ইস্‌লামের খলিফার প্রতি যেমন সাধারণ আরবদের আর ভক্তি নাই, তেম
জাপানবাসিন্দা জাপানীদেরও সম্রাটের প্রতি সম্রাট হিসাবে ভক্তি নাই
এখন জাপানীরা বুঝতে পেরেছে তাদের দেশের শাসক শ্রেণীর লোক তাদের প্র
কত অন্যায় করেছিল, কত মিথ্যা বলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও জাপানীদে
অন্ধকারে রাখবার চেষ্টা করেছিল।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কোবেতে পৌঁছে যখন শীতে থর থর করে কাঁপ
কাঁপতে ইণ্ডিয়া হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম তখন কলকাতার পাশেই পাইক

াাড়া নিবাসী মিষ্টার কিশোরীমোহন সুরকে বসবার ঘরে একটু আগুনের াাবস্থা করে দিতে বলেছিলাম। ভদ্রতার খাতিরে মিষ্টার সুর কোথা হতে াামান্য কয়লা এনে উনুনে ঢেলে দিয়েছিলেন। এর পরে কিন্তু আমাদের আর াারে টেঁকা মুস্কিল হয়েছিল। যতবারই কয়লার কথা খুকসানকে বলেছি তবারই খুকসান্ "কোল কণ্ট্রল" বলে চলে যেত। যাদের দেশে তখনও ুদ্ধ এসে হানা দেয়নি তাদের এরূপ দৈন্য দেখে মনে হয়েছিল চীন-জাপান ুদ্ধের জন্যই জাপান এত কষ্ট পাচ্ছে। দূর থেকে অনেকে জাপানের দৈন্য ুঝতে পারত না। তখনও জাপান বিনা বাধায় সিংগাপুর, বাতাভিয়া হতে রবার নিয়ে যেত। কিন্তু সেই রবার দিয়ে সাধারণ লোকের জন্য জুতা তৈরী হত না তৈরী হত ভবিষ্যৎ যুদ্ধের উপকরণ। জাপানী যুদ্ধ-উদ্যোক্তারা জাতির সহনশীলতার প্রতি না তাকিয়েই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

পূর্বে বলেছি জাপানী যুবকগণ কখনও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করতনা, কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কোবেতে পৌছার পর ওসাকা মায়ানিচি নামা এক সংবাদপত্রে এক বর্বর যুবকের অবর্ণনীয় বর্বরতা প্রকাশ পেয়েছিল। সে একটি যুবতীর প্রতি কি বর্বরতা করেছিল তা বলব না, কিন্তু যাদের মধ্যে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন বর্বরতা, ছিলনা তাদের দেশের (অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে) যুবকটি হঠাৎ এত বর্ব্বর হল কেন? যুবক ছিল ধর্মে বৌদ্ধ, পুনর্জন্ম সে বিশ্বাস করতনা, আর যুবতী ছিল ধর্মে সিনটো, পুনর্জন্ম বিশ্বাস করত। এই নিয়েই তাদের মধ্যে তর্ক হয়। সাধারণতঃ এসব তর্কের মীমাংসার জন্য কেউ চেষ্টা করে না। কিন্তু জাপানের দুর্দশা দেখা দিচ্ছিল, সেইজন্যই ধর্ম-সম্বন্ধীয় তর্কই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বর্বরতার মুখ্য কারণ।

বেওয়া হ্রদে নৌকাতে উঠে ভ্রমণ করার কথা হোটেলের মালিক আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁর কথায় রাজি হইনি, তাঁকে আমি বলেছিলাম "এসব আরামদায়ক ভ্রমণ ধনী মহাশয়রা করবেন। আমাদের মত লোকের পক্ষে

এসব কাজ শোভা পায়না। আপনাদের দেশ আমি কতকটা দেখেছি, তাে
বুঝতে পেরেছি আপনারা সুখী নন্। আপনাদের পক্ষেও এসব সৌখী
ভ্রমণ শোভা পায় না।"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চে
থাকলেন এবং কতক্ষণ পরে বল্লেন "আপনি যেমনভাবে মনের কথা ব
যাচ্ছেন আমরা সেরূপ পারিনা। আমাদের দেশের আইন এবং আমাদে
দেশের লোক তা পছন্দ করে না। তাদের মনে শাসকশ্রেণীর লোক এমন
এক শিক্ষা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যাতে তারা সব ভুলে গিয়ে নিজের দেশ, নিজে
জাত এবং নিজের সম্রাটের কথাই ভাবতে শিখছে। তাদের আত্মীয় এ
তাদের স্বজন কিরূপে জীবন কাটাচ্ছে সেকথা ভাববারও ফুরসত তারা পায় না
আপনার মত যদি আমরা প্রকাশ্যে এরূপ কথা বলি তবে পুলিশের বি
দৃষ্টিতে পড়ব এবং যা আছে তাও রক্ষা করতে পারব না।" তারপর
ভদ্রলোক অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন "ঐ যে দেখছেন বাড়িটা, ত
মালিক ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত লোক। তিনি প্রায়ই কোরিয়ার উত্ত
অঞ্চলের (YUKI) ইউকি শহরে থাকতেন এবং গোপনে সীমা
পার হয়ে গিয়ে সোভিয়েট রুশদের কার্যকলাপ দেখতেন। একদিন ফেরব
পথে তিনি ধরা পড়েন এবং একেবারে স্বগ্রামে প্রেরিত হন। তারপর থে
তাঁর ওপর প্রায়ই জরিমানা হতে থাকে। যতদিন পারছিলেন ততদিন তি
জরিমানা দিয়ে যান, তারপর যখন জরিমানা দেবার ক্ষমতা থাকল না, তি
তাঁর বাড়িখানা বিক্রি করে ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে লাগলেন। তাতে
সরকার সুখী হলেন না। তাঁকে জেলে দেওয়া হল, এখনও বোধ হয় জে
আছেন। আমাদের দেশে জেলের সংবাদ বাইরের লোককে দেওয়া হয় না
সেজন্যই বলছি তিনি বোধহয় এখনও জেলেই আছেন। এখন বোধহয় ভা
করেই বুঝতে পারছেন আমরা কিরূপ স্বাধীন দেশে বাস করছি।"

সকাল বেলা সূর্য ওঠার সংগে সংগেই আমি পথে এলাম এবং একটি ঝাড়ি পথ ধরে চলতে লাগলাম। কতক্ষণ যাবার পরই দেখতে পেলাম আমার সামনে এবং পেছনে ছুজন লোক সাইকেল করে চলেছে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল গতরাত্রের কথা। হোটেলের মালিক তাঁর নাম আমার কাছে বলেন নি এবং তার কৈফিয়তও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আগামী কল্য হতে আপনার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা হবে। কারো সংগে সহজে মুখ খুলে কথা বলবেন না।" দুজন লোককে আগে পিছে চলতে দেখে আমার একটু ভয় হয়েছিল, কি জানি যদি ধরে নিয়ে ডিপোর্ট (Deport) করে দেয়। সেজন্য ধীরে চলতে লাগলাম।

কতক্ষণ যাবার পরই পথে এল কতকগুলি চা-বগোন। জাপানের চা-বাগান আমাদের দেশের চা বাগানের মত বড় নয়। তবুও মাইল-লম্বা চা-বাগানের অভাব নেই। আমি যখন চা-বাগানের ভেতর দিয়ে চলছিলাম তখন কতকগুলি তরুণীকে চা তুলতে দেখতে পেয়ে এক স্থানে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। তরুণীরা তাদের হাতের কাজ রেখে আমার কাছে এসেছিল এবং আমার প্রতি অনেকক্ষণ চেয়ে রয়েছিল। তারা কি ভাবছিল তা জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমাদের দেশের চা-বাগানের কুলিদের কথা। জাপানী তরুণীদের প্রত্যেকের পায়ে উঁচু রবারের বুট ছিল। হাতে দস্তানা ছিল। প্রত্যেকের শরীরে লাবণ্য ছিল। প্রত্যেক মজুরকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা মনের আনন্দে কাজ করছে। তারা প্রত্যেকে দৈনিক এক ইয়েন কুড়ি সেণ্ট করে পেত। তখনকার দিনে দৈনিক এক ইয়েন কুড়ি সেণ্ট বর্তমানের পঞ্চাশ ইয়েনের সমান। যাদের পায়ে রবারের লম্বা বুট এবং হাতে আঙ্গুল কাটা দস্তানা থাকে তাদের প্রতি চা-বাগানের মালিক কতটুকু দয়াপরবশ তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। আর আমাদের দেশের চা-বাগানের কুলি খালি গায়ে খালি পায়ে যখন চা-বাগানে কাজ করে তখন তারা বাবুর কাছে যেমন "শুয়োর কি বাচ্চা" শুনতে পায় তেমনি

পদাঘাত পায় ম্যানেজারের কাছ থেকে।

আমার ইচ্ছা হল আজ শহরে না গিয়ে চা বাগানের কুলিদের গ্রামেই থাকি। সংগে দুটা লোক চলছিল, তাদের কখন দেখতে পাচ্ছিলাম আর কখন পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম এদের বলব, "আজ আমি কুলি গ্রামেই থাকব," কিন্তু এদের দর্শন না পেয়ে কুলিগ্রামের এক লজিং হাউসে গিয়ে উঠলাম এবং খাওয়া থাকা বাবদ লজিং হাউসের মালিককে দুই ইয়েন দিয়ে বললাম, "আমি নিজেই পাক করব, মাছ এবং সবজি নিয়ে আসুন।" লজিং হাউসের মালিক তৎক্ষণাৎ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সংগে বাজারের দিকে রওয়ানা হলাম।

পথে সারি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর। ঘর অনেকগুলি, বোধ হয় পাঁচ শতের কম হবেনা। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে ছোট ছোট বাগান। বাগানে নানারূপ ফুলের গাছ। ফুলের গাছগুলি টবে ছিল। টবে ফুলের গাছ দেখে মনে হল, ঘরগুলি চা বাগানের মালিকের এবং কুলিদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বসতির মধ্যস্থলে ছোট্ট একখানা বাজার। বাজারের সৌন্দর্য অপরূপ। মাছের দোকানগুলি এমনই পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে যে দেখলেই মাছ কিন্তে ইচ্ছা হয়। যদিও জাপানে কই, মাগুর এবং সিং মাছ পাওয়া যায় না তবুও সেই জাতীয় মাছ প্রচুর আছে, কিন্তু প্রকাশ্য বাজারে যে মাছের আঁশ নাই তা বিক্রি করা হয় না। অনেকে আঁশ-হীন মাছ দেখতেও ঘৃণা করে। মাছের পাশেই শাক সবজী। নানা রকমের শাক সবজী স্তরে স্তরে সাজানো ছিল। আমি কতকগুলি মিষ্টি লংকা এবং দুটা বেগুন কিনে নিলাম। মাংসের দোকানগুলি খোলা ছিল। মাংসের দোকানগুলি আমেরিকান ধরণে সাজানো। মাংসের শ্লাইস্‌গুলি এমনি সুন্দর করে সাজানো রয়েছিল দেখলেই কিন্‌তে ইচ্ছা করে। শ্লাইস্‌গুলি দেখে চিনবার উপায় ছিলনা কোনটা কিসের মাংস। জাপানীরা আমেরিকান্ ধরণে অনেক কিছু করেছিল। বাজারকে আমেরিকান্ ধরণে

াজানোও তার মধ্যে একটি।

বাজারের এক পাশে বসে একটা লোক জুয়া খেলছিল এবং বেশ লাভবান হচ্ছিল। তারই পাশে একটা বস্ত্র বিক্রেতা নানারূপ সুর করে তার বস্ত্রের বর্ণনা করছিল। সমস্ত বাজারটার মধ্যে শুধু এই বস্ত্র বিক্রেতাটাকেই চিৎকার করে কথা বলতে দেখতে পেলাম।

বাজার করা হয়ে গেলে লজিং হাউসে পাক শেষ করে ভাবলাম হয়ত লজিং হাউসের মালিক আমার রান্না করা খাদ্য কিছুটা খেতে চাইবে। যখন খেতে বসলাম তখন দেখলাম আমি যা পাক করেছি তার সবটাই নিয়ে এসেছে। সবটা না নিয়ে অর্ধেকটা লজিং হাউসের মালিককে দিয়ে দিলাম। রাত্রে বাড়িওয়ালী জানিয়েছিল, আমার পাক বেশ হয়েছে এবং আবার যদি রান্না করি তবে তারা সুখী হবে।

আমার মন কিন্তু খাদ্যের দিকে ছিলনা। আমি জানতে চাইছিলাম জাপানী স্ত্রীমজুরগণ কেমন ভাবে জীবন কাটায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় যাঁরা জাপানী মহিলাদের সম্বন্ধে অপবাদ শুনেছেন তাঁদের বলছি যুদ্ধের সময় প্রপাগেণ্ডারূপে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায়। আমিও যুদ্ধের সময় একবার লেকচার নফরে বের হয়েছিলাম, কিন্তু যেদিন বুঝতে সক্ষম হলাম আমার লেকচার সর্ব-সাধারণ প্রপাগেণ্ডা লেকচাররূপেই গণ্য করছে সেদিন থেকে লেকচার দেওয়া বন্ধ করেছিলাম। এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাপান পরাজিত হয়েছে, এখন জাপান সম্বন্ধে সত্য কথা বললেও দোষের হবেনা বলেই বলছি, জাপানের তখনকার দিনের স্ত্রীমজুরদের দেখে আমার শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠত। মজুর সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক তাদের কামদেবের অন্যায় আরাধনা করবার সময় থাকেনা। ঘরে এসেই তারা শুতে পারলেই বাঁচে। এর একটা কারণও আছে। আমাদের দেশে কয়েক বৎসর হল পাড়াগাঁয়েও ঘণ্টা হিসাবে কাজ

করার নিয়মটা একটু প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে তা ছিলনা। জাপানেও চা-বাগানের মজুর ঘণ্টা হিসাবে কাজ করত না। তাদের কাজের হিসাব ছিল সকাল সন্ধ্যা। যারা সকাল সন্ধ্যা কাজ করে তারা কি করে কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে তা আমার মাথায় আসে না। পূর্বেই বলেছি জাপানের লোক তাদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য গ্রীন হাউসে যায়। এখানে সেরূপ কিছুই ছিল না। সকলেই কর্মরত, সকলেই গৃহস্থ।

আমার দ্বিপ্রহরের খাওয়া বেলা চারটার সময়ই হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া শেষ করে সামান্য একটু বিশ্রাম করলাম, তারপর গ্রামে ভিক্ষার্থে বের হয়ে পড়লাম। সংগে ভিক্ষাপাত্র মাত্র একখানা নিয়েছিলাম। ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা করলে যদি পুলিশে দেখে ফেলে সেই ভেবে গ্রাম্য চায়ের দোকানে গিয়ে বসাই ভাল বিবেচনা করলাম। গ্রাম্য চায়ের দোকানে গেইসাগার্ল দেখতে না পেয়ে মনে হল, এটা প্রকৃতই গ্রাম, এখানে পাপীর প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয়, এখানকার চায়ের দোকানে একটি নারীকেও দেখতে পেলাম না। কতকগুলি পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে তাদের পিতারা চায়ের দোকানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা একের সংগে অন্যে খেলা করছিল, আর পুরুষগুলি চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছিল। সন্ধ্যা হবার পূর্বেই চায়ের দোকান একেবারে খালি হয়ে গেল। দোকানী তার দোকান পরিষ্কার করতে লেগে গেল, আমিও তার দোকান পরিত্যাগ করে লজিং হাউসে চলে এলাম।

সন্ধ্যার পর লজিং হাউসে এসে দেখি দুজন পুলিশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথম তাদের দেখে একটু ভয়ই হয়েছিল। পরে যখন একজন পুলিশকে ইংলিশ বলতে সক্ষম দেখতে পেলাম তখন আমার ভয় অনেকটা কমে গেল। আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, "বিদেশে শুনেছি জাপানী স্ত্রীলোকগণ বড়ই

্যাভিচারী, তাদের সতীত্ব বলে কোন জ্ঞান নাই, কিন্তু আজ এই মজুর রমণীদের মুখ দেখে মনে হল যা শুনেছি তার সবই মিথ্যা এবং প্রপাগেণ্ডা।" পুলিশটি জিজ্ঞাসা করল, "এরূপ কথা কোথায় শুনেছেন মহাশয় ?" 'কেন কোরিয়াদেশে আমেরিকান্দের কাছে। তারাইত জাপানীদের কুৎসা বিশেষ করে রটায়। শুধু তাই নয় আমাদের দেশের কুৎসাও আমেরিকান্‌রা রটাচ্ছে। তা বলে আমরা আমেরিকান্দের পরওয়া করিনা।" জাপানী পুলিশ আমার কথায় সুখী হল এবং জিজ্ঞাসা করল "আপনি বলুন কিভাবে বাগানের মজুর রমণীদের পরীক্ষা করতে চান ?" আমি বল্লাম "রাত্রে আমি গ্রাম্য পথে বের হব এবং সামান্য পাইচারী করেই বুঝতে পারব গ্রামের কি অবস্থা।" পুলিশদ্বয় আমাকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিল। আমি রাত্রে একটু বেরিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমি যেন এক ঘুমন্ত দেশে একাকী ভ্রমণ করছি। হায়রে মিথ্যা, তুমি সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটে লেখকদের লেখনীতে যেমন চঞ্চলগতিতে ভ্রমণ কর তেমনটি কিন্তু অন্যের লেখনীতে কর না। সাম্রাজ্য-বাদীদের ভাড়াটে লেখক ক্ষণস্থায়ী সুখ সুবিধার জন্য পাপের পথে এত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয় যে, সময়ের গতিও তার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

জাপান মান্চুরিয়া দখল করেছিল, এবং মান্চুরিয়ার বুকের উপর ঘুঘু চরাচ্ছিল সেকথা কোনও আমেরিকান অথবা ইংলিশ লেখক লিখতে সাহস করেননি, কারণ যদি তাঁরা তাই করতেন তবে তাঁদের খানাপিনা বন্ধ হয়ে যেত। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের গলদ প্রকাশ হয়ে যাবে সেজন্য ভাড়াটে লেখকদের তারা নিযুক্ত করল জাপানী চরিত্রে কলংক লেপন করতে।

গ্রামে রাত্র কাটিয়ে পরের দিন দ্বিপ্রহরে নাগয়া নামক বিখ্যাত শহরে পৌছে একটি ভাল হোটেলে স্থান নেই এবং রেল ষ্টেশনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসি। নাগয়াতে পৌছেই মনে হ'ল অনেকদিন ডায়েরী লেখা হয়নি। আজ ডায়েরী লিখেই বিকাল বেলাটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু মানুষ যা করতে চায় সকল সময় তা পেরে ওঠেনা। আমার ডায়েরী লেখাও সেদিন সম্ভব হয়নি। সারাটা বিকাল বেলা বিশ্রামেই কেটে গিয়েছিল। বিশ্রাম যখন শরীর চায় তখন আর কিছুই ভাল লাগেনা।

ইয়াকোহামার পথে

পরদিন সকাল বেলা স্থানীয় প্যালেস্ দেখতে গেলাম। এখানকার প্যালেসও অন্যান্য প্যালেসের মতই। এখানেও প্যালেসের উপরিভাগে দু স্বর্ণ মৎস্য দেখতে পেয়ে সুখী হলাম। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারে বাড়ির সামনে, প্যালেসের উপরে মৎস্য এঁকে রাখা অথবা ধাতব পদা দিয়ে তৈরী করে রাখা কি জাপানীরা শুভ লক্ষণ মনে করে? যেদে বিধবার পুনরায় বিবাহ হয়, যেদেশের লোক গতর খাটিয়ে রোজগার কর পারলে সুখী হয়, যেদেশে মরণকে সকলেই তুচ্ছ করে সে দেশে শুভ এ অশুভ বলে কিছু নেই। গুড্ লাক, ব্যাড্ লাক আমাদের দেশের লোকে জন্য আর ইউরোপীয় ধনীদের জন্য আর কারো জন্যে নয়।

নাগয়া শহরে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আমি সেখা দুদিন মাত্র ছিলাম। অতএব আমার পক্ষে কথিত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দে সম্ভব হয়নি। আমার পূর্বপরিচিত গিল্‌ফিলন বলে এক অষ্ট্রেলিয়ান্ এক জাপানী স্ত্রীলোককে বিয়ে করে এই শহরেই বসবাস করছিলেন। তঁ সংগে পথে দেখা হয় এবং তিনি জাপানী চরিত্রের কিছুটা বিশেষত্ব আম কাছে বলেন। জাপান আমাদের দেশের মত জনবহুল দেশ। জমি এ বাড়ি যদি ভাগ করা হয় তবে ভাইদের মধ্যে চারহাত করেও বাড়িতে অ পাওয়ার সম্ভব হয় না। সেজন্য ভাই-এ ভাই-এ যখন মনের অমিল হয় তখ পিতৃ-সম্পত্তির লটারী করা হয়। যে ভাই পিতৃ-সম্পত্তি পায় সেই বাড়ি থাকে আর সকলেই তৎক্ষণাৎ পিতামাতার বাড়ি ত্যাগ করে পথে বের হ আসে। সাধারণত লটারী সকাল বেলাতে করা হয় এবং যখন বিত্তই

ভাই বোনরা পথে বের হয়ে আসে তা বড়ই করুণ দৃশ্য। তারা কোথায় যাবে, দ্বিপ্রহরে কোথায় খাবে, তাদের হাতে একটি পয়সা আছে কি নাই সে সংবাদ কেউ রাখেনা। এরূপভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে চলে আসতে জাপানীরাই পারে, আর তারাই পারে যাদের দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি। গিলফিলন যখন আমাকে জাপানীদের বিশেষত্ব বলছিলেন তখন তিনি বার বার আমাকে অনুরোধ করছিলেন, "দেখুন মিষ্টার, এদেশ সম্বন্ধে অনেকে অনেক বদ্‌কথা লিখেই সুখী হয়, আপনি চেষ্টা করবেন আমার কথাগুলি লিখতে। আমি তাতে সুখী হব।" আমিও তাঁকে বলেছিলাম, "স্যার, আপনি যা বলেছেন, যদি জাপান সম্বন্ধে কোনদিন কোন বই লিখি তবে আপনার কথাগুলি লিখতে ভুলব না। কিন্তু একটি কথা। জাপানীরা চীনাদের মেরে শেষ করে ফেল্‌ল, সে সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান?" "ওটা হল রাষ্ট্রনীতি মিষ্টার বিশ্বাস, আমরা এসম্বন্ধে কিছুই বলা কওয়া করবনা। আপনার পরিচয়-পত্রে লেখা রয়েছে, আপনি দেশ বিদেশের আচার ব্যবহার জানতে এসেছেন। আপনি দয়া করে আপনার মন তাতেই সন্নিবেশিত করুন, তাতেই আপনার মংগল হবে।" "তাই হবে স্যার" বলে ভদ্রলোকের সংগে এক পেট খেতে ভুলিনি। যখন আমরা খাচ্ছিলাম তখন গিলফিলন জাপানীদের অনেকগুলি চাল আচার ব্যবহারের কথা বলছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না, প্রত্যেকটি কাজের সংগে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক রয়েছে।

নাগয়াতে অনেকগুলি গরীবলোকের বসতি ছিল। আমি তাদের অবস্থা জানবার জন্য সেদিকে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম দলে দলে লোক ছোট ছোট ফ্যাক্টরী হতে বের হয়ে আসছে। তাদের মুখ দেখলেই মনে হয় তারা ক্রুদ্ধ এবং পারলে তারা লড়াই করবে। লড়াই কার সংগে করবে? চীনের সংগে ত লড়াই চলছে। চীনকে পরাজিত করতে পারলেই তাদের শান্তি হয়। কিন্তু

তা নয়। ছোট ছোট কারখানাতে প্রত্যেক শনিবারে একটি করে হ্যাণ্ডবিল বিলি হ'ত। তাতে লেখা থাকত, "বিপন্ন মজুরগণ তোমাদের চারিদিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ঘেরাও করে আছে। যদিও এখন আমাদের মাল মান্চুরিয়াতে যাচ্ছে তবুও আমাদের তৈয়ারী মাল পৃথিবীর আর কোথাও পাঠাতে হলে কোথাও দুইশত পারসেণ্ট ট্যাক্স আর কোথাও তার চেয়ে বেশি ট্যাক্স দিতে হয়। অতএব তোমাদের জীবন মরণ আমাদের হাতে নয়। তোমাদের জীবন মরণ ইউরোপীয়ান্দের হাতে। যে পর্যন্ত ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের সায়েস্ত করা না যায় সে পর্যন্ত তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।" এরূপ অকাট্য যুক্তি তারা যখন কান পেতে শুনতো তখন তাদের মনে আপনা হতেই ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি একটা প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হ'ত। শুধু তাই নয়। জাপানী মজুরদের মানচিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর লোক সংখ্যা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত এবং সংগে সংগে বলা হত, এই এই দেশে এত লোক আছে। তারা দেখতে পেত পৃথিবীটা একেবারে খালি পড়ে আছে অথচ জাপানীদের বিদেশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, সাইবেরিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এসব দেশ ত একেবারে খালি, তবে কেন জনবহুল দেশ হতে সে দেশগুলিতে লোক যেতে দেওয়া হয় না? উপদেষ্টাগণ বুঝিয়ে দিত এটা ইউরোপীয়ানদের একটা বদ্‌বুদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে জাপানের যে স্থানেই গিয়েছি সেস্থানেই এই ভাবটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরেছিলাম।

নাগয়াতে সন্ধ্যার পর একটি বিদ্যালয়ে যাই। সেখানে প্রকাশ্যেই কতকগুলি লেকচারের বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে বলা হ'ত, এশিয়া এশিয়াবাসীরই। এশিয়াকে মুক্ত করতে হবে এবং জাপানের সাহায্যে এশিয়াবাসীর উন্নতি করতে হবে আমি প্রায় দুঘণ্টা বসে সেরূপ লেকচার শুনেছিলাম। একজন ফিলিপাইনের সেখানে লেকচার দিচ্ছিলেন। তাঁর লেকচার শুনে অনেকেই মোহিত হয়েছিল, আমিও দুএক বার করতালি দিয়েছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছি

এসব বাজে কথা মাত্র"। এসব কথার যদি মূল্য থাকত তবে কোরিয়া, ফরমোসা এবং মান্চুরিয়াতে লোক জাপানীর ভয়ে কাঁপে কেন? লেকচার গৃহ হতে বের হবার পূর্বে ফিলিপাইনো ভদ্রলোকের সংগে করমর্দন করে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। লোকে বলে "আন্তরিক ধন্যবাদ"। আমার ধন্যবাদে আন্তরিকতা ছিলনা, ভদ্রতার খাতিরে যতটুকু করা দরকার ততটুকু করেছিলাম মাত্র। কোনও একটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করাও যে অন্যায় কাজ হতে পারে সে কথা সেদিন যেমন করে বুঝতে পেরেছিলাম, এখন তার চেয়েও বেশি বুঝতে পারছি। সেজন্যই ইংলিশরা বলে Ignorance is bliss.

নাগয়াতে ছিলাম মাত্র দুদিন। এ দুদিন বিশ্রাম করে এবং সামান্য একটু ঘুরেই বিদায় নিতে হয়েছিল, কারণ এই পার্বত্য সহর যদিও জাপানীদের কাছে প্রিয় ছিল আমার কাছে তেমন সুখদায়ক ছিলনা। আমার কাছে সমুদ্রতীরের পথে চলতেই ভাল লাগত বলে সিজোওকা (SHIZOUKA) নামক সমুদ্র-তীরবর্তী শহরের দিকে রওয়ানা হই।

দ্বিপ্রহরে পথে একটি কলেজ দেখতে পেয়ে সেখানে একটু বিশ্রাম করতে দাঁড়াই। পরে ইচ্ছা হল কলেজটি দেখে গেলে মন্দ হবে না। কলেজের চারিদিকের দৃশ্যও সুন্দর। কলেজের সামনের দিকে বড় বড় পাইন বৃক্ষ ক্রমেই সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। কলেজের সামনের প্রশস্ত মাঠ সুন্দর তৃণে আবৃত। কলেজ গৃহের চারিদিকে নানা জাতের ফার্ বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। ফার্ বৃক্ষগুলির কাছেই চেরীগাছ। চেরীগাছের ঘন সবুজ পাতা বাস্তবিকই কলেজের শ্রীবৃদ্ধি করেছিল। আমি তৃণ শয্যায় শুয়ে থেকে কলেজের সুখদৃশ্যই দেখছিলাম। এমনি সময় একজন স্ত্রীলোক—বোধ হয় কলেজের প্রফেসরই হবেন—এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে নমস্কার করে বললাম, "হে সন্দেহ-পূর্ণ দেশের কলেজ শিক্ষয়িত্রী; আপনাকে নমস্কার! আমি আপনাদের বিদ্যালয়ের তৃণভূমির উপর এমনিভাবে শুয়ে আছি দেখে সন্দেহ

করবেন না। আমি ভারতবাসী। ভারতবাসীকে যারা সন্দেহ করে তারা হয় পাগল, নয় গোমূর্খ। আমাদের কারো কোনরূপ ক্ষতি করার ক্ষমতা নাই।" মহিলা আমার কথা বুঝলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে আপনি অনুভব করলেন আমরা বিদেশীকে সন্দেহের চোখে দেখি?" আমি, বললাম, "আপনাদের দেশের পুলিশ আমার পেছনে লেগেই আছে, দুবার খানাতল্লাস করেছে। যদি কেউ কোথা হতে জল আসে এই প্রশ্ন করে তবে আপনাদের দেশের সর্বসাধারণের সন্দেহ চরমে ওঠে। আমাকে সন্দেহ করা হয় বলে আমি মোটেই দুঃখিত নই, বরং গর্ব অনুভব করি। যাকে সন্দেহ করা হয় তার শক্তি আছে তা সর্বপ্রথম স্বীকার করা হয়, তারপর সন্দেহ করা হয়। যদিও আমি জানি আমরা সন্দেহেরও অযোগ্য তবুও যে আমাকে সন্দেহ করা হয় তাতে আমাকে মানুষ বলেই স্বীকার করা হয়। আপনাদের দেশের লোক যে আমাকে সন্দেহ করে সেজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি একথাটা সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেবেন।"

ভদ্রমহিলা আমার কথায় জবাব না দিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে বিদ্যালয়টি দেখালেন। মস্তবড় হল ঘরগুলি ছাত্রাভাবে ভূতের বাড়ির মত দেখাচ্ছিল। প্রত্যেকটি ঘরে সারি দিয়ে বন্দুক তলোয়ার আরও নানারূপ অস্ত্র সজ্জিত ছিল। মাঝে মাঝে বইও একত্রে রক্ষিত ছিল। বইগুলি দেখেই মনে হল এসব ছেলেরা রেখে গেছে। এসেই তারা এসব হাতে নেবে। বড় বড় ঘরগুলি অতিক্রম করে আমরা বিদ্যালয়ের পেছনে গেলাম। সেখানে মস্তবড় প্যারেড গ্রাউণ্ডে ছেলেরা প্যারেড করছিল। কতক্ষণ পরই প্যারেড সমাপ্ত করে যখন ছেলেরা বিদ্যালয়ে এল তখনও বুঝতে পারলাম না এরা এত চুপচাপ কি করে থাকে। কতক্ষণ পর মহিলা আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন এবং একটি টিফিন্ বক্স আমার হাতে দিয়ে তাই খুলে খেতে বললেন। টিফিন বক্সটি খুলে এক পাশে কতকগুলি ভাত দেখতে পেলাম। ভাতের এক পাশে তিনটি ছোট ছোট সিদ্ধ মাছ এবং তৎসংগে কতকগুলি সালাড ছিল। এসবের এক পাশে অতি যত্নে চপ্‌ষ্টিকও ছিল। আমি চপষ্টিক দুটো

উঠিয়ে তারই সাহায্যে অতি কষ্টে খেয়ে চপষ্টিক সমেত বাক্সটি যেস্থানে অন্যান্য ছেলেরা পরিত্যক্ত বাক্সটি ফেলে দিয়েছিল সেখানে রেখে দিলাম এবং কয়েক কাপ গ্রীণ চা খেয়ে মহিলার কাছে পুনরায় মাথা নত করে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে নিলাম। সেদিনই আমি সিজোওকা পৌছেছিলাম। আনন্দের সঙ্গে বলছি সিজোওকা পৌছবার পর থেকে যতদিন জাপানে ছিলাম তার মধ্যে কেউ আমাকে সন্দেহ করেনি অথবা কোন পুলিশও বিরক্ত করেনি। একেই বলে ব্ল্যাক ড্রাগন মহিমা। আমি ব্ল্যাক ড্রাগনের সুদৃষ্টিতে পড়েছিলাম। জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগনের অপর নামটি হল "The East India Company of Japan' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেমন করে পূর্ব এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করেছিল জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগনও তেমনি বৃটিশের ক্ষমতাকে চূর্ণ করে এশিয়াতে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এশিয়া খণ্ডে রাজ্য বিস্তার করে তখন এশিয়াবাসী আরামে ঘুমাচ্ছিল আর জাপান যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কায়দায় এশিয়াখণ্ডে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হয় তখন জাপানী ব্ল্যাকড্রাগনিষ্টরা দেখতে পেলো এশিয়ার লোক জাগ্রত। জাগ্রত গৃহে চৌর্যবৃত্তি করা চলেনা, ডাকাতি করা যেতে পারে। জাপান দিনে ডাকাতি করতে অগ্রসর হয়েছিল।

সিজোওকা সমুদ্র তীরবর্তী শহর। শহরে পৌছবার পূর্বেই দেখতে পেলাম পথের দুপাশে মাছ শুকাতে দেওয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও কাঠের টুকরার মত টুকরাও শুকাতে দেখতে পেয়ে হাতে উঠিয়ে তার গন্ধ নিয়ে বুঝলাম এটাও মাছই, তবে মাছের মণ্ড করে সেই মণ্ড কাঠের টুকরার মত করে শুকাতে দেওয়া হয়েছে। এরূপ টুকরাগুলি মানচুরিয়াতে আমি দেখেছিলাম। টুকরাগুলিকে ছুরির সাহায্যে পাতলা করে কাটা হয় এবং তাই গরম জলে ফেলে দেওয়া হয়। যদিও তাতে মাছের আস্বাদ থাকে তবুও মাছের আঁসটে গন্ধ থাকে না। সামান্য চিনির সাহায্যে তা খেতে বেশ ভাল লাগে এবং শরীরকে

মজবুত রাখে। সমুদ্রতীরে সেরূপ মণ্ডের মাছ রাশি রাশি দেখতে পেয়ে মান্চুরিয়ার কথা মনে হয়েছিল।

সিজোওকাতে তাড়াতাড়ি করে যাবার আরও একটি কারণ ছিল। কোরিয়া দেশের শিউল শহর হতে একজন কোরিয়ান্ আমাকে একখানা পত্র দিয়েছিল। সেই পত্র যথাস্থানে পৌঁছে দেবার প্রবল বাসনা জেগেছিল। কোরিয়ান্ লোকটি তার পত্রে লিখেছিল আমাকে যেন আর্থিক সাহায্য করা হয়। যদিও আমার প্রথমে অর্থের দরকার ছিলনা, তবুও পরে অর্থের দরকার হয়ে উঠল। এবার আরও ভাল করে জাপানীদের জানতে পারব এই ছিল কামনা। শহরের উপকণ্ঠে ইচ্ছামত একখানা লজিং হাউসে গিয়ে উঠলাম। লজিং হাউসের মালিক বড়ই উদার। তিনি আমাকে পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং নিকটস্থ রেল ষ্টেশন হতে খাদ্য এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। মালিকের একটি যুবক ছেলের বেশ ইংলিশ ভাষায় দখল ছিল বলে আমার পক্ষে আরও সুবিধা হল। আমি তার হাতে কোরিয়ানের চিঠিখানা দিয়ে বল্লাম, "এই লোকটির সংগে আমার দেখা করতে হবেই, আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।"

যুবক পত্রখানা পড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্ল, এই "লোকটির সংগে দেখা করা যুক্তিযুক্ত হবেনা, কারণ সে একজন কোরিয়ান্ দেশ প্রেমিক। তাকে জাপানী পুলিশ সকল সময় চোখে চোখে রাখে। আমি যদি তার বাড়িতে যাই তবে পুলিশের দৃষ্টিতে পড়বই। এখন ভেবে দেখুন কি করা উচিত!"

"চিঠিটা যদি ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে কেমন হবে বলুনত?"

যুবক বল্লে, "তা হলে কি রক্ষা আছে? এক কাজ করুন, আমি এক খানা মানচিত্র এঁকে দিচ্ছি তা ধরে লোকটির বাড়ি যদি আপনি চলে যান তবে কেউ কিছুই বলবেনা।

'তাই হবে' বলেই আমি যুবকের হাতে কাগজ কলম দিলাম এবং যুবকের

নক্সা অনুযায়ী কোরিয়ান্ লোকটির বাড়িতে আধ ঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেশে কিন্তু আমরা নক্সা এঁকে দেই না, শুধু বলে দেই এগিয়ে যান। এতে আমাদের কত কষ্ট সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নাই। আমরা নিজেদের সভ্য বলে সর্বদাই জাহির করি কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে আমাদের কত ত্রুটি।

কোরিয়ান ভদ্রলোকের বাড়িতে পৌঁছে দেখি তিনি বাড়িতেই আছেন। আমি তাঁকে পত্রখানা দেবামাত্র তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পত্রখানা পড়েই কোরিয়ান ভদ্রলোক বল্লেন, "বন্ধু, আমার ভাই লিখেছে আপনাকে আর্থিক সাহায্য করতে কিন্তু দুঃখের সহিত বলছি একটি ইয়েনও হাতে নেই। জেনে সুখী হলাম আমার ভাই এখনও প্রাণে বেঁচে আছে। তাঁকে কিরূপ দেখে এসেছেন তাই বলুন।"

আমি ভদ্রলোকের মনের ভাব বুঝতে পেরে সত্য কথাই বলে ফেল্লাম। বল্লাম, "যে অবস্থায় তাঁকে দেখে এসেছি, তাতে মনে হয় তাঁর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন্তে অন্তত ছয় মাসের দরকার হবে। তিনি জেলে ছিলেন সেকথা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। জেলেই তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে। আমি আপনার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাইনা, আপনি যেমন আপনার ভ্রাতার সংবাদ শুনে সুখী হয়েছেন আমিও তেমনি সুখী হয়েছি। আপনার ভ্রাতার ছবি আমার কাছে নেই, যদি থাকত তবে বুঝতে পারতেন তাঁর শরীর কত দুর্বল হয়েছে। আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, কোন স্বার্থে আমি আপনার ভ্রাতার চিঠি এতদূর বহন করে এনেছি। এতে আমার কোন স্বার্থই নাই, তবে সহানুভূতি রয়েছে। আমাদের দেশেও আপনার ভ্রাতার মত অনেক জেল-ফেরতাকে দেখে আমার ভয় হত। তারাও আপনার ভাইএর মতই কেউ আধমরা আর কেউবা মরমর অবস্থায় ফিরে আসত।"

কোরিয়ান ভদ্রলোক আমার সংগে লজিং হাউসে এলেন এবং জাপানী যুবকের সংগে বসে নানারূপ গল্প করে সময় কাটাতে লাগলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম জাপানী যুবক কোরিয়ান্ যুবকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং জাপানেও যাতে বিপ্লব আসে তার পক্ষপাতী। অন্যত্র কোথাও বলেছি, জাপানী কমিউনিষ্টরা বাস্তবিক পক্ষে বামপন্থী নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য নয়।

সিজোওকা শহরটিতে ঘন বসতি রয়েছে এবং শহরের মধ্যে অপচ্ছিন্নতা বর্তমান থাকায় কেমনতর একটা আরবী ভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। দিনটাও ছিল বেশ গরম। আটানব্বই ডিগ্রি উত্তাপ সকাল বেলাতেই তাপমান যন্ত্রে উঠেছিল। অনেকেই তাদের ঘরের সামনে জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। গ্রেভেল পাথরের কাঁকড় ভরা পথে অল্প সময়ের মধ্যেই জল শুকিয়ে গিয়ে আবার ধূলা দেখা দিচ্ছিল। লোকের চলাফেরা শহরে বেশি অনুভব হচ্ছিল কিন্তু উচ্চ স্বরে কেউ কথা বলছিল না। আরবগণ যেমন হাউমাউ করে কথা বলে না জাপানীরাও তেমনি নীরব থাকতেই ভালবাসে।

আমার অভ্যাস হয়েছিল কফি খাওয়া। অতি কষ্টে সমুদ্র তীরে একখানা কফির দোকান বের করলাম। দোকানী জাভা হতে কফির চকলেট তৈরী করে এনেছিল। যখনই কোন খরিদ্দার আসত তখনই সে ফুটন্ত গরম জলে সামান্য একটু কফির চকলেট ছেড়ে দিত। যখন জলটা কফির সংগে মিশে একেবারে কালো হয়ে যেত, ফ্লেভার বের হয়ে আসত তখন সে অতি সন্তর্পণে কফির সংগে পরিমাণ মত দুধ চিনি মিশিয়ে ক্রেতার কাছে হাজির করত। আমরা তিন জনে মিলে কফি খেয়ে দোকানীকে মাত্র ত্রিশ সেণ্ট দিয়েছিলাম। দোকানীকে বেশ ভাল করে সেণ্টগুলি গুণে মানিব্যাগে যত্নের সহিত রেখে দিল। দোকানীর এই সামান্য অর্থ অতিযত্নে রাখতে দেখে কোরিয়ান লোকটির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। আমার দৃষ্টি জাপানী যুবকের প্রতি ছিলনা।

আমি যখন কোরিয়ান্ লোকটির দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন জাপানী যুবক আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল, "আমরা সকলেই ধনী নই, আমাদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশেও 'থ্রি প্রিন্সিপলস্' বলে একটা কিছু ছিল। কিন্তু তা লোপ পেতে বসেছে। দরিদ্রের উন্নতি করা থ্রি প্রিন্সিপলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের দেশের কর্মকর্তারা তা ভুলে গিয়ে দুটি মতই মেনে চলবার চেষ্টা করছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হল সম্রাটকে রক্ষা করা, দ্বিতীয়টি হল সাম্রাজ্য রক্ষা করা। চেষ্টা করছি যাতে দরিদ্রও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু দরিদ্র কি করে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে? যারা ব্যবসায়ী তারা পূর্বের মত মজুরের দিকে দৃষ্টি রাখছে না, মজুরও বুঝতে পেরেছে বিদেশীর অত্যাচারের ফলেই তাদের দুর্দশা প্রত্যহই বেড়ে যাচ্ছে। মজুর এখন বিদেশীর সংগে লড়াই করতে প্রস্তুত। অস্ত্র এবং আদেশ পেলেই হয়। মান্চুরিয়া এবং জহোল দখল করে আমাদের পেট ভরেনি, আমরা আরও খেতে চাই।"

সিজোওকাতে যাবার পর সর্বসাধারণের কাছ থেকে বেশ সহানুভূতি পেয়েছিলাম। সকলেই আমাদের দেশের কথা জানতে চাইছিল এবং আমাদের দেশ বৃটিশের হাত থেকে কবে মুক্তি পেতে পারে সেকথা জিজ্ঞাসা করছিল। আমি কোরিয়ান্ যুবকের মারফত যখন জিজ্ঞাসা করতাম, "আপনারা কবে পর্যন্ত কোরিয়ান্দের মুক্তি দিতে সক্ষম হবেন" তখন সে কথার জবাব অতি অল্প লোকই দিত। তারা বলত, "কোরিয়ান্রাতো আমাদের অধীন নয়, তারা স্বাধীন।" আমি কথা না বাড়িয়ে বলতাম "আমাদের প্রতি আপনাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

সিজোওকাতে বিদেশী সাইকেল পর্যটক যায় না। এখান থেকে দুটি পথ টোকিওর দিকে গিয়েছে। যে পথটি মানচিত্রে দেখান হয় তা ডিংগী নৌকার সাহায্যে যেতে হয়, আর অপরটি হল পাহাড়ে। সেজন্য এত কষ্টকর পথে কেউ

যেতে চায়না। সিজোওকা হতে যখন রওয়ানা হই তখন জাপানী যুবকটি আমার সংগে আসে এবং আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে বলে, "আপনি যখন ইয়াকোহামা হতে টোকিওর দিকে রওয়ানা হবেন তখন এই পত্রে যাঁর নাম আছে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করবেন। পত্রে একখানা মানচিত্র আছে, সেই মানচিত্র ধরে আপনি অগ্রসর হবেন, তবেই স্থানটি পেয়ে যাবেন। আমি যাঁর কাছে পত্র দিয়েছি তিনি এক জন সোসালিষ্ট। তিনি অনেক বৎসর জেলে ছিলেন এবং বর্তমানে কিছুই না করে অতি কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন। পত্রের ভেতর কিছু অর্থ আছে, গুণে দেখুন কত আছে।" আমি গুণে দেখলাম তাতে পঞ্চাশটি ইয়েন্ রয়েছে। গুণে দেখা হয়ে গেলে যুবক বললে, "এই নোটগুলি পত্রে যাঁর নাম আছে তাঁকে দেবেন। দেখবেন লোকটি অকালে বৃদ্ধ হয়েছেন। সামান্য একটু হাঁটতে পারেন। বেশি হাঁটলে মাথা ঘোরে এবং মাটিতে পড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকেন।" যুবকের কথাগুলি বুঝে নিয়ে আমি বললাম, "আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে, বলুন ত জাপানে আপনাদের মত কত লোক আছে?"

"বেশি নেই বন্ধু! যদি আমাদের সংখ্যা বেশি থাকত তবে আমাদের দেশের লোক চীন আক্রমণ করত না, এখন বিদায়।"

যুবক চলে যাবার পর আমি সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। ভাবলাম আমরা স্বাধীনতা পাবার জন্য চেষ্টা করছি আর এরা স্বাধীন হয়েও নিজেদের পরাধীনের চেয়ে অধম বলে মনে করছে। এরা নিজের দেশে প্রবাসী হয়েছে। এরা একের সংগে অন্যের সংযোগ রাখতে পারে না। এরা এক শহর হতে অন্য শহরে যেতে পারে না। তবুও এদের আমরা দূর থেকে ভাবি এরা সুখেই আছে। হায়রে স্বাধীনতা! না পেলেও চলেনা, আবার পেলেও কষ্ট করতে হয়।

সূর্য যখন মাথার উপর উঠল, তখন আমি পথ চলতে আরম্ভ করলাম কারণ

আমি জানতাম আজ ওডাওরা যাওয়া হবেনা, নিকটেই কোথাও থাকতে হবে। নিকটেই নুমাজু (Numazu) বলে একটা শহর তাতেই থাকতে হবে। কতক্ষণ যাবার পরই দেখা হল এক ধনী জাপানীর সংগে। তিনি মোটরে করে যাচ্ছিলেন। এপথে একমাত্র তাঁরই মোটর কার দেখতে পেলাম। তিনি মোটর হতে নেমে আমাকে একটি তরমুজ দিয়ে বললেন, "মশিয়ে বড়ই গরম আশা করি এতে আপনার তৃষ্ণা মিটবে।" ধনী লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে তরমুজটা খেতে বসলাম। বেশ মিষ্টি সে তরমুজ। তরমুজ খাওয়া হয়ে গেলে কতক্ষণ যাবার পরই পথটা শেষ হয়ে গেল। একটা ছোট্ট উপসাগর জাপানের পার্বত্য ভূমির দিকে এগিয়ে চলছিল। যখন জাপানের নাম ছিল ইয়ামাত তখন নাকি জাপান সম্রাটের রাজ্য দক্ষিণ দিকে এই পর্যন্তই ছিল।

এই অঞ্চলটাকে পূর্বে বলত 'ইয়ামত দামাসই' বা জাপানীদের শক্তি। এখন আর তা বলেনা কারণ এখানেই যদি জাপানীদের শক্তি শেষ হয়ে গেল তবে আরও দক্ষিণে রাজ্য কি করে বিস্তার লাভ করল।

এখানে ইয়ামাত দামাসই বলে একটি মন্দিরও আছে। যারা সিন্‌টো ধর্মে নিষ্ঠাবান তারাই এখানে এসে হাঁটু গেড়ে বসে এবং পিতৃপুরুষের কাছে প্রার্থনা করে। আমরা যেমন করে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করি তারা সেরূপ পূজা করেনা অথবা ঈশ্বরকে বলেনা, "হে ঈশ্বর আমার মা-বাবাকে স্বর্গে পাঠাও।" তারা তাদের পূর্বপুরুষের কাছে প্রার্থনা করে এবং বলে "হে আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের সামনে এই এই বিপদ এসেছে, বিপদ হতে রক্ষা কর।" পূর্বপুরুষের কাছে যখনই প্রার্থনা করা হয় তখন নিজের জন্য প্রার্থনা করা চলেনা। সর্বসাধারণের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। জাপানীরা যখন "ইয়ামাত দামাসই"-এর কাছে প্রার্থনা করে তখন তারা বলে "হে পূর্বপুরুষ তোমরাই আমাদের এই সংসারে এনেছ, তোমাদের নামে যেন কোনরূপ কলংক না লাগে। আমার দ্বারা যখনই তোমাদের নামে সেরূপ কলংক আরোপিত হবার সম্ভাবনা হয় তখনই

যেন আমি হারাকিরি করতে পারি।" জাপানীদের প্রার্থনা এর বেশি নয়। তারা ধনং দেহি বলেনা, তারা যশং দেহিও বলেনা। তারা পেতে চায় না, তারা দিতে চায়। দেবার মত মানুষের আছে প্রাণ। জাপানীরা সকল সময়ই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সমুদ্র তীরে বসে যখন এসব কথাই ভাবছিলাম তখন অপর তীরে একটি যুবক সমুদ্র জলে অনবরত ডুব দিচ্ছিল আর আমার দিকে চাইছিল। সে সমুদ্রে অনেকক্ষণ ডুবে থেকে তার বাহাদুরী আমাকে দেখাচ্ছিল। আমার কিন্তু তা ভাল লাগছিল না। আমি চাইছিলাম সমুদ্রের ওপারে যেতে। অনেকক্ষণ পর নৌকা নিয়ে মাঝি এল। মাঝি আমাকে ওপারে নিয়ে গেল। আমি তাকে কুড়ি সেণ্ট্ দিয়েছিলাম কিন্তু সে কুড়ি সেণ্ট্ না নিয়ে পাঁচ সেণ্ট্ নিল এবং পনেরো সেণ্ট্ ফিরিয়ে দিল। জাপানী মাঝির সততা দেখে আমার মাথা নত হয়ে আসছিল।

সমুদ্রের ওপারে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে সাইকেল চালালাম। পথে কতকগুলি যুবকের সংগে দেখা হল এবং তারা জিজ্ঞাসা করল "মিস্তারে ইয়রে। লাইকেলো হয়াটো মেকো?" বুঝতে পারলাম তারা জানতে চায় আমার সাইকেল কোন্ দেশে কোন্ কোম্পানী তৈরী করেছে। আমি তাদের কাছে একটু দাঁড়ালাম এবং বল্লাম, "পুরাতন বাইসাইকেলের পার্ট একত্রিত করে এটা তৈরী হয়েছে, অতএব এটার গঠনকারী আমি নিজেই। কিন্তু বন্ধুগণ আর একটা কথা আপনারা জিজ্ঞাসা করেন নি। সে কথাটা হল এই দুখান পা কোন দেশের লোক তৈরী করেছে?" ছেলেরা হেসে বল্ল, "ঠিক ঠিক, তা ত জিজ্ঞাসা করতে হবেই। বলুন ত আপনার পা দুখান কে তৈরী করেছে?" "আমি হলাম ইণ্ডিয়ান্, এ পা দুখানাও ইণ্ডিয়ানরাই তৈরী করেছে।" একটি ছেলে চিৎকার করে বল্ল "সো দিস্ কা?" এই তিনটি শব্দের যদি সোজা অনুবাদ করা হয় তবে বলতে হবে "এই তাই কি?" আমিও বলেছিলাম "এই তাই।

হলের দল আমার কথা শুনে চলে গেল। আমিও প্রবল বেগে সাইকেল ালিয়ে সুমাজুতে গিয়ে পৌছুলাম।

তখন শহরের সর্বত্র বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে। আলোর তেজ এত বেশি া চোখে সহ্য হচ্ছিল না। সাইকেল হতে নেমে পিঠঝো া হতে রংগিন্ চসমা র করে চোখে দিয়ে লজিং হাউসের সন্ধান করছি এমনি সময় পথে একটি লিশের সংগে দেখা হল। তাকে একটি লজিং হাউস দেখিয়ে দিতে বল্লাম। র্বপ্রথমই সে তার নোট বই খুলে আমার নাম তাতে আছে কি না তাই খল। যখন দেখল আমার নাম তার নোট বইএ নাই তখন নিকটস্থ একটা াপানী লজিং হাউসে নিয়ে গেল এবং কি বল্ল। লজিং হাউসের মালিক ামার পরিচয় চাইল। আমি আমার একখানা পরিচয় পত্র দিলাম। সে াই পড়ে আমাকে তার ঘরে স্থান দিল। কিন্তু পুলিশের ব্যবহারে বড়ই দুঃখ হল। র্বে পুলিশরা একটু খাতির করত, বিরক্ত করত কিন্তু হঠাৎ কি কারণে আমার াম তাদের ডাইরী বইএ আর উঠছিল না। তারা যেন একটু অবজ্ঞাই করত। ারা হয়ত ভাবত কে হবে লোকটা কে জানে। যদি পলিটিকেল লোক হত তবে লাকটার নাম আমাদের কাছে আসতই। আমার প্রতি কেউ ফিরে আর াচ্ছে না দেখে মনে মনে বেশ সুখী হলাম এবং মহানন্দে সর্বত্র বেড়াতে আরম্ভ রলাম।

জাপানী লজিং হাউসের প্রথামত বস্ত্র পরিবর্তন করে হাতমুখ ধুলাম। তারপর াপানী খড়ম পায়ে দিয়েই স্নানাগারে গিয়ে স্নান করে খাবার খেয়ে পুনরায় কফির াকানের সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। এদিকে অনেকে বৃচেস্ পরে বলেই কউ আমার বহুরূপী ড্রেসের দিকে তাকাল না। অনেক খুঁজে খুঁজে একটি ফির দোকান বের করলাম। কয়েক জন লোক মাত্র সেখানে বসেছিলেন। তার ধ্যে হোয়াইট রুশিয়ান্ও কয়েকজন ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ দেশে বিপ্লবের ার অনেক নন্-বলশেভিক বিদেশে পালিয়ে আসে। জাপানেও অনেক এসেছিল।

এদেরই সাদা রুশ বলা হয়। সাদা রুশ বলে একটা দেশও আছে। সেই দেশটি ইউরোপীয় রুশিয়ায় অবস্থিত। যে সকল নন্-বলশেভিক বিদেশে চলে আসে তাদের মধ্যে প্রায় লোকই ছিল শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। রুশ দেশে সর্বসাধারণ চা খায় কিন্তু ধনী অভিজাতেরা কফির পক্ষপাতী। তারা এখনও তাদের সে অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। সেজন্যই চীন, জাপান, কোরিয়ার যেখানে কফির দোকান রয়েছে সেখানেই সাদা রুশদের দেখতে পাওয়া যায়। চায়ের দোকান ইউরোপীয়ান প্রথায় নির্মিত। জুতা নিয়েও ঘরে প্রবেশ করা যায়। আমিও জুতা নিয়েই ঘরে প্রবেশ করলাম এবং ঘরে প্রবেশ করেই গুড্ ইভনিং বলে সকলকে সম্ভাষণ করলাম। অনেকেই আমাকে প্রতিনমস্কার জানালে, তারপর সকলেই নীরব। আমাকে কফি দেওয়া হয়ে গেলে নিজেই কথা সুরু করলাম। বল্লাম, "উত্তর জাপানে এত গরম হবে বলে আমার ধারণা ছিল না।" একজন বল্লেন, "এখানেত মামুলী গরম, এখন আপনি যতই উত্তরে যাবেন ততই বেশি গরম বোধ করতে থাকবেন। আজ যদি সাইবেরীয়াতে যান তবে বুঝবেন সেখানে কত গরম। এই ত অক্টোবর মাস চলছে, তারপরই নবেম্বরের মাঝামাঝিতে হঠাৎ একদিন আকাশ অপরিষ্কার হয়ে যাবে। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকবে, তারপর ঘরের বার হওয়া কষ্টকর হবে। তখন লোক একটু গরমের জন্য হা হুতাশ করতে থাকবে। এখন বলুনত আপনার দেশ কোথায়?" আমি আমার পরিচয় দিয়ে বর্তমানে কি করছি তাও বল্লাম। একজন সাদা রুশ বল্লেন, "ইণ্ডিয়ান্রা যদিও বিদেশীর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পান না, কিন্তু তাঁদের দেশের লোক যারাই বিদেশে আছে তারা এঁদের মত পর্যটককে বেশ সাহায্য করে। কেমন আমার কথা সত্য নয় কি?" "হাঁ মশাই আপনি যা বলেছেন তার সবই সত্য।" আর এক জন বল্লেন, "যদি আপনার কাছে টাকা থাকে তবে বলসীদের দেখে আসুন

বুঝবেন 'বল্‌সেভিকরা' রুশিয়ার কত ক্ষতি করেছে।" মনের ভাব গোপন রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের দেশের লোক কি খেতে পায় না?" ভদ্রলোক বল্‌লেন, "যদি খেতে পেত তবে আমরা এ দেশে আসতাম না।" আমি বল্‌লাম, "ইজ্‌ দ্যাট সো" মানে, "তাই না কি?" কথাটা কিন্তু বড়ই খারাপ। তাতে সন্দেহ পুরামাত্রায় থাকে। যারাই ইংলিশ ভাষার সাহায্যে কথা বলে তারা "Is that so" কথাটা খুব কমই ব্যবহার করে। জাপানীরা কিন্তু "তাই না কি?" কথাটার মামুলী অর্থই গ্রহণ করে কারণ তারা কথায় কথায় "সো দিস্‌ কা" কথাগুলি ব্যবহার করে। শ্বেত রুশিয়ান ভদ্রলোক যদিও ধনীর ছেলে, এবং অভিজাত ঘরে জন্ম নিয়েছেন কিন্তু আমার টিপ্পনী যুক্ত কথা বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। টাকার অভাব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, জাত্যভিমান কাকে বলে। আমিও আর জাত্যভিমানীদের কিছুই বুঝতে চেষ্টা না করে চলে আসব ভাবছি এবং চেয়ার থেকে উঠছি এমনি সময় এক জন শ্বেত রুশ আমাকে বল্‌লে, "মশাই অনেক দেশত দেখলেন, ঈশ্বরহীন রাজ্য কোথাও দেখেছেন?"

"কেন দেখব না মশাই, চীন, জাপান এবং কোরিয়া এই তিনটি দেশেইত ঈশ্বর নাই। বৌদ্ধ এবং কন্‌ফিউসিয়ানরা ঈশ্বর বলে কিছুই মানে না, পূর্বেও মানত না। কই ঈশ্বরত এদের শাস্তি দেন নি বরং এরা সভ্যতার দিকে বেশ এগিয়ে চলছে।"

"আপনি কি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী?" এই বলেই আমার কথার অপেক্ষায় লোকটি অসহায় ভাব দেখিয়ে চেয়ে থাকল।

আমি ভাবলাম যদি একে কিছু ভাল কথা বলি তবে হয়ত রেগে যাবে, সে জন্য তাকে কিছু না বলে কফির দোকান হতে চলে এলাম। এদের ঈশ্বরের সংগে অর্থনীতির নিকটস্থ সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝতে আর বাকি থাকল না।

রুশ দেশ থেকে যারা পালিয়ে এসেছিল তারা ভাবত এবং এখনও ভাবে উপরে ঈশ্বর আর নীচে জার এ দুটা জীবই মানুষের সর্বময় কর্তা। সুখের বিষয় যদিও জাপানীরা সিন্‌টো ধর্ম মেনে চলে তবুও এদের মধ্যে জারের আমলের রুশদের মত দুর্বুদ্ধি তথনও জেগে ওঠে নি।

রাত্রে ঘরে এসে জাপানীদের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে শুধু এই সাদা রুশদের কথাই ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম। পরদিন তাড়াতাড়ি করে ঘুম থেকে উঠেই ওডাওরার দিকে রওয়ানা হই। পথ ক্রমাগতই খাড়ি হয়ে উপরের দিকে চলছে। চলতে যদিও কষ্ট হচ্ছিল তবুও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতেই চলছিলাম। জাপানের লোকসংখ্যা অনুযায়ী পথে লোক চলাচল খুবই কম। পার্বত্য পথে মোটেই লোক চলছিল না। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ এক খণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেল্‌ল। তারপর উত্তরে বাতাস ক্রমাগত বইতে আরম্ভ করল। এর মধ্যেও আমি চলছিলাম কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। বৃষ্টিতে ভিজতে মোটেই আরাম লাগছিল না, তবুও চলছিলাম। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল কখনও পেছনের দিকে ফিরে যাব না। যত বৎসর ভ্রমণ করেছি কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পেছন হটে যাইনি। আজও সেই অবস্থা। চলেছি ত চলেছিই।

বৃষ্টি থামল না। দু পাশ থেকে পাহাড়ে কাদা এসে পথ ভর্তি করতে লাগল। পথে পিচ্‌ দেওয়া ছিল না বলে সাইকেল পিছলে যাচ্ছিল না। আমি ঠিকই চলছিলাম। বেলা তিনটার সময় প্রচণ্ড বেগে যখন বাতাস বইছিল তখন চলতে অসমর্থ হয়ে পথেরই পাশে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখছিলাম পাশের কোথাও লোকালয় আছে কি না। দেখলাম লোকালয় নাই। অগত্যা বিশ্রামার্থ পাথরটার উপরেই বসে পড়লাম।

কতক্ষণ বিশ্রাম করার পর একখানা মোটর লরী আসতে দেখলাম। জাপানী প্রথামত মোটর লরী কোনও যাত্রী নিয়ে কোথাও যেতে পারে না।

মোটর লরীখানা যখন আমার কাছে এল তখন দেখলাম ড্রাইভার আমাকে হাত উঠিয়ে ডাকছে। আমি তার কাছে গেলে ড্রাইভার সাইকেলটা সর্বপ্রথম ট্রাকে ওঠাল, তারপর কাছে গিয়ে বসতে বল্‌ল। আমি তার কাছে বসলাম এবং পকেট হতে একটা সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখি সবই ভিজে গেছে। ড্রাইভার একটু হাসল।

মোটর ড্রাইভার একটিও ইংলিশ শব্দ জানত না। আমি যে কটা জাপানী শব্দ শিখেছিলাম তাই ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। ড্রাইভার জানাল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পথের সব চেয়ে উঁচু স্থানে আমরা পৌছব। দেখলামও তাই। হঠাৎ মোটর ট্রাক খানা পাহাড়ের উপর এসে উঠল এবং ড্রাইভার মোটর ট্রাক থামিয়ে আমাকে দৃশ্যাবলী দেখতে বল্‌ল। আমাদের সামনে প্রশান্ত মহা-সাগরের সুন্দর দৃশ্য ভেসে উঠছিল। আমি সেই দৃশ্য অনেক্ষণ প্রাণ ভরে দেখবার পর যখন সাইকেল খানা নামাব ভাবলাম তখন ড্রাইভার আমাকে নেমে যেতে বারণ করল। বুঝিয়ে দিল পথ বড়ই পিচ্ছিল, সাইকেল চালানো যাবে না। ড্রাইভার আমাকে তার কথা বুঝিয়ে দিয়েই আমাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিল। আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে হেকনী (Hakoni) নামক একটি ছোট্ট শহরে এলাম এবং ড্রাইভার আমাকে ট্রাক হতে নামিয়ে দিয়ে বল্‌ল যে আজ সে এখানে থাকবে। আমাকে ওখানে রাত কাটাতে হল।

প্রকৃত পক্ষে আমরা Odawara (ওডাওরা) পথে ফেলে এসেছিলাম। হেকনী যদিও ছোট শহর কিন্তু এখানে যত জাপানী ধনী বাস করে জাপানের আর কোথাও তত ধনী লোক বাস করে না। সেজন্য হোটেল, লজিং হাউস এসবের খরচ এখানে বেশি। আমি তিন ইয়েন দিয়ে একটি রুম নিলাম। রুমটি ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত ছিল। সুকোমল বিছানা, সুন্দর টেবিল চেয়ার বং ঘরের অন্যান্য ফারনিচার দেখে হাঁ হয়ে থাকতে হয়েছিল। হোটেলে জাপানী প্রচলন ছিলনা। সকলেই জুতা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করছিল। আমার জুতা

ভয়ানক অপরিষ্কার থাকায় বয়কে দিয়ে জুতা পরিষ্কার করাতে হয়েছিল। পাশেই ছিল বাথরুম, সেখানে স্নান করে বস্ত্র পরিবর্তন করলাম, তবুও শীত হতে রক্ষা পাচ্ছিলাম না। অগত্যা একটি উলের পুলওভার কিন্‌তে বাধ্য হলাম। তার-পর গেলাম খেতে। সেখানেও দ্বিগুণের বেশি খরচ করতে হল। খাবার খেয়ে যখন ফিরছিলাম তখন ইচ্ছা হল একবার গিয়ে মোটর গারাজে দেখে আসি ড্রাইভার মহাশয়কে যদি পাওয়া যায়। দেখলাম গারেজ খালি। ট্রাকটা পড়ে আছে। আমিও চলে আসছিলাম এমনি সময় আরও দুজন লোকের সংগে ড্রাইভারকে দেখতে পেয়ে হাত উঠিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে আমাকে হোটেলে চলে যেতে বল্‌ল। আমি দু প্যাকেট চেরী সিগারেট কিনে নিয়ে হোটেলে গেলাম এবং ইচ্ছা করেই রুমের দরজাটা খোলা রাখলাম। কতক্ষণ পর ড্রাইভার আ-ইয়া ঘরে প্রবেশ করেই আমাকে নমস্কার করল এবং তার সংগের দুজন বন্ধুকে বসতে বল্‌ল। তারা বসবার পর একজন লোক জাপানী প্রথায় ইংলিশ ভাষায় আমাকে বল্‌ল, "আমাদের বন্ধু আপনাকে এখানে নিয়ে এসে মহাবিপদে ফেলেছেন। এখানকার খরচ খুব বেশি, আশা করি তাতে আপনি দুঃখিত হন্‌নি।"

"নিশ্চয়ই নয়, আপনাদের বন্ধু আমাকে পথে যদি সাহায্য না করতেন তবে বেশ কষ্ট পেতে হত। এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা বোধ হয় সকলেই ধনী। সেজন্যই এখানকার খাই খরচ প্রচুর।"

"হ্যাঁ মশাই, এখানে দরিদ্র লোক থাকতেও ভয় করে। আপনি যে পুল ওভারটি এখান থেকে যে দাম দিয়ে কিনেছেন তার সিকি মূল্যে ওডাওরা অথব ইয়াকোহামাতে পাওয়া যায়।".

আমি জিজ্ঞাসা করলাম; "আপনাদের দেশের ধনীদের সংগে মজুর এব কৃষকের কি সম্বন্ধ ?" আ-ইয়ার বন্ধু বল্‌লে, "সম্বন্ধ বেশ ভালই। মজুরদের বল হচ্ছে যদি তারা সেপাই না হয় তবে ইউরোপীয়ান্ সম্রাজ্যবাদীদের হাত হতে

চীনাদের রক্ষা করা যাবে না। চীনকে যদি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সুপথে আনা না হয় তবে আমরা সমূহ বিপদের সম্মুখীন হব। এই কটি কথা ভাংগিয়ে জাপানী যুবসমাজকে পাগল করা হচ্ছে এবং মান্‌চুরিয়ার গরিলাদের হাতে হত্যার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

আ-ইয়া নামটি চীনা। জাপানে অনেক চীনা ছিল যারা জাপানীদের মাইনে খেয়ে ইন্‌ফরমারের কাজ করত। যদিও মোটর ড্রাইভার আমাকে এতদূর এনেছিল তবুও তার কাছে মন খুলে কথা বলতে সাহস করলাম না। কখনও বা চুপ করে থাকছিলাম আর কখনও বা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম। মান্‌চুরিয়াতে কি হয়েছে এবং হচ্ছে তার যেন কোন সংবাদ আমি রাখিনা এই কথাই বোঝাবার চেষ্টায় ছিলাম। অনেকক্ষণ কথা হবার পর আমি বল্‌লাম, "যতদিন এই পৃথিবীতে পুঁজিবাদী বেঁচে থাকবে ততদিন অনেক নির্বোধকে মরতেই হবে।" তবুও পরিষ্কার কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থহীন কথা দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদী দর্শন তৈরী হয়। আমি সে দর্শনের সাহায্য নিয়ে কথা বলছিলাম দেখে তিনটি লোকই আমার উপর চটে গেল এবং বল্‌ল, "এরূপ দর্শন আমরা আপনার কাছে আশা করিনি।" আমি বল্‌লাম, "কি করব ভাই, সময়টা বড়ই খারাপ, এখন এরূপ দর্শনই ভাল, এর চেয়ে একটু এগিয়ে গেলেই মোটর ট্রাক উলটে যাবে।" হো হো করে তিনটি লোকই হেসে উঠল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করল আগামী কল্য আমি কোথায় যাবো। আমি তাদের জানালাম, "আগামীকল্য ইয়াকোহামা গিয়ে কয়েক দিন থাকব, তারপর যাব টোকিও। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম নগরী দেখবার বড়ই সাধ হয়েছে। সেই নগরী দেখে সেখান থেকে গাড়িতে করে কোবেতে যাব এবং তারপর আমেরিকা যাবার টিকিট কিন্‌ব।" কথাগুলি বলেই তাদের প্রত্যেককে এক খানা করে কার্ড দিলাম এবং তা পড়তে বললাম। তারা কার্ডগুলি পড়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কতক্ষণ পর তারা জিজ্ঞাসা করলে কোবেতে কোথায় আমার

সংগে তাদের দেখা হবে। আমি রামাণীর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললাম, "এই ঠিকানায় কোবেতে থাকব, আপনারা আরও তিন সপ্তাহ পর সেখানে আমার দেখা পাবেন।" 'তাই হবে' বলে যখন তারা উঠছিল তখন এক জন যুবক বললে, "পথেও দেখা হতে পারে, চিনতে পারবেন ত ?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই চিনতে পারব।" তারপর তারা চলে গেল।

সকাল বেলা উঠেই দেখি আকাশ তখনও অপরিষ্কার, কিন্তু পথ প্রশস্ত। সমতল পাব ভেবে রওয়ানা হলাম। ক্রমেই আকাশ আরও অপরিষ্কার হতে লাগল কিন্তু পূর্বদিক হতে বাতাস বয়ে আসার জন্য সাইকেল চালাতে কষ্ট হল না। মাইলের পর মাইল অবলীলাক্রমে চলে যেতে সক্ষম হলাম। মাইল দশেক যাবার পর একটি ডেয়ারী ফার্ম পেলাম। সেখানে প্রিজার্ভ ঘোল, মাখন, ক্রিম এবং ঘন দুধ বিক্রি হচ্ছিল। জাপানীরা তাই কিনে নিয়ে গিয়ে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করত। আমেরিকান্ ধরণে ডেয়ারী ফার্মের সামনেই এক খানা সুন্দর খাবারের দোকান ছিল। তাতে সকল রকম দুগ্ধজাত জিনিষ বিক্রি হচ্ছিল। জাপানী ক্রেতা কেউ ছিলনা। সাদা রুশদের ছেলে মেয়ে এবং ইউরোপীয়ানরাই সেখানকার ক্রেতা ছিল। আমিও গিয়ে বসলাম। সর্বপ্রথম আমি এক বোতল ঘন দুধ কিনে খেলাম, সেজন্য মাত্র কুড়ি সেণ্ট দিতে হয়েছিল। তারপর এক বোতল ক্রিম কিনে যখন ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললাম তখন সকলেই আমার দিকে চেয়ে থাকল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হজম করার শক্তি আছে।

ক্রিম খেয়ে যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই দেখতে পেলাম পথের স্থানে স্থানে ফাটল ছিল, মাটি দিয়ে ফাটলগুলি ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু ভূমিকম্পের ফাটল কখনও বুজে যায়না অথবা সমান হয় না। ইয়াকোহামার প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের কথা প্রায়ই যেমন মনে হচ্ছিল তেমনি মনে হচ্ছিল শীতের প্রকোপ। মাত্র গতকল্য দ্বিপ্রহর থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। যারা সূতী পোষাক পরত তারা গরম পোষাক পরে পথে বের হয়েছে। টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার এবং

পোষ্টগুলি যেন জংগলে পরিণত হয়েছে। দেখতে দেখতে এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন ইয়াকোহামাতে পৌছলাম তখন আমাকে পথে অভ্যর্থনা করার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করছে দেখে একটু আশ্চর্য বোধ করলাম। লোকটি আমাকে পথ দেখিয়ে একটি ভারতীয় ক্লাবের দিকে নিয়ে গেল। সে স্পষ্ট করেই বললে, "এখানে ভারতীয় ক্লাবেই আপনার যাওয়া কর্তব্য।" বিদেশের ভারতীয় ক্লাবগুলি কি চিজ তা জাপানী পথপ্রদর্শকের জানা ছিল না। সে আমাকে ক্লাব হাউসের সামনে দাঁড় করিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারীর বাড়িতে গেল এবং যখন শুনল, ক্লাবে কোনও ভারতীয় পর্যটককে গ্রহণ করা হয় না, অথবা থাকতে দেওয়া হয়না তখন সে সেক্রেটারী মহাশয়ের কথার সুনিশ্চয়তা জানার জন্য আমাকে এসে সকল কথা প্রকাশ করে বললে, "তবুও আপনার একবার যাওয়া দরকার, আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই লোকটা আমাকে যা বলেছে তা ঠিক বলেছে কি মিথ্যা বলেছে।" আমি বিনা আপত্তিতে ভারতীয় ধনী চরিত্র কেমন হয় তা দেখাবার জন্য জাপানীর অনুগমন করলাম।

আমাকে সেক্রেটারী মহাশয় দরজার কাছে দেখেই বললেন, "আমি ত বলে দিয়েছি, আমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হয় না, তবে আসছেন কেন ?"

"শুনেছি আপনাদের ক্লাবে কয়েকটা খালি বিছানা রয়েছে, তার একটিতে যদি তিন দিন থেকে যাই তবে আপনাদের ক্ষতি হবে না, আমার কিছু লাভ হবে।"

"লাভ লোকসান্ বুঝি না, you better come tomorrow."

আর দাঁড়ালাম না। যে পথ ধরে ঢুকেছিলাম সেই পথ ধরেই বের হয়ে এলাম। জাপানী পথপ্রদর্শক মাথা নত করে আমার সংগে কতক্ষণ চলে বলল,— "ক্ষমা করবেন পর্যটক, আমার অন্য ধারণা ছিল। আমার ধারনা বদলে গেছে, চলুন আপনার জন্য লজিং ঠিক করা যাক।" আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। লোকটির কথা মত চলতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ চলার পর একটি প্রসিদ্ধ স্থানের একটি লজিং হাউসে এসে পৌছলাম। লজিং হাউসের মালিক একজন

জাপানী জাহাজী কাপ্তান। তিনি ঘর থেকে বের হয়েই বললেন, "আপনাকে আমি অপমানিত করব না। আপনি দৈনিক এক ইয়েন দিয়ে এখানে শুধু থাকতে পারবেন। খাবেন যেস্থানে আপনার ভাল লাগে।" আমি কোন প্রতিবাদ না করে তাঁরই লজিং হাউসে স্থান নিলাম। আমাকে যে পথ প্রদর্শন করে এনেছিল, সে বললে, অন্য সময় এসে দেখা করবে। আমি লোকটার ব্যবহারে সুখী হয়েছিলাম।

কাপ্তান আমাকে তাঁর পরিচয় দিলেন এবং তাঁর নাম ইতো বললেন। আমার সংগে তিনি বেশ ভাল ব্যবহার করেছিলেন, এমন কি অন্যত্র স্নান করতে না পাঠিয়ে তাঁর নিজের ঘরে স্নান করতে দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমার হাতে টাকা পয়সা খুব কমই আছে, সেজন্যই এই সৌজন্য। আমিও তাঁর সৌজন্যে সুখী হয়েছিলাম এবং দুটা দিন কোথাও না গিয়ে বিশ্রাম করেই সময় কাটিয়ে দিয়েছিলাম। এই দুই দিনের মধ্যে শুধু পথপ্রদর্শক লোকটিই বারে বারে আমার ঘরে আসত এবং এমনি ভাবে কথা বলত যাতে করে আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারতাম না। লোকটি আমার কাছ থেকে তিনটি শব্দের অর্থ শিক্ষা করেছিল যথা Right of work, explotation এবং religion. এই তিনটি শব্দের দ্বারাই যারা অনুসন্ধানী তারা যে কোন শ্রেণীর লোককে সহজেই অনুমান করে নিতে পারে, কাপ্তান ইতোও তারই দলের লোক। তাঁর আচার ব্যবহার অন্য ধরণের ছিল। তিনি কখনও জাপানী পোষাক ব্যবহার করতেন না। কথা প্রসংগে একদিন বলেছিলেন, "পূর্বদেশীয় পোষাকই পূর্বদেশীয় লোকের শত্রু। একথা কি লোকে সহজে বুঝিবে? যে দিন বুঝবে সেদিন দেখবে সবই হারিয়ে গেছে।" কাপ্তান ইতো যখনই সময় পেতেন তখনই তিনি আমাকে কফির দোকানে নিয়ে যেতেন এবং ঘরে বসে নানারূপ গল্প করতেন।

পথপ্রদর্শক লোকটী একদিন বলেছিল, "আমাদের দলের ধারণা ছিল আপনিও ধনী সম্প্রদায়ের লোক। এক মাস পূর্বে বোম্বের এক পর্যটক এসেছিলেন।

তাঁকে ঘরে নেবার জন্য ভারতীয় ক্লাবের এই সেক্রেটারী আমার মতই পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। পর্যটক যখন এলেন তখন তাঁর গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়েছিল। অনেকগুলি লোক তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে তাদের ক্লাবে গিয়ে বেশ খানাপিনা করেছিল! তাঁর ভালমন্দ দেখার জন্য দুজন গেইসা নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর আপনার সংগে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। আপনাদের দেশের ধনীরা কত দুর্দান্ত, আপনারা এদের আওতায় থেকে কি করে বেঁচে আছেন?" আমি এসব কথার উত্তর দেই নি।

জাপানী বাহাদুর ছেলে

কাপ্তান ইতো আমার কাছে যে কয়টি গল্প বলেছিলেন তারই একটি পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিচ্ছি। ইয়াকোহামাতে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। লোক বাড়ি ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়িঘর চাপা পড়ে অনেক লোক আর্তনাদ করছে, অনেক স্থানে আগুন লেগেছে। কেউ কাউকে সাহায্য করছে না। পুলিশ কোথায় চলে গেছে। ছোট ছোট গলিপথে ফাটল ধরেছে। ফাটলগুলি হতে কখন কর্দমাক্ত ধোঁয়া আর কখন বা গরম জল বেরিয়ে আসছে। অনেকে গড়াগড়ি দিয়ে ফাটলের ফাঁকে পড়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অনেকে ফাটলের কাছে গড়িয়ে এসেও সামান্য কিছু ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময় বীর বালক সিজোইমা তার ছোট্ট ভাইটিকে পিঠ হতে নামিয়ে একটি রসি যোগাড় করে তাই দিয়ে ছোট ভাইটির পায়ে বাঁধল এবং রসির অন্য মাথা প্রকাণ্ড একটা কাঠের সংগে বেঁধে রাখল। বেঁধে রাখার কারণ হল, তার অবর্তমানে যদি ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে কোনও খাদে পড়ে যায় তবু তাকে পাওয়া যাবে।

পনেরো বৎসরের ছেলে। সর্বপ্রথমে কয়েকজন প্রৌঢ়কে ফাটলের কাছ থেকে সরিয়ে সে তাদের প্রাণ বাঁচাল। তারপর অনেকগুলি লোককে ঘর হতে টেনে বের করল। যাদের বের করেছিল তাদের মধ্যে অনেক মৃতদেহও ছিল। সে যখন উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত ছিল তখন তার পাশেই একটা বাড়ীতে আগুন ধরে যায়। আগুন নিবানো তার দ্বারা সম্ভব হবে না ভেবে সে ফিরে আসে তার ভাইয়ের কাছে। এসেই যা দেখল তাতে তার মুখ শুকিয়ে উঠল। মাথা ভন্ ভন্ করতে লাগল। কিন্তু সে সাহস হারাল না।

সে দেখতে পেলে তার ছোট ভাইটি একটি ফাটলে পড়ে গেছে। য গাছটাতে রসিটা বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেই গাছটা অনেকটা ফাটলের দিকে ্ঁকে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি না করে ফাটলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং াসিটা ধরে বুঝল রসিটাতে তার ভাইয়ের পা বাঁধা আছে। তৎক্ষণাৎ সে াছটার মাথার দিকে এসে আর একটা মোটা রশি এনে গাছটাকে একটা টেলিগ্রামের থামের সংগে বেঁধে ফেল্‌ল। তারপর সে অম্লান বদনে ফাটলের কাছে গিয়ে রশি ধরে প্রথম টানল, তারপর যখন দেখল রশি উপরের দিকে উঠে আসছে না তখন মৃত্যুভয়কে তাচ্ছিল্য করে অতি সন্তর্পণে ফাটলের ভেতর গিয়ে প্রবেশ করল।

ফাটলের ভেতর অন্ধকার এবং কর্দমাক্ত। সেই অন্ধকারে সে মাত্র রশিটিকে ভরসা করে ক্রমেই নীচে নামতে লাগল। অনেকক্ষণ যাবার পর তার ছোট ভাইটির ক্রন্দন শুনতে পেল। তাতে সিজোইমার সাহস আরও বেড়ে গেল। সে অতি সন্তর্পণে আরও নীচে নেমে গিয়ে তার ভাইয়ের হাতখানা ধরে টান দিল এবং নিজের কাছে ভাইটিকে টেনে রশিটির সাহায্যেই ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। যখন সে উপরে উঠে এল তখন অনেকগুলি লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। যারা অপেক্ষা করছিল তাদের মধ্যে তার মা বাবাও উপস্থিত ছিলেন। ছুটি ছেলেকে জীয়ন্ত পেয়ে মা-বাবা কত আনন্দিত হয়েছিলেন সে আনন্দের আস্বাদ তারাই বুঝবে যারা ছেলে মেয়েকে মৃত্যুর হাত থেকে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আর যারা উপস্থিত ছিল তারা শুধু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছিল। তাদের সেই বাক্যহীনতাই বহু প্রশংসার চেয়েও মুখর।

ইয়াকোহামা যখন সাধারণ অবস্থায় ফিরে এল তখন ইউরোপের লোক ছেলে-টিকে নানারূপ মেডেল এবং প্রশংসাপত্র দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল। ভারতের লোক সে সংবাদ রাখত না, কারণ ভারতের সংবাদপত্রসেবীরা নানা ভাষায় অভিজ্ঞ

না থাকায় এবং নানা দেশের সংবাদপত্রের সংগে সম্পর্ক না রাখায় এতবড় সংবাদটি জানতে পারে নি।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের মালিকরা বিদেশের সংবাদপত্র হতে অনুবাদ করে কি করে নিজের দেশের লোকের কাছে সংবাদ সরবরাহ করতে হয় তার সন্ধান এখনও তেমন পাননি।

কাপ্তান ইতো আমাকে গল্পটি বলেই তাঁর ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঐ যে দেখছেন লোকটি এটিই সেই। আমার একমাত্র কন্যা তাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। আমি তাতে মত দিয়েছি কিন্তু আমার গৃহিণী ধনীর কন্যা তিনি এখনও মত দিতে পারছেন না। সেজন্যই বিবাহে দেরী হচ্ছে আমার মনে হয় ধনীর কন্যা সত্বরই মত দিয়ে আমাকে এবং আপনাকে বাধিত করবেন।" সায় দিয়ে বললাম, "ধনীর কন্যা জাপানী বাহাদুর ছেলেকে আপন করে নেবেন এটা সকলেই চায় এবং এতে তিনি নিশ্চয়ই মত দিয়ে জাপানী বাহাদুর ছেলেদের আরও বাহাদুর করে তুলবেন।"

কাপ্তান ইতো অনেক দিন মালয় দেশে ছিলেন এবং সেদিকের ছোট ছোট সাগরগুলিতে জাপানী জাহাজ চালাতেন। সেজন্যই তিনি মালয় ভাষা ভাল করে শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমিও মালয় ভাষা জানতাম বলেই তিনি আমাকে তাঁর ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাপানের উদার-নৈতিক দলের লোক। তানাকা মেমোরিয়াল অথবা ব্ল্যাক ড্রাগনিষ্টদের মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি এটা বিশ্বাসও করতেন না যে কোনও এক দেশ অন্য দেশকে নিজের অর্থ এবং রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন করে দিয়ে ঘরে চলে আসতে পারে। জাপানীদের মানচুরিয়া বিজয় তিনি মোটেই পছন্দ করেন নি, এমন কি তিনি তাঁদের জাতীয় ধর্ম সিনটোইজমকে ইসলাম ধর্মের ফেনাটিসিজমের সংগে তুলনা করে সুখী হতেন।

কথা প্রসংগে তিনি বলেছিলেন, "ঐ যে বাহাদুর ছেলে, তার নিজের বাড়ি বলে

কিছুই নেই। তার জন্ম হয়েছিল নৌকায়। তার কাজ আরম্ভ হয় ইয়াকো-হামার দরিদ্র পাড়াতে। যাদের জন্ম দরিদ্র পাড়াতে, যাদের বংশের পরিচয় নেই তারা যে এই পৃথিবীতে কিছুই নয়।" কিন্তু তিনি অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক লোকের সংগে মেলামেশা করেছেন সেজন্যই তিনি তাঁর কন্যাকে একটি সামান্য লোকের সংগে বিয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন।

জাপানীদের মেয়ের বিয়ে পিতার আদেশের উপর তেমন নির্ভর করেনা যেমন নির্ভর করে মায়ের আদেশের উপর। কাপ্তান ইতোর মেয়ের বিয়ে বাহাদুর ছেলের সংগে হয়েছিল কি না জানি না। বাহাদুর ছেলের সংগে কথা বলে বুঝতে পেরেছিলাম সে মজুর সংঘ গঠনের পক্ষপাতী এবং তারই উদ্দীপনাতে ১৯২৪ সালে টোকিও সহরে একটি মজুর বিদ্রোহ হয়েছিল। অবশ্য সে মজুর বিদ্রোহ কয়েক-দিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং যারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তারা অনেকেই কিছু জানে না বলাতে কারাগারে যাওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিল।

কোন এক স্থানে আমি বলেছি জাপানীরা পরভুক। তাবলে জাপানীরা মানুষ কেটে মানুষের মাংস খায় না। তারা মানুষের মন পরিবর্তন করতে বড়ই ওস্তাদ্। যেদিন টোকিওতে মজুরদের ধর্মঘট হয় সেদিন পুলিশ মজুরদের একটি কথাও বলেনি বরং উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাজ না করার কারণ কি মহাশয়গণ?" মজুরগণ যখন পুলিশের কাছে বেতন বৃদ্ধির কথা উত্থাপন করেছিল তখন পুলিশ জানিয়েছিল, "এসব বিষয় নিয়ে আমরা চর্চা করিনা। আপনারা তাদের কাছেই যাবেন যারা আপনাদের বেতন বৃদ্ধি করছে না।" মালিকদের কাছে যখন মজুরগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য গিয়েছিল তখন মালিকরা মজুরদের জানিয়েছিল, "আমরা জাপানী জাতের ভৃত্য মাত্র, আপনারা বলুন কত মাইনে বৃদ্ধি করতে হবে।" কত বেতন বৃদ্ধি করতে হবে কেউ বলতে পারল না। অবশেষে একজন মালিক বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনাদের মাইনে বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে হবেনা। আপনারা হলেন জাতির মেরুদণ্ড। আমাদের

মেরুদণ্ড যাতে না ভাংগে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব। আপনারা কাজ করে যান।" সামান্য মজুর কথার মোহে ধনীদের কাছ থেকে চলে আসতে বাধ্যহল।

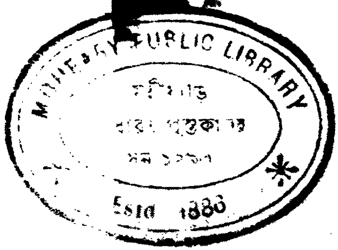
তারপর কথা হল জাপানী জেল নিয়ে। জাপানী জেলে জাপানী কয়েদী খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ বড়ই ভয়াবহ। জাপানী জেলে কাজ মোটেই করতে হয় না। স্নান আহার এবং শোবার বেশ ভাল বন্দোবস্ত আছে। আমাদের দেশে যারা ডিটেনসন কেম্পে বাস করে এসেছেন তাঁদের মতই জাপানী কয়েদীরা থাকে। একজন জাপানী কয়েদী হয়ত মন দিয়ে একখানা বই পড়ছে, হঠাৎ একজন ওয়ার্ডেন এসে তার হাটুতে রুল দিয়ে এমনি একটা আঘাত করল যার জন্য কয়েদীটিকে অন্তত একমাস কাল হাসপাতালে থাকতে হল। হঠাৎ এসে একজন কয়েদীকে অন্য আর একটা রুমে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করা হল এবং তাকেও হাসপাতালে পাঠান হল। এক দিন খুব ভাল খাদ্য দেওয়া হল অথচ জল খেতে দেওয়া হল না। এরূপ করে জাপানী কয়েদীদের নির্যাতন করা হয়, সেকথা অনেকের মুখেই শুনেছি। জাপানী জেলে যাবার সৌভাগ্য হয়নি, সেজন্য এ বিষয়ে আমি একদম নীরব থাকতেই ভালবাসি।

কোনও ভারতবাসীকে জাপানী জেলে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেবার প্রথা তখনও ছিল না। কোবে, ইয়াকোহামা এবং টোকিওতে তিনজন শিখকে ভারতবাসীর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য রাখা হয়েছিল। তারা প্রত্যেকে মাসে ষাট ইয়েন করে মাইনে পেত। যদি কোন ভারতবাসী মাতাল হয়ে জাপানীদের উপর অত্যাচার করত তবে শিখ সেপাইটিকে ডেকে এনে ভারতবাসীটিকে তার হাতে অর্পণ করা হত। সে যে ঘরে থাকত তারই পাশে একখানা খালি ঘর ছিল এবং সেখানেই দোষী ভারতবাসীকে আটকিয়ে রেখে শিখ সেপাইটি কয়েকদিন পর বিচার করত এবং তার বিচারের নির্দেশই চরম বলে গণ্য হ'ত। শিখ পুলিশই বল আর মাজিষ্ট্রেটই বল, সে কারো প্রতি কোনরূপ জুলুম করত না অথবা কারো কাছ থেকে ঘুষও খেত না। জরিমানার টাকা সে নিজের



বিনুজোলা বাদ্যে রত জাপানী মহিলা





নারার বৌদ্ধ মন্দিরের ফটক

কাছেই রেখে দিত এবং মাইনের সংগে সেই টাকা কেটে রেখে দিত। প্রকৃত পক্ষে মাতাল হওয়া ছাড়া জাপানে কোনও ভারতবাসী আর কোনও অন্যায় কাজ করত না বলেই, কোবে শহরের শিখ-পুলিশ-মাজিষ্ট্রেট মহাশয় আমাকে বলেছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই জাপানী জেলের কাহিনী শুনেছিলাম। তার জাপানী জেলের কাহিনীর সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখবার মত আমার সময় ছিল না।

ইয়াকোহামাতে আসার পর আমার কথা বলার লোক বেড়েছিল। কিন্তু আমাদের অতি সন্তর্পণে কথা বলতে হ'ত। কে যে কোন প্রকৃতির লোক তা বোঝা সহজ কাজ ছিল না। একই পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক দেখা যেত: ব্ল্যাক ড্রাগনিষ্ট, খাঁটি সিন্টো, পলিটিকেল সিন্টো, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি। কমিউনিজমও দেখা দিয়েছিল, তবে যারা কমিউ-নিজম নিয়ে কথা বলত তাদের স্থান প্রায়ই জেলে হ'ত। কমিউনিষ্ট বলে গণ্য হয়ে যারা জেলে যেত তারা বেশির ভাগই অকালে মারা যেত।

কয়েক দিন পর আমি টোকিওর দিকে রওয়ানা হই। ইয়াকোহামা থেকে টোকিও মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার। শহর ছেড়ে যখন বের হয়েছিলাম তখন মনে হয়নি শহর ছেড়ে এসেছি। মনে হচ্ছিল যেন ইয়াকোহামারই একটি শহরতলীতে চলছি। এমনি করে যখন চলছিলাম তখন সেই পত্রখানার কথা মনে পড়ল।

একটু অনুসন্ধান করেই যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। একজন মহিলা আমার কাছ থেকে পত্রের ঠিকানাটি দেখেই পথ দেখাতে আরম্ভ করলেন এবং যে বাড়িতে আমার যাবার কথা ছিল সে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। ঘরের দরজা খুলে যে লোকটি বের হলেন, তাঁকে দেখেই আমার দুঃখ হল। চোখগুলি গর্তে ঢুকে গেছে। গালের হাড়গুলি বের হয়ে আসছে। হাত দুখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বুকের হাড়গুলি গুণতে পারা যায়। কথা

বলার সময় ঠোঁট কাঁপছিল। আমি তাঁর কম্পিত হাতে নোটগুলি সমেত টাকাগুলি দিয়ে এক পাশে বসে পড়লাম। চিঠিখানা পড়েই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "বন্ধু, আমরা মানুষ, আমরা মানুষের পাওনা মানুষের কাছ থেকে আদায় করবই। আমাদের সামনে যে সকল শয়তান্ রয়েছে তাদের সংগে যদি আমরা সৎব্যবহার করি তবে আমরা বোকা। শয়তানের সংগে শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয় বন্ধু। মনে রেখো আমরা পূর্বদেশের লোক; ধর্মের ভাঁওতায়, সজ্জনতার ভাঁওতায় আমরা ভুলে যাই। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম, তারই ফলে আমার এই দুর্দশা। কখনও পুঁজিবাদী শয়তানদের বিশ্বাস করবে না। পুঁজিবাদী শয়তানরা যেমন ছলে, বলে, কলে কৌশলে আমাদের ধরে শাস্তি দিচ্ছে আমরাও তেমনি ছলে, বলে, কলে কৌশলে এই পুঁজিবাদী শয়তানদের সর্বস্ব কেড়ে নেব। এতে যারা অন্যায় মনে করবে তারাই কাপুরুষ। বন্ধু বস, আমার স্ত্রী তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছে।" আমি একটি কথাও না বলে এক পাশে বসে রইলাম তারপর আধমরা লোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "ভেবনা বন্ধু, আমি জাপানী আর তুমি ইণ্ডিয়ান, আমরা সবাই সমান। বুভুক্ষুর আবার দেশ কি, জাত কি, ধর্ম কি, সম্মান অসম্মান সবই সমান। আমাদের ভুলিয়ে রাখার জন্যই পুঁজিবাদীরা এসব সৃষ্টি করেছে।" লোকটার চোখ দিয়ে যেন আগুণ বের হচ্ছিল। এরূপ জাপানী লোক আর দেখতে পাইনি।

খাবার এল। দেখলাম এটা জাপানী খাদ্য নয়। রুটি, মাখন, ইংলিশ চা এবং কয়েক খানা বিস্কুট। খাদ্য বেশ ভাল লাগল। যা দেওয়া হয়েছিল তার সবটাই খেয়ে ফেললাম। তারপর বললাম, "বন্ধু, আমরা যে এখনও স্বাধীন হইনি, এক গুণে ত দুই গুণতে হবে?"

"হাঁ তাই বন্ধু, কিন্তু মনে রেখো ঐ শয়তান্দের।"

খাওয়া সেরে যখন বের হয়ে এলাম তখন মনটা হালকা হয়ে গেল।

আমার সাইকেল ফন্ ফন্ করে চলতে লাগল। কতক্ষণ পর টোকিও শহরের সীমানার মধ্যে এসে পড়লাম। মনে দ্বিগুণ আনন্দ হল। এতদিন পর আমি আজ পৃথিবীর একটি বৃহত্তম নগরীতে পদার্পণ করেছি। তৎক্ষণাৎ মনে হল যদি প্রবল ইচ্ছা থাকে তবে পংগুও পর্বত লঙ্ঘণ করতে পারে। টোকিও পৌছুতে পারলাম দেখে মনে হল আমরাও একদিন পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হতে পারব।

টোকিও

টোকিওতে গিয়ে কোথায় থাকব তা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টোকিও নগরীর ভেতরে যতই প্রবেশ করছিলাম ততই টোকিও দেখার মোহ কমে গিয়ে কোথায় থাকব তারই চিন্তায় মন ভরে উঠছিল। কাপ্তান ইতো বলেছিলেন টোকিও-র দরিদ্র পাড়ায় আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। যেদিন টোকিওর দরিদ্র পাড়ায় গিয়েছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল টোকিওর দরিদ্র পাড়ায় থাকা বাস্তবিকই অসম্ভব। প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে, তথাকথিত তীর্থস্থানে যেমন তথাকথিত পাপী থাকে ঠিক তেমনি রাজধানীতেও দরিদ্র বাস করে। আমি ভাবছিলাম কোথায় যাই! শহরের বড় বড় হোটেলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না একথা আমার জানা ছিল, এদিকে পুলিশও আমার প্রতি আর দৃষ্টি রাখত না। তবে এটা আমার জানা ছিল, বিপদে পড়লে জাপানী পুলিশ সাহায্য করবেই। সেই ভরসাতেই বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত শহরের সর্বত্র বেড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিকাল বেলাতে বেশ রৌদ্রও ছিল, এমন মিষ্টি রৌদ্রে বাইরে না থেকে ঘরে যাওয়া রোগীর আর ভোগীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু পাঁচটার পরই হঠাৎ সূর্য অস্ত যেতে চলল। ঠাণ্ডা বেশ অনুভব হতে লাগল, আমি আর বিলম্ব না করে একটি পুলিশের কাছে গেলাম। পুলিশ আমার নাম তার বইএ না দেখতে পেয়ে কি ভাবল, তারপর কচ্ছপের মত গজেন্দ্র গমনে তার ষ্টেশনে গেল। আমি তার পেছন পেছনই ছিলাম। পুলিশ-ষ্টেশনটি দৈর্ঘে দশ হাত এবং প্রস্থেও তাই হবে বলে মনে হল। সেখানে মাত্র চারজন পুলিশ একত্রে বসতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় তখন মাত্র দুজন পুলিশই বসে ছিল।

আমরা পৌঁছামাত্র এক জন পুলিশ জাপানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল আমি কি চাই। আমি বললাম, "আমি এমন একটি হোটেলে যেতে চাই যার দৈনিক শোবার ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট।" সেও কতক্ষণ ভেবে রিসিভারটা হাতে নিয়ে বললে, "আননে, আনো ইয়থো লিগো কা?" এর মানে হল "হালো, এটা কি ইয়ুথ লীগ?" জবাব কি পেল তা আমি বুঝতে পারলাম না। রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়ে পুলিশ অফিসার একখানা মানচিত্র আঁকলে, তারপর তাই আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই নক্সা বুঝবার চেষ্টা করুন।" আমি নক্সাখানা বুঝবার পর নক্সার নীচে কি লিখে দিল এবং বলে দিল যথাস্থানে পৌঁছবার পর যেন পুলিশ অফিসারকে টেলিফোন করি। কার কাছে কোথায় টেলিফোন করতে হবে তাও তাতে লেখা ছিল।

মানচিত্র হাতে নিয়ে পুলিশ অফিসারকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানালাম এবং মানচিত্র অনুযায়ী পথ চলতে আরম্ভ করলাম। আমাদের দেশে দায়ে ঠেকে পুলিশকে নমস্কার করে। চীন জাপানে তার বিপরীত, কৃতজ্ঞতার ছায়া তার পেছনে থাকে। জাপানে জেন্দআর্ম বলে এক শ্রেণীর পুলিশ থাকে, তাদের কাছে আমি কখনও যেতাম না আর যদিও বা তারা আমার মুখোমুখি হত তবুও মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে বাধ্য হতাম। জেন্দআর্ম জাপান সম্রাটের পার্শ্বচর। তাদের টুপিতে লাল ফিতা বাঁধা থাকে। প্রত্যেক নাগরিককে জেন্দআর্ম পুলিশ দেখা মাত্র মাথা নত করতে হয়। বিদেশী লোকের প্রতি এই আদেশটি বলবৎ ছিলনা কিন্তু আমাদের মত লোক দেখা মাত্র জেন্দআর্মের লোকের সেলাম পাবার ইচ্ছা আপনি এসে যেত। মানচিত্র অনুযায়ী পথ চলে সূর্যাস্ত হবার পূর্বেই ইয়ুথ লিগের দরজার সামনে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। মনে মনে মানচিত্র অংকনকারী পুলিশটিকে ধন্যবাদও জানিয়ে ছিলাম।

সেখানে কয়েক জন সেক্রেটারী ছিলেন। আমি তাঁদের সেক্রেটারী না বলে দোভাষী বলব। সেখানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড় বড় ভাষার দোভাষী ছিলেন।

এই পৃথিবীতে তিনটি বড় ভাষা—ইংলিশ, ফ্রেন্‌চ্‌ এবং স্পেনিস্‌। এই তিনটি ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় অভিজ্ঞ কয়েকজন লোক ছিলেন, যেমন চীনা, মালয়, শ্লাভ, এস্‌পেরেন্ত। এস্‌পেরেন্ত ভাষায় অভিজ্ঞ লোকটিকে হালে গ্রহণ করা হয়েছিল। জাপানী ভাষার কোনও অফিসিয়েল দোভাষী ছিলেন না কারণ জাপানী ভাষা বৃহত্তম ভাষাভাষীদের মধ্যে আসে না। এদিকে জাপানীদের অপক্ষপাতিত্ব দেখে সুখী হয়েছিলাম। সেক্রেটারীদের টেবিলের সামনে যিনি যে-ভাষা জানেন তা দেখলাম। আমি English speaking যে স্থানে লেখা ছিল সেস্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাধারণত ভারতে প্রথমেই যে "What can I do for you" বলা হয়ে থাকে ভদ্রলোক তা বললেন নি। আমাকে সর্বপ্রথমই দোভাষী মহাশয় বল্‌লেন, "পুলিশ আপনার আসার কথা জানিয়েছে, আপনার জন্য রুম ঠিক করে রেখেছি, ভদ্রলোকের সংগে যান' তিনি আপনার রুম দেখিয়ে দেবেন।" ইতিমধ্যে এক জন যুবক আমার সাইকেলটি গুদামে নিয়ে গেলেন। সাইকেলটি সযত্নে একটি গুদামে রেখে এলেন, তিনি আমেরিকা হতে বি-এস্‌-সি পাস করে এসেছেন এবং বর্তমানে জাপানী ভাষা শিক্ষা করছেন। তাঁর জন্ম আমেরিকায় হয়েছিল বলে জাপানী হয়েও তিনি জাপানী ভাষা জানতেন না। তাঁর কর্মকৌশল দেখেই মনে হয়েছিল তিনি শুধু জাপানী ভাষা শিখছেন না আরও কিছু শিক্ষা করছেন যার সাহায্যে তিনি ভবিষ্যতে একজন বড় ডিপ্লোম্যাট হতে পারবেন। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং দুদিন ক্রমাগত আমাকে আমেরিকা সম্বন্ধে নানরূপ সংবাদ দিয়ে সুখী করেছিলেন। আমি দুদিন ইয়ুথ লিগ হতে বের হইনি কারণ আমাকে উত্তরের শীতে কাবু করে ফেলেছিল।

রাসবিহারী বসু

টোকিওতে দুদিন জাপানী ইয়ুথ লিগে থাকার পর মনে হল, যদি রাসবিহারীর সংগে দেখা করার জন্য ভবিষ্যতে দুঃখ কষ্ট আসে আসুক, এবার রাসবিহারীর সংগে দেখা করবই। সেজন্য সকালবেলা উঠেই দোভাষী বি-এস্‌-সি যুবকের অনুসন্ধানে বের হলাম। যুবক তখন ঘরের মেজেতে ইউরোপীয় ধরণের একটি ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল। আমাকে দেখা মাত্র সে সুপ্রভাত জানিয়ে বল্‌ল, "আজ কোথায় যাবেন ?"

"আজ আমি আমাদের দেশের বিদ্রোহী বীরের সংগে দেখা করতে যাব, আপনি দয়া করে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বাধিত করবেন, নতুবা সংগে যেতে হবে।" যুবক হেসে বল্‌লে "বেলা নটার সময় আমি কাজ হতে মুক্ত হব, তখন আপনাকে নিয়ে পথে বের হতে কোন কষ্টই হবে না। আপনার রুমে গিয়ে বসুন, আমি সময়মত আসব।"

জাপানী ইয়ুথ লিগের ইউরোপীয়ান্ খাদ্যের রেস্তোরাঁ বেলা নটার সময় খোলে। ভাবলাম একটু পেটটা ভর্তি করে বের হওয়াই ভাল। সেজন্য চুপ করে রুমে গিয়ে বসে থাকলাম। একটু বসতে না বসতেই শুনতে পেলাম কতকগুলি সেপাই মার্চ করে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালাম। দেখতে হবে কি করে এরা মার্চ করে। ইয়ুথ লিগের বাড়িটা প্রকাণ্ড। চারিদিকে পাইন গাছ। একটা বড় পার্ক বল্‌লেও দোষ হয় না। অনেকদূরে সেপাইরা মার্চ করে যাচ্ছিল। তাদের বুটের শব্দ কানে পৌছিল, চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু পাইন গাছগুলি এতই ঘন ছিল যে সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। কতক্ষণ পরে সেপাইএর দল চলে গেল। আমিও চুপ করে বসে থাকলাম। হঠাৎ মনে

হ'ল এরূপ ভাবে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। পাশের রুমে কে কে আছে দেখে আসা ভাল। পাশের রুমে গেলাম এবং দেখতে পেলাম কয়েকটি যুবক মিলে একটি জাপানী খেলা খেলছে। জাপনীদের খেলা শিক্ষাপ্রদ এবং তাতে বেশি বাক্যব্যয় করতে হয় না। কতকগুলি কাঠের টুকরা একটি বাক্‌সে পড়েছিল, তাই এক এক জন পালাক্রমে উঠিয়ে একটা দুর্গ তৈরি করতে চেষ্টা করছিল আর কেউবা দুর্গটা ভাঙতে চেষ্টা করছিল। খেলাটি চমৎকার। আমি অনেকক্ষণ বসে তাদের খেলা দেখলাম। বোধ হয় এদের খেলা আধঘণ্টারও বেশি দেখছিলাম কিন্তু এই আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি যুবক একটি কথাও বলে নি। এদের জিহ্বার সংযম দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। নটা বেজে গেল। তখনও রেস্তোরাঁ যাওয়া আমার হয় নি। দোভাষী এবং পথপ্রদর্শক যুবক এসে আমায় ডাকল। আমি ঘর হতে বের হয়ে এলাম এবং খেলার কথা বল্‌লাম। যুবক বল্‌লে, "এরূপ অনেক খেলা আছে যাতে একটিও বাক্যব্যয়ের দরকার হয়না।" যুবকেরও একখানা বাইসাইকেল ছিল। কিছু না খেয়েই উভয়ে বাইসাইকেল নিয়ে বের হলাম। আমরা সোজা রাসবিহারী বাবুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। আধঘণ্টা ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে রাসবিহারী বাবুর দরজার কাছে পৌঁছে ভাবলাম এবার কি করা যায়? একখানা কার্ড পাঠানোই ভাল হবে। যদি তিনি কোনও কাজে ব্যস্ত থাকেন, হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে সেকাজে হয়ত বাধা পড়তে পারে। সেজন্য একখানা নিজ নামের কার্ড পাঠিয়ে দিলাম। কার্ডে লেখা ছিল "রামনাথ বিশ্বাস একজন ভারতীয় পর্যটক, তিনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।" দুমিনিটের মধ্যে জবাব এল "রাসবিহারী বসু এখন কাজে ব্যস্ত আছেন, তিনি আগামী কল্য সকালে মিষ্টার রামনাথের সংগে সাক্ষাৎ করে সুখী হবেন"। চিঠির জবাব সাথীকে দেখালাম এবং তাকে বল্‌লাম, "বন্ধু, আগামী কল্য আর আপনাকে আসতে হবে না, আমি নিজেই আসতে

পারব, এখন চলুন একটি ভাল রেস্তোরাঁতে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক।" যুবক তাতে সুখী হল এবং আমরা উভয়ে একটি বিদেশী রেস্তোরাঁতে গিয়ে ইচ্ছামত পেট ভরে খেয়ে কি করা যায় ভাবছি এমন সময় সাথের যুবকই বললে, "চলুন আপনাকে বিল্ডিং দেখিয়ে নিয়ে যাব। প্রত্যেকটি বিল্ডিং আর্থকোয়েক-প্রুফ, ফায়ার-প্রুফ এবং বিদেশী কোম্পানীর কাছে ইন্‌সিওর করা।" যুবকের সংগে চলে কয়েকটি বিল্ডিংই দেখলাম যা বাস্তবিকই দেখার যোগ্য। চীনদেশের কোনও শহরে কথা প্রসঙ্গে একজন আমেরিকান্ বলেছিলেন, "জাপানীরা বারুদের স্তূপে বাস করেও মনের সুখে আছে।" কিন্তু এই কটি বিল্ডিং দেখার পর মনে হলনা জাপানীরা বারুদের স্তূপে বাস করে। আগুন ত আগুনই, যে কোন বিল্ডিং-এ যদি একবার ধরে যায় তবে তা হতে রেহাই পাওয়া বড়ই কঠিন। আমেরিকাতেও অনেক পাকা ইমারত আগুনে জ্বলে ছারখার হয়। সত্যকথা বলতে কি জাপানীরা ঘরের দেওয়ালগুলি কাঠ দিয়েই তৈরী করে। কাঠের দেওয়াল থাকলে ভূমিকম্প হতে কমবেশি কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁটের দেওয়াল থাকলে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সেজন্যই জাপানে পাকা বাড়ীর সংখ্যা বেশি নয়।

পাকা বিল্ডিংগুলি দেখে আমরা সিনেমা দেখতে যাই। সিনেমার বিষয়বস্তু ছিল পৌরানিক। আমেরিকান্, বৃটিশ, ফ্রেন্‌চ্, ডাচ্ এবং পর্তুগীজরা কি কৌশল করে জাপানীদের বিদেশীর সংস্পর্শে এনেছিল তারই কথা। সিনেমা দেখানো হচ্ছিল বাইরে একটা পাইন বাগানের ভেতর। অনেক লোক দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল। আমরাও আধঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। সিনেমা দেখা হয়ে গেলে আমরা জাপানী সম্রাট মিকাডোর বাড়ি দেখতে যাই। সম্রাট তখন রাজপ্রাসাদে ছিলেন। সম্রাটের প্রাসাদে কোন সময়ই সাধারণ লোক যেতে পারে না। বিশেষ অফিসারও প্রবেশ করতে পারেন না। আমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারব না তা আমার জানা ছিল। তাই আমরা দূর থেকেই রাজ-প্রাসাদ দেখে

সন্তুষ্ট রইলাম। রাজপ্রাসাদের যে দিকে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে প্রকাণ্ড একটা ময়দান। তার শেষভাগে একটি পরিখা। পরিখার জল বেশ পরিষ্কার। জলের উপর দিয়ে একটি সেতু। সেতুর উপর দিয়ে সম্রাটের ভৃত্যরা আসা যাওয়া করে। সম্রাটের বাড়ির কাছে যেয়েই আমার সাথী হাঁটু গেড়ে জাপানী প্রথায় নমস্কার করল। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। সাথী আমার সে দাম্ভিকতা সহ্য করতে না পেরে বল্‌ল "মাথা নত কর, সম্রাট বাড়িতেই আছেন।" আমি বল্‌লাম, "সম্রাট আপনাদের, আমরাআমাদের সম্রাট, সম্রাট কেন মামুলী রাজাকেও দেখতে পেলে একদিন পুণ্য অর্জন হয়েছে বলে মনে করতাম। কিন্তু সে দিন আর নাই। আজ আমরা রাজদর্শনের পক্ষপাতী নই, আমরাও আমেরিকানদের মত রিপাবলিকান হতে চাই। সবাইকে 'মিষ্টার' রূপে দেখতে চাই। আমাকে এ বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা করতে হবে বন্ধু।" সাথী কিছুই বল্‌ল না। কতক্ষণ পর আমাকে অর্ধপথে ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিল। বুঝতে পারলাম এতে তার মনে বেশ আঘাত লেগেছে কিন্তু কি করব, মন যে অন্যভাবে গঠন হয়ে গেছে এখন আর সহজে মাথা নত করতে ইচ্ছা করে না।

ফেনাটিসিজম্ দুই রকমের। একটা হল ধর্মের ফেনাটিসিজম্ আর অন্যটা হল জাতীয়তাবাদের ফেনাটিসিজম্। উভয়েরই জন্ম ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স হতে। যে ধর্মের লোক যত বেশী দুর্বল তারাই তত বেশী ধার্মিক আর যাদের জাতীয় সংস্থান যত বেশী হীন তারাই তত বেশী উগ্র জাতীয়তাবাদী। জাপানীরা দেখতে পেল তারা বিদেশীর কাছে কিছুই নয়, সেজন্য তারা ভয়ানক উগ্রজাতীয়তাবাদী। একজন ইংলিশম্যানের সামনে তাদের রাজারাণীকে যা ইচ্ছাতাই বল, সে কিছুই বলবে না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি একজন স্কচ সেপাই ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেল্‌ল, লোক্‌টাকে সকলে পাগলই বলল, এর বেশি নয়। অথচ জাপানে যদি কেউ জাপানের পতাকার অবমাননা করে তবে তার কি শাস্তি হবে তা চিন্তা করাও কষ্টকর। চীনে যারা জাপানী পতাকার অবমাননা

করত তাদের ফাঁসি অথবা গুলি করে মারা হত না, তাদের উপর প্রচণ্ড তেজে জলের পাইপ ছেড়ে দেওয়া হত। জল খেয়ে খেয়ে তারা মরত। জাপান সম্রাটের পরিত্যক্ত আণ্ডারওয়ার ধোপা বাড়িতে না দিয়ে শহীদ হবে এমন জাপানী যুবকদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত এবং যারা ভবিষ্যতে শহীদ হবে তারা সেই পরিত্যক্ত আণ্ডারওয়ার অতি যত্নের সহিত রেখে দিয়ে তাকে পূজা করে ভাবত তারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করছে। যদিও বিষয়টা শুনতে বেশ খারাপই শোনায় তবুও বলছি এই বিষয় নিয়ে আমাদের (ভারতবাসীর) সমালোচনা করা পোষায় না। এখনও আমরা পাদোদক পান করি, এখনও আমরা রাজাকে পিতা বলে স্বীকার করি, এখনও আমরা রাজদর্শনকে পুণ্য বলে মনে করি। এসব যদি বাস্তবরূপে দেখতে হয় তবে ভারতীয় নেটিভ ষ্টেটগুলিতে তা এখনও দেখতে পাওয়া যাবে।

বিকাল বেলা যখন ইয়ুথ ক্লাবে ফিরে এলাম তখন অনেকগুলি ছাত্র আমার কাছে এল এবং এস্পেরেন্ত সম্বন্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হল। এস্পেরেন্ত ভাষার বিরোধী আমি সকল সময়ই ছিলাম। ছেলেদের বল্লাম, "আমাদের অনেকগুলি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে হচ্ছে, এর উপর যদি নূতন আর একটা ভাষা শিখতে হয় তবে মৌলিক বিষয়বস্তুকে ফাঁকি দিয়ে সারা জীবন শুধু ভাষা শিখেই কাটাতে হবে। আমি এসবের পক্ষপাতী নই। পরাধীন জাতির পক্ষে নিজের দেশকে সর্বতোভাবে স্বাধীন করাই সর্বপ্রথম কর্তব্য। তারপর কেউ যদি পারে তবে একশটা ভাষা শিক্ষা করুক তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।" আমার কথায় যুবকগণ বড়ই আনন্দিত হল এবং নিজ নিজ রুমে চলে গেল।

রাত্রে দুজন ইংলিশ-জানা ভদ্রলোক এসে আমার কাছে বসলেন এবং আমাকে প্রথমই জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে আপনি মালয়বাসী ইণ্ডিয়ান্ নন্, আপনি ভারতবাসী ইণ্ডিয়ান, কেমন তাই কি?"

আমি প্রথম কথার ভাবেই বুঝতে পারলাম এরা পুলিশের লোক। এদের

চটিয়ে লোকসান ছাড়া লাভ হবে না, সেজন্য বল্‌লাম, "আপনাদের ধারণা ঠিক, আমি মালয়দেশে কাজ করতাম মাত্র। আমার জন্ম এবং শিক্ষা ভারতেই।"

"আপনার চালচলনে মনে হয় আপনি এক জন রাজদ্রোহী। কেমন তা ঠিক কি?"

"না মহাশয়, আপনারা ভুল করেছেন। আমি রাজদ্রোহী নই। কোনও রাজদ্রোহী পাসপোর্ট পায় না।"

জাপানী ভদ্রলোকদ্বয় মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। তারপর অনেক গবেষণা করে বল্‌লেন "Not revolutionary but anti-king."

"কথাটা ঠিক হল না মহাশয়। আমি রাজদ্রোহী নই এবং কোন রাজার বিরুদ্ধাচরণও করি না। আমি আমার ভাবে চলি। কতকগুলি জিনিষ আমি মোটেই পছন্দ করি না, যেমন ভগবান পূজা, মানুষ পূজা ইত্যাদি। আপনারা যদি কন্‌ফিউসনিজম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম কিছু জানতেন তবে এরূপ কথা আপনারা বলতেন না। আমি এই দুটি ধর্ম নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করি, তাই আমি এখন এসব হতে দূরে সরে পরেছি। পূর্বে আমিও রাজদর্শনকে পুণ্য কাজ বলেই ভাবতাম।" দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌লাম, "একবার শ্যামের রাজা পেনাং গিয়েছিলেন, তখন আমি রাজদর্শনের জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার রাজদর্শন হয় নি।"

জাপানী পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, "তবে আজ আপনি আপনাদের দেশের রাজদর্শনে কেন গিয়েছিলেন?"

আমি বল্‌লাম, "আপনারা বোধ হয় রাসবিহারী বসুর কথা বলছেন, কেমন তাই কি?"

"হাঁ মশাই।"

"তিনি ত আমাদের দেশের রাজা নন। তিনি একজন বিপ্লবী। তিনি

আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তারপর যখন বৃটিশ সরকার তাঁর পেছনে লাগে তখন তিনি পালিয়ে আপনাদের দেশে এসেছেন এবং দেশে ফিরে যেতে পারেন না বলেই এখন তিনি আপনাদের দেশের প্রজা। তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য আমি গিয়েছিলাম। তিনি যদি আমাদের দেশের রাজা হতেন তবে অন্তত আমি তাঁর সংগে দেখা করতে যেতাম না।"

"তিনি ভবিষ্যতে হয়ত আপনাদের দেশের রাজাও হতে পারেন।"

আমি বললাম, "রাজা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়, প্রেসিডেন্ট হওয়াটাই ভাল।"

"আপনি দেখছি একজন রিপাব্লিকান।"

"অনেকটা তাই।"

ভদ্রলোকদ্বয় আর কথা না বাড়িয়ে বিদায় নেবার সময় ছায়ানারা অর্থাৎ বিদায় বল্‌লেন। এর মানে তাঁরা আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি সন্তুষ্ট না হতেন তবে স্বরাত্র বলেই বিদায় নিতেন। তাঁরা চলে যাবার পর আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়তে সক্ষম হলাম।

পরের দিন সকালবেলা জাপানী যুবককে না ডেকেই পথে বের হলাম। যাদের এত রাজভক্তি তাদের সংগে কি করা চলে? রাসবিহারী বাবুর বাড়িতে পৌঁছাতে একটুও কষ্ট হল না। ঘরের সামনে যেতেই রাসবিহারীবাবু বাইরে এসে আমাকে আলিংগন করে বল্‌লেন, "চলুন ঘরে যাই, বাড়ি হতে পালিয়ে আসেন নাই ত?"—"পালিয়ে আসার সময় চলে গেছে স্যার, এখন আমার বয়স হয়েছে।"

ঘরে আরও দুজন জাপানী ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁরাও আমাকে সম্মান দেখালেন। পাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার ছেলে, হিন্দুস্থানী বেশ বোঝে, বাংলা একটু আধটু বলতে পারে।" ছেলেটিকে উপহার দেবার মত আমার কাছে কিছুই ছিল না। সেজন্য বড়ই দুঃখিত হলাম। ছেলেটি আমার কাছে দাঁড়াবা মাত্র আমি তাকে কাছে

বসতে বল্‌লাম এবং আমি কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়ে আসছি তাই বল্‌লাম। ছেলেটি কিন্তু গম্ভীর হয়ে সকল কথা শুনল। এরূপ গাম্ভীর্য জাপানী ছেলেদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। সেরূপ গম্ভীর আর একটি ছেলেকে দেখেছিলাম। সেও জনৈক ভারতবাসীরই ছেলে। সে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়েছিল। টাকা দিয়ে কি করেছে জিজ্ঞাসা করায় সে কয়েকখানা জাপানী বই দেখিয়ে বলেছিল আপনার টাকা দিয়ে এই বইগুলি কিনেছি। জাপানী স্ত্রীলোকের গর্ভজাত ভারতবাসীর ছেলেমেয়ে কখনও ভারতবাসী হয় না, তারা হয় জাপানী। ভারতীয়রা যে দেশেই যায় সে দেশের স্ত্রীলোকই বিয়ে করে, জাপানী স্ত্রীলোকও তা হতে বাদ পড়েনি। জাপানী স্ত্রীলোক কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েকে বিদেশী ধর্ম এবং বিদেশী জাতে পরিণত হতে দেয় না, তারা তাদের ছেলেমেয়েকে জাপানী করেই রাখে। এটা জাপানীদের বৈশিষ্ট্য বলতেই হবে। এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য অনেক সময় অনেক জাপানী স্ত্রীলোক বিদেশী স্বামীর সংগ পরিত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মত স্বামীর ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মাথা পেতে নিতে রাজি হয় না। রাসবিহারী বাবুর ছেলেও সেজন্যই বোধ হয় জাপানীই হয়েছিল, ভারতের সংগে বোধ হয় তার তত সম্বন্ধ ছিল না। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। যে দিন থেকে সেমেটিক প্রভাব আমাদের মধ্যে এসেছে সে দিন থেকেই আমরা পিতা ধর্ম পিতা কর্ম এসব কথা শিক্ষা করেছি।

রাসবিহারী বাবুর ছেলের গাম্ভীর্য দেখে তার কি নাম তাও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল না। পুত্রকে বাদ দিয়ে পিতার সংগেই কথা বলতে আরম্ভ করলাম। নিজের দেশের সংবাদ দেবার পর মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীনের কিছুটা বলেই যখন চীনের কথা বলতে আরম্ভ করলাম তখন দেখতে পেলাম, যদিও তিনি চীনের সংবাদ শুনতে ইচ্ছুক তবুও পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে পিতা যেন

কিরকম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাসবিহারী বললেন, "এর পরের ভ্রমণকাহিনী আমি আগামী কাল দুটার সময় শুনব। আপনি আগামী কাল দুটার সময় এসে আমার সংগে সাক্ষাৎ করবেন।" আমি তাতেই রাজি হলাম। জাপান সম্বন্ধে একটি কথাও হল না।

পরের দিন দুটার সময় তাঁর বাড়িতে গেলাম। আমাকে নিয়ে বাইরে আসার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকটি কথা বললেন এবং সেই কথাগুলি যাতে আমার স্মরণ থাকে সেজন্য সেই কথাগুলি লিখে নিতে বললেন। তিনি বললেন, "আপনি আমার ইণ্ডিয়া হতে জাপানে পালান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ কলিকাতার 'প্রবর্তক' নামক মাসিক পত্রিকায় দেখতে পাবেন। কিন্তু হঠাৎ কেন সেই মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আমার আত্মজীবনী প্রকাশ করা বন্ধ করলেন তা মোটেই বুঝতে সক্ষম হইনি। যতটুকু পর্যন্ত আমার পলায়ন কাহিনী 'প্রবর্তকে' বের হয়েছে এখন তাই শুনুন, পরে বাকিটুকু কোনও পার্কে গিয়ে বলব।" আমরা যখন কথা বলছিলাম তখনও রাসবিহারীর পুত্র আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার এরূপভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তবুও যখন তিনি তাঁর পলায়ন কাহিনী আপন মনে বলে যাচ্ছিলেন আমি তাই লিখছিলাম আর ভাবছিলাম বিদেশে পরাধীন জীবন কতই কষ্টের। তিনি বলছিলেন :

"বোমা, বোমা, বোমা বলে হঠাৎ একটা রব উঠল। বোমাতে কে মরল সে সংবাদ কেউ নিল না, লোক শুধু পালাতে লাগল। আমিও পালালাম, সাথীরা কে কোথায় গেল তাদের অনুসন্ধান না করে ঘরে এসে কিছুটা মদ্ মুখে ঢেলে দিলাম আর কিছুটা সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে দিলাম। এতে একটা বোতল একেবারে খালি হল। দ্বিতীয় বোতল হতে কিছুটা মদ কতকগুলি ডালভাতে মাখিয়ে পাশেই ছড়িয়ে দিলাম। যে কোন লোক দেখেই মনে করবে লোকটা মাতাল হয়ে বমি করে শুয়ে রয়েছে।

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ এসে আমার এই দুরবস্থা দেখল। একজন আমাকে একটা পদাঘাত করল। আমি মাতলামির ভাণ করে উঠবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পেরে উঠলাম না। ভাণ করে শুয়ে থাকলাম। পুলিশ আমাকে পরিত্যাগ করে পাশের রুমটা দেখতে গেল। সখানে ছিল অন্য অবস্থা। ব্যবস্থাটা পূর্বেই করে রাখা হয়েছিল। ঘরটা ছিল খালি কিন্তু তাতে তিন বোতল ধেনো মদ এক পাশে যত্নের সহিত রক্ষিত ছিল। পুলিশ সেই স্থানটাই প্রথম দেখল, তারপর যখন তিন বোতল ধেনোমদ পেল তখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

"আমার কলকাতা পৌছার পূর্বেই হংকং যাবার টিকিট কেনা হয়েছিল। কলকাতায় এসে আমাকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। পি, এন্, ঠাকুর সেজে গিয়ে আমি জাহাজে উঠলাম। তখন পাসপোর্ট প্রথা ছিল না। হংকং পর্যন্ত বিনা পাসেই চলাফেরা করা যেত। জাহাজ ছাড়ল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে জাহাজে চলাফেরা করতে লাগলাম। কাপ্তানের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কাপ্তান রবীন্দ্রনাথের পারসনেল সেক্রেটারী পি, এন্, ঠাকুরের বিশেষ আদর যত্ন করতে লাগল।

"হংকং পৌছার পূর্বেই আমার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পাস ঠিক করে রেখেছিল। তারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিল। হংকং হতে যেদিন জাহাজ ছাড়ল সেদিন কাপ্তানের সংগে দেখা হবার পর কাপ্তান বললেন 'আমাদের জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীতে নাকি হাতে ছয় অংগুলি বিশিষ্ট একটা লোক উঠেছিল। সেই লোকটাই নাকি দিল্লীতে বোমা ছোড়ে। হংকং-এ আসার পর সেই লোকটা একটা লস্করকে সংগে নিয়ে পালিয়েছে। অবশ্য এই দুটো লোককে ধরার জন্য পুলিশ খুবই চেষ্টা করবে এবং আমার ধারণা লোক দুটো নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।' কাপ্তান জানত না যে প্রত্যেক হাতে ছয় অংগুলি বিশিষ্ট লোকটি তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে অনেকবারই ইচ্ছা করে

আংগুল দিয়ে অনেক জিনিষই দেখিয়েছিলাম কিন্তু তবুও আমার প্রতি তার কোনও সন্দেহ হয় নি। কেন যে সন্দেহ হয় নি তা পরে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। সে ছিল নেহাতই দরিদ্র পরিবারের লোক এবং সেজন্য অভিজাত বংশের লোকের প্রতি তার শুধু ভক্তিই ছিল, সন্দেহ ছিল না।

"জাহাজ সাংহাই এল। সেখানে অনেক ইণ্ডিয়ান আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য জাহাজে এল। সকলেই আমার সংগে কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করবে তারই প্রোগ্রাম ঠিক করতে ব্যস্ত ছিল। আমিও তাদের নানারূপ প্রোগ্রাম দিয়েই সুখী হচ্ছিলাম। অনেকে তাদের সংগে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করছিল কিন্তু প্রত্যেককেই বলতাম আমার মরবারও ফুরসৎ নেই, কি করে জাপানে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করতে হবে তারই প্রোগ্রাম তৈরীতে ব্যস্ত। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি শহর দেখতেও যাব না। ফেরার পথে সকলের বাড়িতেই খেয়ে যাব।

"কোবেতে জাহাজ হতে নামবার পরও, কয়েক দিন পি, এন্ ঠাকুর বলেই নিজের পরিচয় দিয়ে কাটিয়ে দেবার পর টৌকিওতে পৌছি। এখানে এসে এক জন মন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করি। পোর্টফলিওহীন মন্ত্রীর প্রভাব বেশি ছিল না। তবুও মন্ত্রী মহাশয় আমাকে অতিথি হিসেবে কয়েক দিন রাখলেন। তারপর যখন বুঝলেন আমি একজন পলাতক তখনও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নি। তাঁরই নিকটস্থ এক বাড়িতে থাকবার বন্দোবস্ত হয় এবং একটি রুটির বেকারীর ইন্‌চার্জ করে দিয়ে সচ্ছন্দে খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দেন। এদিকে আমি এত মনযোগের সহিত জাপানী ভাষা শিখতে আরম্ভ করলাম যে তিন সপ্তাহের মধ্যে জাপানী ভাষাতে কথা বলতে শিখে গেলাম। চতুর্থ সপ্তাহে মাইনে পেয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কন্যার জন্য একটি দামী পোষাক কিনে আনলাম। মন্ত্রী মহাশয়ের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। প্রথম দিনের দেখাতেই মেয়েটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আমি

যতই মন্ত্রী পরিবারের সংগে পরিচিত হতে লাগলাম মন্ত্রী পরিবারও আমাকে ততই ভালবাসতে লাগলেন। আমি যে অসৎ প্রকৃতির লোক নই তা দুমাসের মধ্যেই মন্ত্রী পরিবার বুঝতে পারলেন। আমকে প্রকাশ্য ভাবেই মন্ত্রী পরিবার গ্রহণ করতে থাকেন, আমিও প্রকাশ্য ভাবেই একদিন বলে ফেলি 'আমি পি এন্ ঠাকুর নই, ঠাকুর পরিবারের সংগে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।' এতে মন্ত্রী পরিবার মোটেই দুঃখিত হননি বরং সত্যকথা বলার জন্য সুখী হয়ে যাতে আমি জাপানী নাগরিক হতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। জাপানী প্রজা হতে হলে নিজের পরিচয় ঠিক ঠিক ভাবে দিতে হয়। আমার যথার্থ পরিচয় দিতে পছন্দ করছিলাম না বলে জাপানী প্রজা হতেও পারছিলাম না।

"প্রচলিত প্রথামত আমি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা রুটির দোকানের হিসাব দেবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে যেতাম। সেদিনও রুটির দোকানের হিসাব দেবার জন্য গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটি ছেলে এসে মন্ত্রী মহাশয়কে জানাল দ্বারে পুলিশ অপেক্ষা করছে। আমি ব্যাপারখানা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম এবং মন্ত্রী মহাশয়কে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মন্ত্রী-কন্যাকে আমার বিপদের কথা জানালাম। মন্ত্রীকন্যা একটু চিন্তা করে বললেন, 'চিন্তা করবেন না মাননীয় অতিথি। আপনার খড়ম জোরা সামনের দিকেই থাক্। আপনি আমার সংগে অন্য খড়ম পায়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে চলুন। আপনাকে কেউ ধরতে পারবে না। আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন লোক শুধু আছেন আমাদের দেবতা সম্রাট। তিনি ছাড়া আর কেউ আপনাকে ছুঁতেও পারবে না।' এই বলেই মন্ত্রী-কন্যা আমাকে নিয়ে ঘর হতে বের হলেন এবং তাঁরই এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

"পুলিশ রাসবিহারীর অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন তিনি কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহারের জন্য এলেন না তখন পুলিশ মন্ত্রীমহাশয়কে জানল সে রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য এসেছিল। মন্ত্রী

মহাশয়ও পুলিশকে জানালেন যে রাসবিহারী তাঁর ঘরেই ছিলেন, পুলিশের আসার সংবাদ শুনে পালিয়ে গেছেন। জাপানী নিয়মমত রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য করা উচিত ছিল কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ তিনি সেই সাহায্য পুলিশকে করেন নি। সময়মত তিনি যদি দেখেন যে রাসবিহারী বসুকে তাঁর পক্ষে সাহায্য করা অন্যায় হয়েছে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত হারিকিরী করেই করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

"পুলিশটি চলে গিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলি তার উপরওয়ালা অফিসারকে রিপোর্ট করে এবং সেই রিপোর্ট ক্রমে প্রধান মন্ত্রীর গোচরীভূত হয়। প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ ডিপ্লমেটকে রাসবিহারী বসুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন তিনিই জানেন। এদিকে আমিও বুঝতে সক্ষম হলাম আমাকে বৃটিশের হস্তে সমর্পণ করার মত অধিকার প্রধান মন্ত্রীরও নেই। তা বলে আমি বুক ফুলিয়ে শহরের সর্বত্র বেড়াতে অথবা এক ঘর হতে অন্য ঘরে স্বাধীন ভাবে আসাযাওয়া করতে পারিনি। আমাকে আত্মগোপন করেই থাকতে হয়েছিল। আমাকে পাকা পাঁচ মাস আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল।

"পাঁচ মাস আত্মগোপন করে থাকবার সময় আমি প্রায়ই গেইসা বালিকার বেশ পরেই থাকতাম। কয়েকদিন পর মন্ত্রী-তনয়া আমাকে গেইসা বালিকা সাজিয়ে নিকটস্থ একটি বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেই বাড়ির দ্বারওয়ানের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই গেইসা বালিকা অমুক বাড়িতে থাকে। আপনি সেখানে গেলেই তার দেখা পাবেন এবং তার ঘরে গেলে এই গেইসা বালিকা আপনার কথামত কাজ করবে।' লোকটি মন্ত্রী-তনয়ার কথা শুনে এমনি মনের ভাব প্রকাশ করল যে সে যেন নবপরিচিতা গেইসা বালিকাকে দেখা মাত্রই ভালবেসেছে। মন্ত্রীকন্যা এবং আমি সেখানে অপেক্ষা না করে আপন ঘরে এলাম এবং মন্ত্রীকন্যাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'এর মানে কি? আমি পুরুষ হয়ে বাগানের মালীর হুকুম কি ভাবে তামিল করব?'

"মন্ত্রীকন্যা হেসে বল্‌লেন, 'আপনাকে করতেই হবে, তা যে ভাবেই পারুন। এখন আমি চল্‌লাম। বিকালে খাবার পাঠিয়ে দেব। খাবার খেয়ে দ্বারওয়ানের জন্য অপেক্ষা করবেন। দ্বারওয়ান শুধু দ্বারওয়ানের কাজই করে না, সে মালীর কাজও করে। আসবার সময় সে আপনার মনোরঞ্জনের জন্য সুগন্ধি ফুলও আনবে। মনে রাখবেন আবোলতাবোল বকবেন না। সে হয়ত আপনাকে জাপানী অক্ষরও শেখাতে পারে।' এই বলেই মন্ত্রী-কন্যা চলে গেলেন, আমিও দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সিগারেট ফুকতে লাগলাম।

"ছুটার পূর্বেই বিকালের খাবার এল। আমি খাবার খেয়ে থালাবাটি চাকরকে দিয়ে দিলাম। জীবনে কখনও থালাবাটি ধুইনি, সেজন্য তা ধুতে পারলাম না। সন্ধ্যার সময় দ্বারওয়ান আমার রুমে এসে আমাকে জাপানী প্রথায় নমস্কার করে আমার কাছে কতকগুলি ফুল রাখল, তারপর ছোট্ট একটি বাক্স খুলে একটি তুলি, একটি দোয়াত এবং কতকগুলি লেখার কাগজ আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্‌লে, 'এখন থেকে আপনাকে এই শিখতে হবে। আজ আমি আপনকে প্রথম পাঠ দিয়ে যাব এবং আগামী কাল এই সময় এসে দেখব আপনি আমার আদেশ কতটুকু পালন করতে পারেন। জাপানী প্রথামত শিক্ষককে নমস্কার করতে হয়। আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে আমাকে আসামাত্রই নমস্কার করতে হবে।' কি করে নমস্কার করতে হবে দ্বারওয়ান আমাকে তা শিখিয়ে দিল। আমি তাকে নমস্কার করলাম, তারপর আমাকে কিছুটা লেখা শিখিয়ে দিয়েই ছুটা সিগারেট বের করে একটা আমাকে দিল এবং অন্যটা নিজে ধরিয়ে বল্‌ল, 'আপনি যে কে তা আমি জানি। আমার সামনে আপনি সিগারেট খেতে পারেন কিন্তু মনে রাখবেন আপনাকে মন দিয়ে জাপানী ভাষা শিখতে পড়তে হবে। আপনার

জাপানী ভাষা শিক্ষার উপরই এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে।' লোকটির সংগে বেশী কথা বলে সময় নষ্ট করা সমীচীন মনে না করে তারই সামনে তুলি নিয়ে অক্ষর অর্থাৎ শব্দ তৈরী করতে বসলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দ্বারওয়ানের দেওয়া শব্দগুলি লিখতে শিখলাম। উপরন্তু জাপানী সুরে তা পড়েও ফেল্‌লাম। কিন্তু বেশীক্ষণ তা মনে থাকল না। আবার লিখতে পড়তে মন দিলাম। এদিকে দ্বারওয়ান একটা বই পাঠে মন দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে পুনরায় অশুদ্ধ উচ্চারণগুলি শুদ্ধ করে নিয়ে পাঠে মন দিলাম। যদিও আমি উচ্চারণ করেই পড়ছিলাম তবুও দ্বারওয়ানের মন বইএর উপরই পড়ে ছিল। সে আমার দিকে একবারও তাকায় নি। ঠিক রাত্রি নটার সময় দ্বারওয়ানের বই পড়া শেষ হল। বইখানা রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখি কি পর্যন্ত হয়েছে?' পাঠ অল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার উদ্যম দেখে সে খুসি হল। যাবার সময় সে আমাকে নূতন পাঠ দিয়ে গেল।

"রাত অন্ধকার। অন্ধকার রাতে টোকিওতে লোক বেশি চলাফেরা করে। মন্ত্রী-নন্দিনী বোধ হয় হাওয়া খেতে বের হয়েছিলেন। ঘরে ফেরার পথে তিনি আমার রুমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'লোকটা কেমন বলুন ত?'

"আমি বল্‌লাম, 'তেমন অসৎ বলে মনে হয় নি।'

"মন্ত্রীনন্দিনী হেসে বললেন 'যাক, তবুও মন্দের ভাল, কিছুটা ভাল লেগেছে, ভবিষ্যতে আরও লাগবে। কেমন?' 'হাঁ হাঁ তাই হবে। এখন একটু বসতে হবে। আমি একটু লিখব এবং পড়া আপনাকে বলে দিতে হবে।' মন্ত্রী-নন্দিনী আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বল্‌লেন, "তা হবে আর কি, এখন না হলে কি নয়?' 'হাঁ তাই, এখন না হলে হলে হবেনা।' আমি পাঠে মন দিলাম এবং মন্ত্রী-নন্দিনীকে প্রায় ঘণ্টা খানেক কয়েদ রেখে বিদায় দিতে বাধ্য হলাম।

"তিন মাসের উর্দ্ধকাল আমি জাপানী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম। এই

তিন মাসের মধ্যে একদিনও মন্ত্রীকন্যা আমার প্রতি ভালবাসার একটু লক্ষণও দেখান নি। যে দিন থেকে দ্বারওয়ান আসা বন্ধ করে দিয়েছিল সেদিন থেকেই মন্ত্রীকন্যা আমার প্রতি ভালবাসা দেখাতে আরম্ভ করেন এবং আমিও তাঁকে দেড়মাস পর বিবাহ করে ধন্য হই।

"জাপানে জাপান সরকারকে উপদেশ এবং আদেশ দেবার মত একটি প্রতিষ্ঠান ছিল সে কথা আমি জানতাম না। আমার শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর একদিন মন্ত্রীকন্যাই এই দলটির নাম জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন বলে আমার কাছে পরিচয় দেন এবং বলেন এদের হাতেই আমার এদেশে থাকা অথবা এদেশ থেকে চলে যাওয়া নির্ভর করছে। জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন শুধু জাপান সম্রাট এবং তাঁর পরিবারস্থ লোককেই দেবতা বলে স্বীকার করে। আর কাউকেই ড্রাগনিষ্টরা সে সম্মান দেয় না।

"আমি ভাবছিলাম এই দলে যারা কাজ করে তারা হয়ত আমার মতই রাজ-বিদ্রোহী কিন্তু এদের সংগে আমি যতই নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করতে লাগলাম ততই বুঝতে পারলাম জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন বৈপ্লবিক নয়, দেশের সরকারের একটি অংশ। আইন মতে এদের কোন কথাই খাটত না, কিন্তু কার্যত আইনও তাদের আদেশ মেনে চলত।

"পাঁচ মাস পূর্ণ হবার কয়েক দিন পূর্বে একদিন মন্ত্রীকন্যা এসে আমাকে জানালেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েক জন ভদ্রলোক আমার সংগে দেখা করতে আসবেন, তখন আমি যেন পুরুষের বেশেই থাকি এবং আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তার ঠিক ভাবে যেন জবাব দিই। দু একটি প্রশ্নের উদাহরণও মন্ত্রীকন্যা আমাকে বলে দিয়েছিলেন। আমি তখন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে মরছিলাম। প্রকাশ্য দিবালোকে বের হবার জন্য আমার প্রাণ আই-ঢাই করছিল। প্রশ্নগুলি এতই নির্মম ছিল যে অনেকের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্যও

ছিলনা কিন্তু তখনকার আমার মনের অবস্থা এমনই দুর্বল ছিল যে আমি যে কোনও বণ্ডে দস্তখত করতে রাজী ছিলাম।

"মন্ত্রীকন্যা চলে যাবার পর আমার সময় কাটত না। সব সময়ই ভাবতাম কখন আমার সংগে উক্ত লোকগুলি দেখা করতে আসবে। ইতিমধ্যে একদিন মন্ত্রীকন্যা আমার হাতে একটি পিস্তল দিয়ে বললেন, 'যদি সাত দিনের মধ্যে আপনাকে আমাদের সরকার প্রজা বলে গণ্য না করেন তবে আপনাকে হত্যা করার ভার আমার উপরই পড়বে। আমি সে হত্যার কাজ করতে পারব না। আমি আপনার সামনে হারিকিরি করব এবং তাই দেখার পর আপনি এই পিস্তলের সাহায্যে নিজেকে হত্যা করবেন।'

"অবস্থা ভালর দিকে মোটেই যাচ্ছে না দেখে আমি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম বটে কিন্তু দুঃখ করার মত আমার কিছুই ছিল না। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমাকে মরতেই হবে। যেদিন মন্ত্রীকন্যা আমাকে পিস্তল দিয়ে গেলেন সেদিনই বিকাল বেলা তিন জন মামুলী লোক এসে আমার সংগে দেখা করল এবং আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। আমি তাদের প্রশ্নের জবাব মন্ত্রীকন্যার নির্দেশ মতই দিয়েছিলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এরা এক নূতন ধরণের জীব। এদের কিছুতেই যেন বিচলিত করতে পারে না। আমার জবাব শুনে এরা সুখী কি দুঃখী হল তাও বুঝতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল এরা যেন তিনটি জল্লাদ। এরা যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিল তখন মনে হল এর চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম শুধু ভারতে বৃটিশ রাজত্ব বিরাজ করছে না, জাপানেও বৃটিশ রাজত্ব বিরাজ করছিল। বৃটিশ সরকার জাপান সরকারকে অনুরোধ করেছিলো আমাকে যেন বৃটিশ সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। জাপান সরকারও বৃটিশের অনুরোধে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন আমার সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিল।

"সময় অতিবাহিত হতে লাগল। রাত কাটল, দিন এল। মনে হতে লাগল

এই বুঝি মন্ত্রীকন্যা এসে হারিকিরি করবে এবং হারিকিরির পূর্বে আমাকে বলে যাবে, তার মৃত্যুর পর যেন আমি পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করি। হিন্দুধর্মমতে আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু তখন আমি আর হিন্দুধর্মের কথা ভাবতাম না। আমি ভাবতাম ভারতের স্বাধীনতার কথা। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল আমার কাম্য।

"মন্ত্রীকন্যার দর্শন না পাওয়াতে মনটা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একদিন বিকাল বেলা মন্ত্রীকন্যা নববধূর বেশে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর নববধূর পোষাক দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। এই বুঝি তাঁর এবং আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত! কিন্তু কন্যার ভ্রাতা নীরবতা ভংগ করে আমাকে বললেন, 'এখনই মন্দিরে গিয়ে আপনাদের বিয়ে হবে। মন্দিরে পুরোহিত আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' মন্ত্রীকন্যার ভাই আমার জন্য সিল্কের কিমনো এনেছিলেন। আমি তাই পরিধান করে মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করলাম এবং আমি গেইসা বালিকা বেশে যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরেই মন্ত্রীকন্যাকে নিয়ে নূতন সংসার পাতলাম।

"আমাদের বিবাহের কয়দিন পরই আমি জাপানী নাগরিকরূপে গৃহীত হই এবং মনের সুখে আমার দিন কাটতে থাকে।"

রাসবিহারী বাবু এই পর্যন্ত বলেই আমাকে নিয়ে পার্কে আসেন এবং নিকট প্রাচ্যের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অবশ্য তিনি আমাকে প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন আর আমি শুধু উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রসংগক্রমে যখন আমি চীনের বিষয় অবতারণা করে চীনের প্রতি জাপানীদের অত্যাচারের কথা বলছিলাম তখন রাসবিহারী বাবুর চোখ হতে জল পড়তে থাকে। আমার বক্তব্য শেষ হলে তিনি বলেছিলেন, "সবই ভগবানের ইচ্ছা।" আমি তখন সবেমাত্র নিরীশ্বরবাদ গ্রহণ করছিলাম, সেজন্য কথাটা আমার মনে বেশ আঘাত করেছিল। আমি আমার মনের ভাব গোপন করে বলেছিলাম, "ভগবানের ইচ্ছা ত অন্য কথা,

কিন্তু এখন আমাদের কর্তব্য কি তা ত ভেবে পাচ্ছিনা। জাপানীরা বলছে তারা এশিয়াকে মুক্ত করবে, কিন্তু এই যদি তাদের মুক্ত করার ধরণ হয় তবে ত মহামুস্কিল! একেই বলে কই মাছের কড়াই হতে উনুনে পড়ে যাওয়া, নয় কি ?" তিনি বল্‌লেন, "যদি আমরা নিজের পায়ের উপর না দাঁড়াতে পারি তবে পরিণামে সকলেরই এক দশা হবে। আমি দেশে থাকলে হয়ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতাম, তা হতে রেহাই পেয়েছি মাত্র, এবং সেজন্য জপানীদের যতটুকু সাহায্য করা দরকার তা আমি করতে বাধ্য, তা বলে ওয়াংচি ওয়াই-এর মত জাপানীদের হাতে আমাদের দেশ উঠিয়ে দিতে যাব না। যারা একবার দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে তারা আর একবার যে পারবে না তা মনে করা কারো উচিত নয়।"

রাসবিহারী বসুর সংগে চারদিন পরপর দেখা করি। মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরংগতা অনুভব করতাম। তারপরই হঠাৎ যেন তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যেত। তাঁর এরূপ মানসিক ভাব দেখে তাঁকে বলেছিলাম, "আপনার চাল চলন দেখার জন্য কতকগুলি ভারতীয় সদাসর্বদা আপনার প্রতি শ্যেনদৃষ্টি রাখছে তার কিছুটা আমি অনুভব করতে পেরেছি। সেজন্য আপনার কাউকে পরওয়া করা উচিত নয়। হাতী রাজপথে চলবে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে—এটাত সাধারণ কথা। আপনার মত লোকের পক্ষে এরূপ কুকুরের চিৎকারে বিচলিত হওয়া শোভা পায় না।" হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হল। তিনি বললেন "তাই ত, আপনার সংগে কথা বলব। কথা বলে আরাম পাব। এতদিন আমি অন্ধকারে ছিলাম। চলুন পার্কে গিয়ে বসি।"

আমরা পার্কে এলাম। আমাদের কাছেই কয়েক জন জাপানী বসে ছিল। তারা রাসবিহারী বাবুকে চিনত। তারা তাঁর সংগে কথা বল্‌ল। আমি তাদের সংগে পরিচিত হলাম। রাসবিহারী বাবু আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বললেন, "ক্যানাডিয়াণ লিগেসন অফিসার আপনার পাসপোর্টে যা লিখেছেন তাতে

মনে হয় না আপনি ক্যানাডাতে গিয়ে স্থান পাবেন, আপনাকে ক্যানাডিয়ান্ ইমিগ্রেসন বিভাগ পুনরায় জাপানে ফিরিয়ে পাঠাবেই। আমার মনে হয় ক্যানা-ডাতে আপনাকে পুনরায় জাপানী কন্‌সালের কাছে জাপানে ফিরে আসবার জন্য ভিসা নিতে যেতে হবে, তখন জাপানী কনসাল আপনাকে ভিসা দেবেন না বলেই সন্দেহ হয়। এখন বৃটিশ এবং জাপানে যেমন পিরিত চলছে সেক্ষেত্রে জাপান বৃটিশকে কোন মতেই চটাতে চাইবে না, অতএব ক্যানাডার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে একটু বিবেচনা করবেন।' কথাটা শুনে যদিও দুঃখ হল তবুও ক্যানাডাতে যাবার আশা পরিত্যাগ করলাম না। মনে মনে ভাবলাম একটা অভিজ্ঞতা হবে। বুঝতে পারব জাপান সরকার এবং ব্ল্যাক ড্রাগনিষ্টদের মধ্যে কত পার্থক্য। কিন্তু এত যে আমাকে কষ্ট পেতে হবে তা আমি জানতাম না। ক্যানাডাতে পৌছার পর রাসবিহারী বাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল এবং বুঝতে পেরেছিলাম বাস্তবিকই যদি রাসবিহারী বাবুকে ব্ল্যাক ড্রাগনিষ্টরা সাহায্য না করত তবে জাপান সরকার তাঁকে বৃটিশদের হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিত। ক্যানাডাতে পৌছবার পর কি ঘটেছিল তা প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি নামক বই-এ বলা হয়েছে।

কি মনে করে রাসবিহারী বাবু আমাকে নিয়ে আবার নিজের ঘরে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর ছেলে মন দিয়ে বই পড়ছে। সে জাপানী বই পড়ছিল। তার বই পড়াতে আমরা বাধা দিলাম না। খুক্ স্যান আমাদের দু পেয়ালা কফি এনে দিল। কফি খেয়ে পুনরায় আমরা যখন ঘর হতে বের হয়ে এলাম তখন রাসবিহারী তাঁর ছেলের কথা আমাকে বললেন। তিনি বল্‌লেন, "ছেলেটা খুব বই পড়ে, আমার সন্দেহ হচ্ছে সে হয়ত একদিন ইন্‌টারন্যাসনেলিস্ট হয়ে যাবে।" আমি বললাম, "তাই যদি হয়, তবে ত আনন্দের কথা। মানুষ হবে, আপনার ছেলে মানুষ হবে।" তারপরই আমি জিন্‌জা ষ্ট্রীটের দিকে রওয়ানা হতে যাব এমন সময় রাসবিহারী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"এখন কোন দিকে ?" আমি বললাম, "এবার ঘোম্টার নীচে খেমটা নাচ দেখতে যাচ্ছি। জিন্‌জা ষ্ট্রীটের পেছন দিকে আমি প্রায়ই বেড়িয়ে আসি।" রাসবিহারী বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাঁ বুঝতে পেরেছি, আমার ছেলের যে রোগ, আপনারও সেই একই রোগ। এখন বিদায়।" আমিও হাত নেড়ে বল্‌লাম "ছায়ানারা"।



জিন্-জা ষ্ট্রীট

প্রত্যেক শহরেরই কতকগুলি প্রসিদ্ধ ষ্ট্রীট আছে, টোকিওর তেমনি জিন্-জা ষ্ট্রীট। জিন্-জা উচ্চারণ করার সময় "জ" অক্ষরটিকে একটু দীর্ঘ এবং মোটা করে উচ্চারণ না করলে চলবে না। জিন্-জা ষ্ট্রীটের সংগে সুমিদা নদীর সম্পর্ক রয়েছে। এখানে ও 'স' অক্ষরটির উচ্চারণ (TS) নয় পূর্ববংগের "ছ" যেমন করে উচ্চারণ করা হয় তেমনিভাবেই করতে হবে।

জিন্‌জা ষ্ট্রীটটি যেমন সুন্দর তেমনি জাপানের প্রাণ বলাও চলে। জাপানের যত বড় বড় ব্যবসায়ী তাদের অফিস এখানেই। নিউইয়র্ক নগরীর ওয়াল্ ষ্ট্রীট আর টোকিওর জিন্-জা ষ্ট্রিট একই। এখানে আমাকে আসতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। জিন্-জা ষ্ট্রীটের নাম অনেক স্থানেই শুনেছিলাম, এমন কি আমেরিকান্ মিশনারীরাও জিন-জা ষ্ট্রীটের নাম আমার কাছে বলেছিল। সেই জিন-জা ষ্ট্রীট দেখতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ক্যানাডিয়ান বাণিজ্য বিষয়ের প্রতিনিধি এখানে অফিস খুলে বসেছিল এবং সেখান থেকেই ক্যানাডা যাবার ভিসা (visa) দেওয়া হ'ত বলেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছিল।

আমি যখন পথ দিয়ে চলছিলাম তখন অনেক জাপানী আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। আমার পরণে ছিল যোধপুরী বৃচেস্ এবং গায়ে ছিল খাকী সার্ট। মাথায় ছিল সোলা হ্যাট। বাস্তবিকই পোষাকটি জাপানীদের কাছে বহুরূপীর পোষাকই ছিল। যে সকল জাপানী আমার দিকে চেয়ে দেখছিল তারা প্রায়ই গরীব লোক। তাদের পরণে যে মামুলী কাপড় ছিল, আমার পোষাকের সংগে হয়ত তারা তারই তুলনা করছিল। আমি ক্যানাডিয়ান লিগেসন হতে ফেরবার পথে কি ভেবে ঠিক করলাম জাপানী ধনীদের কাছে হাত পেতে দেখা যাক এরা

আমার সংগে কিরূপ ব্যবহার করে। পাশেই একটি চারতলা বিল্ডিং। বিল্ডিংটার গায়ে নানারূপ প্লেট বসানো ছিল। একটি প্লেটে দেখতে পেলাম একদিকে কিছুটা জাপানী আর অন্যদিকে কিছুটা ইংলিশ অক্ষর লেখা রয়েছে। ভাবলাম এখানে এমন কোন লোক পাওয়া যাবে যিনি ইংলিশ বোঝেন এবং আমি যদি তাঁর কাছে হাত পাতি হয়ত কিছুটা দানও করতে পারেন। কিন্তু কথা হল পেটভরা লোক যেমন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আমারও সেরূপ অবস্থা হয়েছিল। ক্যানাডা যাবার ভাড়ার টাকা যোগাড় হয়েছিল। জাপানে থাকার অর্থাভাব ছিল না। দুবার জাপানী পুলিশ খানাতল্লাসী করে প্রত্যেক বারই আমার কাছে একশত ইয়েনের মত দেখতে পেয়েছে, এমতাবস্থায় যদি আমি ভিক্ষা করি তবে কেমন দেখায়? যাক্‌গে, ভাবলাম যদি পুলিশ ডাকে তবে বলব কিছুটা উপদেশের জন্য এসেছিলাম, ভিক্ষার জন্যে আসিনি।

চারতলা বেয়ে উঠতে কষ্ট হলনা। চতুর্থ তলাতে গিয়ে কোন রুমে যেতে হবে তা একেবারে ভুলে গেলাম। ভাবলাম চিন্তা করে আর কি লাভ হবে, যে কোনও দরজায় টোকা দেব। টোকা দিতে হল না। একটি অফিস থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, তিনি আমাকে দরজায় দেখেই বল্‌লেন, "হ্যালো, এখানে কি চাই?" লোকটি আমেরিকান্ একসেণ্ট দিয়ে কথা বলছিল। আমি তাকে স্পষ্ট ভাবেই বল্‌লাম, "লোকের সংগে ত অনর্থক কথা বলা চলেনা; তাই ভিক্ষা করার ভাণ করে কথা বলতে এসেছি।"

"আপনি জানেন এ অফিসে কারা কাজ করে?"

"প্রথমত জানিনা, দ্বিতীয়ত জেনেও দরকার নেই। কথা বলে চলে যাব। এত পরিচয় জেনে লাভ কি? আমি একজন পর্যটক মাত্র। ভবিষ্যতে জাপান সম্বন্ধে বই লিখব বলেই জাপানে সকল রকমের লোকের সংগে পরিচিত হতে চাই। ভাববেন না, সংবাদপত্রে নাম ওঠাতে আসিনি, কথা বলতে এসেছি।"

লোকটি কোন কথা না বলে আমাকে নিয়ে অফিসে প্রবেশ করল এবং একটি রুমে নিয়ে বসিয়ে বল্ল, "সিগারেট ?"

আমার পকেটে এক প্যাকেট চেরি সিগারেট ছিল, তাই বের করে তাকে একটা দিয়ে নিজে একটি ধরালাম। লোকটি চেয়ারে বসেই চা আনতে আদেশ করল। একজন বৃদ্ধ জাপানী এক মিনিটের মধ্যে দুকাপ চা এনে হাজির করল এবং আমাদের সামনে রেখে দিল।

যে দুর্বল সেই কথা বলে বেশি।

আমি কথা বলছিলাম। কোন কথার সঙ্গে কোন কথার মিল ছিল না। উদ্দেশ্যের নিশ্চয়তা ছিল না। ধর্মকথা টেনে আনছিলাম যা জাপানীরা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে রাজী ছিল না। মহা বিপদে পড়লাম। দুর্বল মনকে ধিক্কার দিয়ে এবার সজ্ঞানে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

জাপানী ভদ্রলোক বল্লেন, "এবার আমার কথা বলার পালা। আপনি শুধু জবাব দিয়ে যাবেন। আমি বিশেষ ব্যাখ্যা চাইনা।" তাঁর অনেকগুলি প্রশ্ন ছিল। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, "কেউ কি আমাকে জাপান ভ্রমণ করতে পাঠিয়েছে ?" ভদ্রলোক যখন বুঝলেন আমাকে কেউ জাপান ভ্রমণে পাঠায় নি, আমার নিজের ইচ্ছাতেই জাপানে এসেছি এবং সত্বরই আমেরিকার দিকে রওয়ানা হচ্ছি তখন তিনি হিন্দুস্থানীতে বললেন, "আমি তোমাদের দেশে ছিলাম এবং সাহেব বলে পরিচিত হয়েছিলাম। তোমাদের দেশের লোক আমার কাছে ভিক্ষা চাইত, দশ টাকা মাইনে পেয়ে সুখী হত, সে দেশের লোক এত সাহসী হয় কি করে ?"

এবার কথা বলার পথ পেলাম। আমি ভদ্রলোককে বল্লাম, "তোমার কথায় আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি, এবার আমার কথা বলার পালা। আমার সংগে যদি সুমিদা (Sumida) নদীতে যাও তবে দেখিয়ে দেব তোমার মত হাজার হাজার জাপানী দৈনিক পনর সেণ্টে জীবন কাটাচ্ছে। আমি চিন্তা করে

পাচ্ছিনা যে দেশের লোক এত দরিদ্র তারা কি করে বিদেশে গিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারে ?"

তারপরই ইংলিশে বললাম, "ক্ষমা করবেন মশাই, কথায় কথা এসে গেল। আমি জেনে সুখী হলাম আপনি আমাদের দেশে ছিলেন এবং আমাদের দেশের সকল সংবাদ ভাল করে অবগত আছেন।" তারপই আমি ঘর হতে বের হয়ে এলাম এবং লোকটাকে এড়াবার জন্য পেছন দিকে চেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। যে সকল জাপানী বিদেশে কাজ কর্ম করে তারা কিন্তু ভয়ানক অমানুষ। সেকথা আমার জানা ছিল। সেজন্যই আমি পেছন দিকে চেয়ে সিঁড়িতে নামছিলাম। আমার জানা মতে মিনন বলে একটি ভারতবাসীকে এক জন জাপানী নিমন্ত্রণ করে তার বাড়িতে নিয়ে এমন মার দিয়েছিল যার ফলে মিননের তিনমাস হস্‌পিটালে থাকতে হয়েছিল।

তাড়াতাড়ি করে বাড়ি হতে নেমে সাইকেলে গিয়ে বসলাম এবং বড় রাস্তা পরিত্যাগ করে একটি ছোট পথ ধরে চলে পুনরায় জিন্‌-জা ষ্ট্রীটে চলে এলাম। কিন্তু মনটা যেন দমে। গেল আমার বাসস্থানে ফিরে যাওয়াই, ভাল মনে করলাম। অবুও আমার বাসস্থানটা অনেক নিরাপদ। জাপানী ওয়াই, এম্, সি, এতে কেউ বর্বরতা দেখাতে সাহস করবে না। এক দম হোষ্টেলে চলে এসে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলাম এতদিন আমি মুখ খুলি নি আজ একটা বাজে লোকের কাছে মুখ খুলে অন্যায় করেছি। লোকটা যদি জাপানী ব্লেক ড্রাগনের সভ্য হয় তবে আমার দেশের লোকের ক্ষতিও করতে পারে। মনে মনে স্থির করলাম "আর নয়"। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু পুনরায় মনে হল পৃথিবীর তৃতীয় শহর টোকিও, এখান থেকে এমনি ভাবে চলে যাওয়াটা ভাল নয়। এবার নীচে গিয়ে কিছুটা ভোজন করলে মন বেশ ভাল হবে।. নীচে গেলাম এবং এক পেয়ালার পর আর এক পেয়ালা চা খেয়ে গণ্ডাদুই চেরি সিগারেট ফুঁকে পুনরায় রুমে এসে শুয়ে থাকলাম।

যদি কেউ একাকী ভ্রমণ করে থাকেন তবে তিনি বুঝবেন একাকী ভ্রমণ করাটা কত কষ্টের। অনেকে একাকী ভ্রমণ করে। পথে ঘাটে কয়েক দিন ভ্রমণ করে টুরিষ্ট কোম্পানীর বইগুলির মতে কতকগুলি স্থান দেখে অথবা বড় বড় লোকের সংগে দেখা করে ভ্রমণ সমাপ্ত করে, আমি সেরূপ পর্যটক নই। আমাকে নানা স্থানে যেমন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তেমনি লোকের সংগে মেলামেশা করে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনও করতে হয়েছে।

রাসবিহারী বাবুর বাড়ীতে আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, টোকিও ছাড়তে পারছিলাম না। সিনেমা, অপেরা কাবেরে এসব স্থানে যাওয়া আমার ভাল লাগছিল না। আমার মনে কি যেন দারুণ ভাবে দংশন করছিল। চারদিকে যেন দস্যুর দল দেখতে পাচ্ছিলাম আর তারা যেন আমাকে হত্যা করতে আসছিল। এদিকে এমন একটা লোক পাচ্ছিলাম না যার কাছে মুখ খুলে একটু কথা বলি। বিদেশে এসেছি বিদেশের লোকের কাছে কথা বলব, দেশী লোকের কাছে যাব কেন তাই ভাবছিলাম। এমন সময় মনে হল, আবার চল ভিক্ষা করতে মন,—এবার টাকা ভিক্ষা নয়, কথা ভিক্ষা। এবার আর ধনী পাড়াতে ভিক্ষা করলে চলবেনা চল নদী তীরে যেখানে ধনীরা যায় না।

নদীতীর আমার পরিচিত স্থান। সাইকেলটা যেন আপনি সেদিকে চল্‌ল। আমি সেদিকে অগ্রসর হয়ে নদী তীরে গিয়ে কতক্ষণ বসলাম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্চিল। দলে দলে দরিদ্র মজুর খাবারের দোকানের দিকে ফিরে আসছিল। অনেকক্ষণ বসে তাদের চলাফেরা দেখে একটী খাবারের দোকানে গিয়ে বসলাম। এদের খাওয়া দেখে ভিক্ষা পত্র বিতরণ করতে আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবুও বিতরণ করলাম। অনেকে আমার ভিক্ষাপত্র পড়তে লাগল। অনেকে আমাকে তাদের কাছে বসিয়ে খাওয়াতে চাইল। অবশেষে এক জনের কাছে বসে সামান্য ভাত খেলাম এবং তাকে একটি সিগারেট দিলাম। সিগারেটের দাম এক সেণ্ট। এরূপ সিগারেট এরা মোটেই ব্যবহার করতে পারে না। যদি এক পয়সা

সিগারেটের জন্য খরচ করে তবে খাবেই বা কি এবং রাত্রে শোবেই বা কোথায় ? বাস্তবিকই টোকিও যেমন বিশিষ্ট একটি রাজধানী তেমনি দরিদ্রের নিবাস ভূমিও। দরিদ্র ত দরিদ্রই, তাদের কথা শুনে আবার লাভ কি ? আমি দরিদ্রের কথা বেশি বলি বলে এক জন জাপানীর মন্তব্য এবং ভারতবাসীর মন্তব্যে বেশ মিলে যায়। উভয়েই বলেছিলেন, "লোকটা ভদ্রলোকের সংগে মোটেই মেশে নি, সেজন্যই শুধু গরীবের কথাই ভাবে আর গরীবের কথাই বলে।" দরিদ্রকে উপেক্ষা করা যাদের অভ্যাস তাদের যেমন আমি ছায়া মাড়াতে চাই না, তারাও তেমনি যেন আমাকে ঘৃণা করেই সুখী থাকে।

জাপানে বহু দরিদ্র পল্লী আছে। আমি দরিদ্র পল্লীগুলি দেখেই চোখ বুঁজে যাই নি, জাপানে যাদের জাপানী জিপসি বলা হয় তাদের অবস্থা দেখার জন্যও চেষ্টা করেছি। দেখেছি কেউ নৌকায় বাস করতে চায় না, সকলেই চায় মাটির উপর ঘর করে বাস করতে। কিন্তু জাপানে জমি কোথায় ? যত জমি ছিল সবই কৃষক এবং শহুরে লোক ভাগ করে নিয়েছে, সেজন্য যাদের জন্ম নৌকায় তারা ডাংগায় এসে বসবাস করতে বেশ বেগ পেয়ে থাকে। জাপানে অনেক লোক আছে যাদের এক মাত্র লক্ষ্য হল ডাংগায় একটি ঘর করে বাস করা। এদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী জাপানীদের বিদেশেও বসবাস করতে দিতে রাজী নয়, সেজন্যই জাপানীরা মান্‌চুরিয়া আক্রমণ করেছিল এবং দখল করতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্য দরিদ্র জাপানীরা জাপানী সরকারকে মনে প্রাণে সাহায্য করেছিল। জাপানী ধনীদের এক ঢিলে দুটি পাখী হত্যার সুব্যবস্থা হয়েছিল।

এখন কথা হল যদি জাপানীরা মান্‌চুরিয়া দখল না করত তবে তাদের জিপসি শ্রেণীর লোকের ডাংগায় বাসের কি ব্যবস্থা হ'ত ? জাপান তাদের ঘন বসতিপূর্ণ স্থান হতে ব্রেজিলে লোক পাঠাবার আদেশ পেয়েছিল, মানচুরিয়া তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে তাদের অবারিত দ্বার ছিল। কিন্তু এত সুবিধা থাকাতেও জাপান লোভ সামলাতে না পেরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের

হাতের পুতুলের মত নেচেছিল। ফল যে ভাল হয়নি তা এখন দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

জিন্‌জা ষ্ট্রিটের সৌন্দর্যের পেছনে যে এত গলদ লুকিয়ে রয়েছিল তা কে জানত? আমি দরিদ্র মজুরদের খাবারের স্থান থেকে বের হয়ে একটি ছোট গলি ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এখানে কতকগুলি চীনা এবং কোরিয়ান্‌ও ছিল। চীনারা করছিল প্যান সপের ব্যবসা আর কোরিয়ানরা জাপানীদের সংগে সাগরে যেত মাছ ধরতে। ভারতবর্ষে এখনও প্যান সপের বাহুল্য দেখা যায় না। প্যান সপ্‌গুলিতে দরিদ্র মজুর যখন অভাবের তাড়নায় পতিত হয়, সময় সময় তাদের যথা সর্বস্ব এমন কি ভাল বস্ত্র খানাও বাঁধা দিয়ে সামান্য অর্থের সংস্থান করতে হয়। যে যে দ্রব্য বন্ধক মুক্ত করে না নেওয়া হয় তা ছয় মাস অন্তর দোকানী বিক্রি করে দেয়। অনেকে তখন নিজের মাল নিজেই আবার কম দামে কিনে নিজকে ভাগ্যবান মনে করে।

প্যানসপগুলির পরেই হল জেলেদের আবাস। এদিকে একবার যেই আসবে তাকেই অন্তত তিন ঘণ্টা ধরে নাক পরিষ্কার করতে হবে। এমন পচা দুর্গন্ধ যা সহজে সহ্য করা যায় না। কিন্তু আমিও দরিদ্র। দরিদ্রের আবার দুর্গন্ধ কি? ভারতীয় এক মহারাজা বলেছিলেন, "ঐ যে দেখছ মেথর ব্যাটারা, তারা যদি দুর্গন্ধ না পায় তবে বাঁচবে না, ওদের সুগন্ধ সহ্য হবে না। সুগন্ধে থাকলে তাদের হবে কলেরা।" আমিও সেই শ্রেণীর লোকই, সুগন্ধ আমার সহ্য হয় না। তাই দুর্গন্ধ অতিক্রম করতে আমার কোন কষ্টই পেতে হয়নি। দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানটি যখন অতিক্রম করছিলাম তখন ভারতীয় "নেটিভ প্রিন্স"এর কথা মনে হয়েছিল। আরও মনে হয়েছিল একটি কথা, সেই কথাটি একজন পণ্ডিত বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যারা দরিদ্র তাদের শান্তি হবে তখনই যখন তারা অনন্ত শয্যায় শায়িত হবে।" কাটা ঘায়ে যেন নূনের ছিটা পড়েছিল। আমি দুর্গন্ধের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

একটি ঘরে দেখতে পেলাম তিনটি শিশু শুয়ে আছে। এদের কারো বয়স ছয় মাসের বেশি নয়। তারা কোরিয়ান। কোরিয়ান্‌রা তাদের শিশু পিঠে করে সর্বত্র নিয়ে বেড়ায় না। তিনটি শিশুই কখনো কাঁদছিল আবার কখনো আধমরা হয়ে থাকছিল। একটু বড় একটি ছেলে কখনো এসে শিশুদের মাত্র দেখে যাচ্ছিল। আমি তখনও দাঁড়িয়ে। একজন মহিলা এক বাটি কানজি নিয়ে এসে এক একটি শিশুকে কোলে নিয়ে তা খাইয়ে দেবার পর আবার শিশুগুলি হাত পা নাড়তে লাগল। তারা কেউ হাসছিল না। তারা কিছুটা খাবার খেতে পেয়ে শান্ত হয়েছিল মাত্র। আমি শিশুদের দেখছি দেখে অনেক লোক জমা হয়েছিল। আমি তাদের দিকে কিন্তু তাকাচ্ছিলাম না। হঠাৎ এক জন পুলিশ এসে যখন আমার কাছে দাঁড়াল তখন মনে হল এ লোকটা ত হল পুঁজিবাদীর দূত, একে ফাঁকি দিতে হবেই। আমার ভাবপ্রবণতা মিনিটের মধ্যে লোপ পেল। পুলিশকে বলল্‌লাম, "দেখছি এরা কোন জাতের শিশু।" পুলিশ বুঝল আমি একজন "টুরিষ্ট"। সখ করে শিশুদের দেখছি। পুলিশটা চলে যাবার পর আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো। পুঁজিবাদীদের সামনে দুঃখ করাও চলে না। তাতেও তারা ভয় পায়।

জিনজা ষ্ট্রিট পরিত্যাগ করে ইয়ুথ ক্লাবে ফিরে এসে সেদিনই বিকাল বেলা অমেরিকা ফেরতা জাপানী যুবকের সংগে দেখা করে জিন-জা ষ্ট্রীটে যা দেখেছিলাম তাই বললাম। যুবক আমার কথা ধৈর্য সহকারে শুনবার মত যেন সময় পাচ্ছিল না। সে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। আমি পুনরায় তাকে বললাম, "দেখুন মিষ্টার, টাকা পয়সা অর্জন এবং সুখে থাকাই জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য নয়। অনেকে রাজ্য বিস্তার করে সুখী হয়। আমার মতে তাও সুখের নয়। নিরক্ষরকে অক্ষর শেখান, অভুক্তের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা আর ঐযে শিশু তাদের মানুষ হবার সুযোগ দেওয়াই বোধহয় সব চেয়ে বড় কাজ। অপনি রাজভক্ত,

কোথাও রাজশক্তি ত এসবের কিছুই সাহায্য করে না।” যুবক কিছুই না বলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ইয়াকোহামার দিকে রওয়ানা হলাম। পথে কোথাও না থেকে ইয়াকোহামাতে কাপ্তান ইতোর ঘরে পৌছি। তাঁর ঘরে আর একটি রাত কাটিয়ে পরের দিন রেলগাড়িতে করে কোবেতে আসি।

টোকিও হতে ফিরে এসে ক্যাণাডার টিকিট কিনতে কয়েক দিন কেটে গেল। টিকিট কেনার সময়ই ভাবতাম ক্যানাডায় অনর্থক যাচ্ছি। আর বোধ হয় জাপানেও ফিরে আসতে পারব না। জেনে শুনেও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া অতীব অন্যায় কাজ। যিনি আমার কাছে জাহাজের টিকিট বিক্রি করেছিলেন তিনিও দুঃখিতই হয়েছিলেন। টিকিট কেনা হয়ে গেলে আমার আর কিছুই করবার ছিল না কিন্তু মূল্যবান সময়ও অনর্থক কাটানো যায় না, সেজন্য রাজপথে সাইকেল নিয়ে বেড়ানোই ঠিক করলাম।

এক দিন হঠাৎ দেখা হল একটি যুবকের সংগে। সেই যুবকই আমাকে মোটর ট্রাকে করে ওডাওরাতে নিয়ে গিয়েছিল। দেখা হওয়া মাত্র তাকে আমি চিনতে পারলাম। তার সংগে কথা না বলে সে যেদিকে যায় সেদিকেই যেতে আরম্ভ করলাম। প্রায় আধঘণ্টা যাবার পর সে একটা দরজার কাছে দাঁড়াল এবং আমি সাইকেল হতে নেমে লোকটির অনুগমন করলাম। এটা চীনা হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। লোকে লোকারণ্য, কে কার খবর রাখে? খাবারের টেবিল, রুম এবং চাণ্ডুখানা সর্বত্র লোকে লোকারণ্য। আমরা একটি প্রকাশ্য স্থানেই বসলাম। আমাকে দেখে কোথা হতে আরও কয়েক জন লোক এসে আমাদের পাশে বসল। এর মধ্যে একটা লোককে দেখে আমার সন্দেহ হল তাকে পিকিনের পথে কোথাও দেখেছি। ক্রমেই তার কথা মনে আসতে লাগল। তারপর মনে হল এই লোকটাই একদিন আমার কাছে ইব্রাহিমের ঘরে বসে কমিউনিষ্টদের স্বরূপ প্রকাশ করেছিল। তাকে দেখে আমি একেবারে নির্বাক

হয়ে গেলাম এবং যে সকল খাদ্য আমাকে দেওয়া হচ্ছিল তাই আনমনে খেয়ে যেতে লাগলাম। নীরবতা যখন চরমে উঠল তখন সেই লোকটাই আমার কাছে এসে বল্‌ল ঃ

"মিস্টার কেমন আছেন ?"

"ভাল আছি" বলেই মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

"এখানে কি করে এলেন ?"

"খেতে এসেছি, কেউ ডেকে আনেনি।"

"সবই বুঝলাম, এখন জিজ্ঞাসা করি জাপান কেমন দেখলেন ?"

"বেশ ভাল, সর্বত্র সৌন্দর্য প্রতিফলিত হচ্ছে।"

যুবক তখন আমার হাত ধরে টেনে বল্‌লে, "এখন উঠুন, আর খেতে হবে না, আমার সংগে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।" আমি ওঠার সংগে সংগে দেখতে পেলাম অনেকগুলি যুবক উঠে গেল। যুবক আমার হাত ধরে পাশেরই একটা রুমে নিয়ে বসাল এবং বলল, "এটাই আমার বাড়ি। এখানে ভয় করার কিছুই নেই। আপনার সংগে আমার দেখা হয় ইব্রাহিমের বাড়িতে, টিয়েনসিন এবং পিকিনের পথে। তখন আমি ছিলাম এক পদার্থ আর এখন আমি অন্য কিছু হয়েছি। এস বন্ধু আমরা হাত মিলাই আর পূর্বের কথা ভুলে যাই।" আমি যুবকের করমর্দন করলাম, দাঁত বের করে হাসলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। যুবক আমার মনের ভাব বুঝল এবং বলল, "আমরা অনেকেই মান্‌চুরিয়াতে প্রপেগেণ্ডা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রপাগেণ্ডা করছিলাম তাতেই ফেঁসে গেছি। এখানে যতগুলি যুবক দেখছেন, কেউ আর বিদেশ যেতে পারে না। অনেকে জেলও খেটেছে। অনেকের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। আপনাকে এখানে আমরা বেশীক্ষণ বসাব না, কারণ এখানে বসে যদি আমরা কথা বলি তবে হয়ত আমাদের সকলকেই একই সঙ্গে জেলে যেতে হবে, আমরা তা পছন্দ করিনা। আপনার আসার

সংবাদ আমাদের সংবাদপত্রে বের হয়েছিল,” এই বলেই লোকটি তার পকেট হতে একখানা সংবাদপত্রের কাটিং আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “ফটো ঠিক হয়েছে?” আমি বললাম, “হাঁ তাই, এই সংবাদপত্র কোথা থেকে বের হয়?” যুবক বললে “তার ঠিক নেই এবং কত কপি বের হয় তাও জানিনা।” সংবাদপত্র খানা হাতে নিয়ে দেখলাম এক পাশে ইংলিশে লেখা রয়েছে, জাপানী প্রগতিশীলদের মুখপত্র। সংবাদপত্র খানা ফিরিয়ে দিয়ে সকলের সংগে পুনরায় করমর্দন করে মোটর ড্রাইভারের হাত ধরে হোটেলের বাইরে চলে এলাম। মোটর ড্রাইভারও আমাকে বড় পথের উপর রেখে ছায়ানারা বলে বিদায় নিল।

মোটর ড্রাইভারের সংগ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, কিন্তু সে একটিও ইংলিশ শব্দ জানত না, সেজন্যই তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সেদিনই বিকাল বেলা স্নানের প্রবল ইচ্ছা হল। স্নানে যাবার পূর্বে মিঃ সহায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, “সমুদ্রে স্নান করতে যাব, সমুদ্রে যাবার পথটি যদি বলে দিন তবে বড়ই বাধিত হব।” তিনি বল্লেন, “ঘর হতে বের হয়ে প্রথম ডাইনে তারপর বাঁয়ে।” তারপর হাটা এঁকে বেঁকে নাচাতে আরম্ভ করলেন। আমিও তাঁরই কথা যেন বেশ বুঝেছি এই মনে করে সমুদ্র স্নান করতে রওয়ানা হলাম। কিন্তু ভাবতে লাগলাম জাপানের একজন প্রসিদ্ধ ভারতবাসী যদি এমনি করে পথ দেখান্ তবে অন্যান্য ভারতবাসীকে তাদের দোষ ত্রুটির জন্য কি দোষ দিতে পারি? মন উদাসীন হল, আমার মন দমে গেল। মিঃ সহায় বাস্তবিকই একজন উদীয়মান পুরুষ। তাঁর পথ দেখাবার মত জ্ঞান হয়নি দেখে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম আর ভাবছিলাম, ভারতের ভবিষ্যতের কথা। চিন্তাযুক্ত মনে ঘর হতে বের হয়ে সাগরের দিকে চলছিলাম। পথে এল একটী পথের জংসন। অনেকগুলি মোটরকার চলেছে। আমার মন

তখন ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায়ই মগ্ন ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন মোটরকার ড্রাইভার আমার সামনে মোটরটা থামাল, তারপর গাড়ি হতে নেমে আমার হাত ধরে কয়েকবারই "আহো" বলে ফুটপাথে উঠিয়ে দিয়ে বলল "মিষ্টারো ফুলো গো দিস্ ওয়ে" মানে মিষ্টার গোমুর্খ এদিকে যান। জাপানীদের চরম কুবাক্য হ'ল মূর্খ। সেই কথাই আমার প্রতি মোটর ড্রাইভার ব্যবহার করেছিলেন কারণ আমি চিন্তাযুক্ত মনে পথ চলার জন্য পথে ট্রাফিকের গুরুত্ব দিচ্ছিলাম না।

শুনেছিলাম জাপানে মোটর একসিডেণ্ট হয়না, তার প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে সুখী হলাম। তারপর আবার আপন মনে যখন পথ চলছিলাম তখন আরও আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। আনমনা হওয়া বড়ই অন্যায় কাজ, কিন্তু যখন দেশের ভাবনায় পেয়ে বসে তখন লোক আনমনা না হয়ে থাকতে পারে না। আমরা নিজের চিন্তাতেই কাতর হয়ে যাই। আমি নিজের চিন্তা করছিলাম না, সমস্ত ভারতবর্ষটার চিন্তা করছিলাম। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করা সহজ ত নয়ই, ভয়ানক কঠোর। সেই কঠোর কাজ করার জন্যই আমাকে এই গ্লানিসূচক কুবাক্য শুনতে হয়েছিল।

বাঁকা পথ ধরে সমুদ্রতীরে এসে দেখলাম লোক মনের আনন্দে স্নান করছে। সমুদ্রে নামবার পূর্বে মনে পড়ল আমার পকেটে প্রচুর টাকা রয়েছে। সেজন্য টাকার কথা যখন চিন্তা করছিলাম তখন একটি যুবক এসে জিজ্ঞাসা করল,

"কি ভাবছেন ?"

"টাকার কথা।"

"টাকা কোথায় ?"

"আমার পকেটে।"

"স্নান করতে চান ?"

"হাঁ।"

"টাকা, বস্ত্র এবং অন্যান্য যা আছে তা এই ডালাতে রেখে দিন। এটা জাপান, কেউ চুরি করবে না।"

যুবকের কথায় মানিব্যাগটা ডালাতে রেখে দিয়ে স্নান করতে নামলাম। অনেকক্ষণ স্নান করলাম। যুবকও আমার সংগে স্নান করল। স্নান করা হয়ে গেলে যুবকও আমার সংগে স্নান শেষ করে নিয়ে আমাকে এক পেয়ালা চা খেতে দিল। মানিব্যাগ এবং বস্ত্র রাখার জন্য ডালার ভাড়া সেই দিল। তারপর যুবক বললে "চলুন আপনাকে ঘরে পৌছে দেই।" আমি তাতে রাজী হলাম। আমরা যখন শহরের দিকে চলছিলাম তখন অন্য এক জন ইণ্ডিয়ানের সংগে দেখা হয়। সেই ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক আমার পরিচিত ছিলেন। যুবককে আর কষ্ট না দেবার জন্য বল্লাম, "মশাই আপনাকে ধন্যবাদ, এখন আমি ঘরে যেতে পারব।" যুবক বল্লে—"আমিও সেদিকেই যাব।" তিন জনে মিলে যখন ঘরের দরজার কাছে এলাম তখন যুবককে আপ্যায়ন করে ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম। যুবক আমার সংগে এল এবং তাকে আমাদের প্রথায় এক পেয়ালা চা দেওয়ায় বেশ সুখী হয়েছিল। আমার সংগের ভারতীয় ভদ্রলোক চলে যাবার পর জাপানী যুবক বল্লে—

"অতএব আপনি এখানেই থাকেন ?"

"হাঁ মশাই।"

"এখন আমার সংগে বেড়াতে যাবার সময় হবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

খুক্ স্যানকে ডাকতেই তিনি এলেন। পাচিকা আমার জাপানী সংগীকে দেখেই যেন একটু বিরক্ত হলেন। আমি তা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "পাচিকা, আপনার মুখ কখনও বিষণ্ণ দেখিনি। এখন বিষণ্ণ দেখার কারণ কি ?" পাচিকা বল্লেন, "সেরূপ কিছুই নয়, আমার পেটে ব্যথা হয়েছে বলেই বিষণ্ণ

দেখছেন।" আমি বললাম, "আপনার পেটব্যথার কথা শুনে বড়ই ব্যথিত হলাম। ঘরে আসার পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, এই ভদ্রলোক আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছেন। আমি তাঁকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব। আসতে হয়ত দেরীও হতে পারে। রামাণীকে বলবেন আমি অন্য আর এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সংগে সিনেমাতে যাব, তরাপর ঘরে ফিরব।" তারপরই জাপানী যুবকের দিকে চেয়ে বললাম, "চলুন আমরা রুস্তম আলীর বাড়ীতে যাই।" কথা বলেই আর দেরী না করে যুবকের হাত ধরে ঘরের বের হয়ে এলাম এবং যুবককে বললাম, "এখন আপনাকে চিনতে পেরেছি, চলুন কোথায় যাবেন।"

"যাব আমাদের আড্ডায়। আমাদের আড্ডা সমুদ্র তীরে। সেখানেই বসে আমরা কথা বলব।" সমুদ্রতীরের দিকে চললাম। জাপানী যুবক একটু দূরে চলছিল, আমি পেছন থেকে তাকে লক্ষ্য করেই চলছিলাম। কতক্ষণ চলার পর শহরের বিজলী বাতির আলো অনেকটা কমল। আমরা একটু অন্ধকার স্থানে এসে উভয়ে একত্রে চলে হঠাৎ একটা ঘরে প্রবেশ করলাম। এখানে ঘরে জুতা নিয়েই প্রবেশ করলাম। জুতা নিয়ে ঘরে প্রবেশ এই সর্বপ্রথম এবং এই শেষ। কারণ আমি আর এদের সংগে সাক্ষাৎ করিনি। অনেকেই এরূপ স্থানে যেতে মানা করেছিল, দ্বিতীয়ত যুবকগণও আমাকে আর নিতে আসেনি।

ঘরে প্রবেশ করেই আমরা একটি রুমে প্রবেশ করলাম। টেবিল চেয়ার কিছুই ছিল না। যারা সেখানে বসেছিল তারা সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর একজন বললে, "উই মিট্ এগেন্! (আমাদের আবার দেখা হল)। জাপান কেমন দেখলেন ?"

"ভাল না বন্ধু। এখানেও দারিদ্র প্রবলভাবেই রয়েছে। টোকিওর দিকে দেখলাম অনেক লোক ভালভাবে খেতেও পায় না। অনেকেরই বস্ত্রের অভাব। তার উপর রাত্রে শোবারও ভাল বন্দোবস্ত নেই। আমি ভাবছিলাম সর্বত্রই কোবের মতই দেখব। যতই জাপানের ভেতরে গিয়েছি ততই দরিদ্রতার তাণ্ডব

লীলা দেখতে পেয়েছি। অনেক দরিদ্র এখনও বুঝতে পারে না তারা দরিদ্র তাদের শিক্ষা মোটেই নাই। তারা জন্মেছে শুধু মরণের জন্যই। মাঝখানে তার যতদিন বাঁচবে ততদিন সেবা করে যাবে শুধু ধনীদেরই।"

একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, "এই অন্যায়ের কি প্রতিকার করা যায়?" আমি বললাম, "জানি না।"

সমাপ্ত